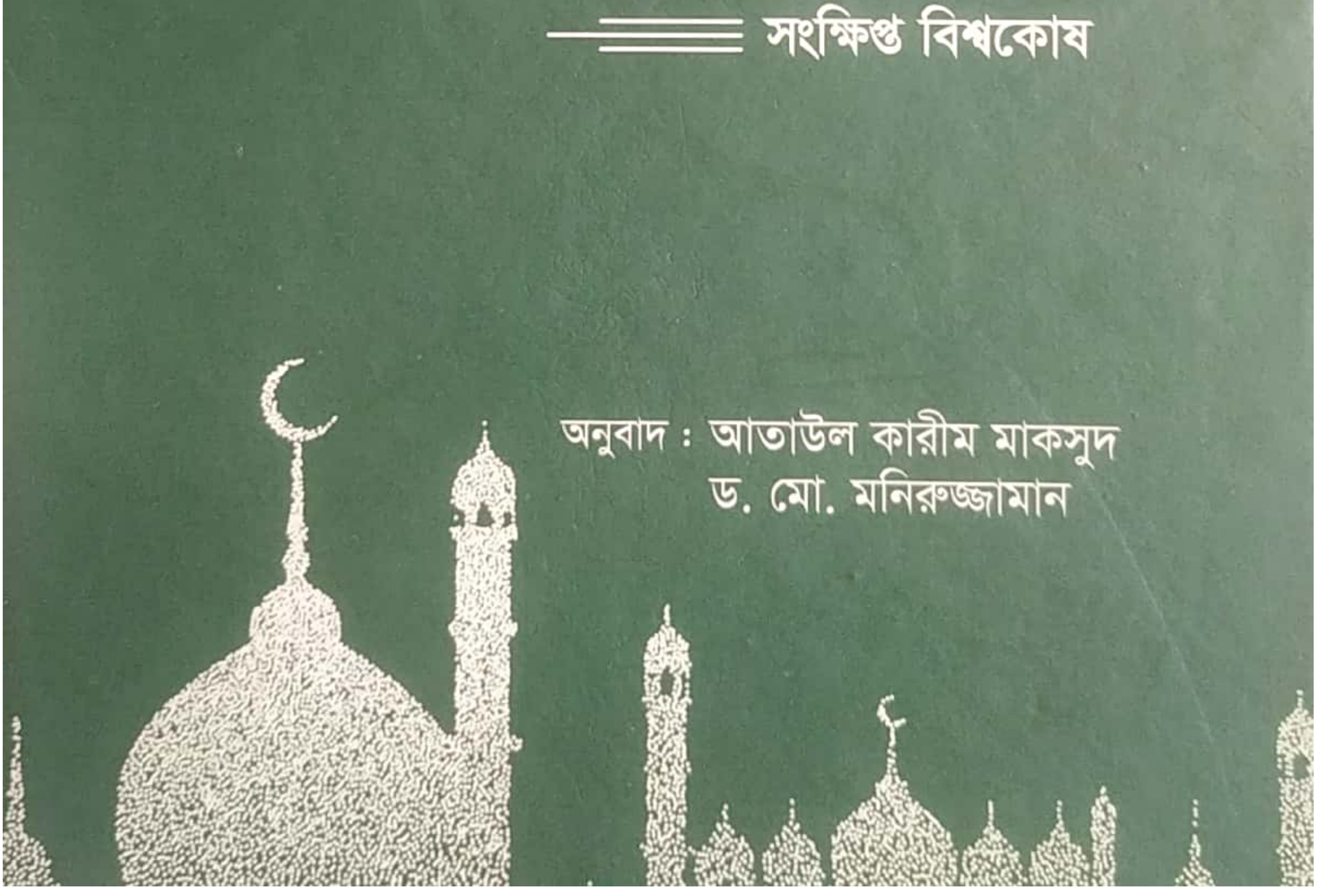
৪র্থ খণ্ড

ইসলামপূর্ব যুগ থেকে নিকট অতীত

ইসলামি ইতিহাস

সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ

অনুবাদ : আতাউল কারীম মাকসুদ
ড. মো. মনিরুজ্জামান



ইসলামি ইতিহাস

সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ

ইসলামি ইতিহাস

সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ

[ইসলামপূর্ব যুগ থেকে নিকট অতীত]

চতুর্থ খণ্ড

মোঙ্গল মুসলিমদের ইতিহাস

মাকতাবাতুল হাসান

ইসলামি ইতিহাস সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ (৪র্থ খণ্ড)

প্রথম প্রকাশ : মুহাররম-১৪৪২/সেপ্টেম্বর-২০২০

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল হাসান

গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স

৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০

মুদ্রণ : শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com - niyamahshop.com - wafilife.com

ISBN : 978-984-8012-60-4

Web : maktabatulhasan.com

মূল্য : ৩১০০/- টাকা মাত্র [৫ খণ্ড একত্রে]

Islami Itihash Sonkhipto Bissokosh (4th Part)

Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh

E-mail : rakib1203@gmail.com Facebook/maktabahasan

ইসলামি ইতিহাস সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ, চতুর্থ খণ্ডের

সম্মানিত অনুবাদপর্ষদ—

- মাওলানা আতাউল কারিম মাকসুদ
- ড. মো. মনিরুজ্জামান
- মাওলানা আবু তালহা সাজিদ

এবং সম্মানিত সম্পাদনা পর্ষদ—

- মুফতি তারেকুজ্জামান
- মাওলানা ইমরান রাইহান
- মাওলানা মোহাম্মদ নোমান আল-আজহারী
- মাওলানা আব্দুর রহীম আল-আজহারী
- মাওলানা সদরুল আমীন সাকিব
- মাওলানা মাসুম বিল্লাহ

সংক্ষিপ্ত সুচি

* * *

أَرَضِيْتَ أَنْ يَحْظَى سِوَاكَ بِقُرْبِهِ — أَبَدًا وَأَنْتَ مُعَذَّبٌ مَهْجُوْرٌ

مَهِّدْ لِنَفْسِكَ حُجَّةً تَنْجُوْ بِهَا — يَوْمَ الْمَعَادِ وَيَوْمَ تَبْدُو الْعُوْرُ

তবে কি চাও কি তুমি, সবাই যখন করবে গ্রহণ তাহার শরণ;
অসহায় করবে তুমি আর্তনাদে-যন্ত্রণাতে শাস্তিবরণ?
এখনো যায়নি বেলা অস্তাচলে, নাও গুছিয়ে নাজাত-ওজর;
পরকাল বড়ই কঠিন করবে প্রকাশ সকল জনের গোপন খবর!

* * *

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

ষষ্ঠ অধ্যায়

মোঙ্গল মুসলিমদের ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ-৪৯

পূর্ব ইউরোপ ও পশ্চিম সাইবেরিয়ায় মোঙ্গল শাসন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-৮১
ইরানে মোঙ্গল শাসন

বিষয় পৃষ্ঠা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ-১১১

চীন ও মঙ্গোলিয়ায় মোঙ্গল শাসন

বিষয় পৃষ্ঠা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ-১২৩
পশ্চিম তুর্কিস্তানে মোঙ্গল শাসন

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ-১৫৩

হিন্দুস্তানে মুসলিম শাসন

সপ্তম অধ্যায়
উসমানি সাম্রাজ্য

প্রথম পরিচ্ছেদ-১৯৩
উসমানি সাম্রাজ্য : উত্থান ও পতন

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

মানচিত্র সূচি

ষষ্ঠ অধ্যায়

মোঙ্গল মুসলিমদের ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্ব ইউরোপ ও পশ্চিম সাইবেরিয়ার মোঙ্গল সাম্রাজ্য

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইরানে মোঙ্গল শাসন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চীন ও মঙ্গোলিয়ায় মোঘল শাসন

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পশ্চিম তুর্কিস্তানে মোঙ্গল শাসন

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হিন্দুস্তানে মুসলিম শাসন

মোঙ্গল মুসলিমদের ইতিহাস

তাতার কিংবা 'মোঙ্গল' নাম শুনলে অনেক মানুষের কল্পনায় পাশবিকতা, ধ্বংসলীলা ও নির্মমতার এমন সব চিত্র ভেসে ওঠে—যার সাথে মানবতার ন্যূনতম কোনো সম্পর্ক নেই। এ বিরূপ ধারণার কারণ হলো, উত্থানকালে তাতাররা সৈন্যসামন্ত নিয়ে মুসলিম জাহানের ওপর এমনভাবে আক্রমণ করেছিল যে, অনেকের ধারণা হয়ে গিয়েছিল, মুসলমানদের পতন বুঝি শুরু হয়ে গেছে এবং তাদের নিশ্চিহ্ন হওয়া সময়ের ব্যাপারমাত্র। অনেক মুসলিম পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক মুসলিম বিশ্বের শোকগাথা লিখেছিলেন। তাতাররা পুরো ইসলামি বিশ্ব দখল করে যেসব (ন্যক্কারজনক ও বীভৎস) ঘটনা ঘটায়, তার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দিতে তারা অক্ষম ছিলেন।

মোঙ্গল জাতির ইতিবৃত্ত

এরা মূলত চীনের উত্তরাঞ্চলঘেঁষা বর্তমান মঙ্গোলিয়ার গোবি মরুভূমির অধিবাসী।[১] এর উপজাতিগুলো পশু চারণের পেশায় নিয়োজিত ছিল। এরা মূর্তি, তারকা এবং সূর্যোদয়ের সময় সূর্যের পূজা করত। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তারা শামানিজমের অনুসারী ছিল। পূর্ববর্তীদের রুহকে পবিত্র মনে করত। হিংস্র পশুদের সামনে পশু উৎসর্গ করত।[২]

তাতার শব্দটি মূলত মোঙ্গল, তুর্কি, উইঘুর, সেলজুক ও এতদঞ্চলীয় মানুষের উপাধি। সুতরাং তাতার বলতে মোঙ্গল ও তুর্কি দুই জাতিকেই

---

১. ইমাম যাহাবি রহ. লিখেছেন, 'তারা চীন এবং তুর্কিস্তান থেকে এসেছিল।' *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ২২/২২৫। –সম্পাদক

২. তাতারদের ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে ইবনুল আসির লিখেছেন, তারা সূর্যোদয়ের সময় সূর্যকে সিজদা করে। তারা কোনোকিছুকেই হারাম মনে করে না। তারা কুকুর, শূকর-সহ সকল প্রাণী খায়। বিবাহ সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। একজন মহিলার সাথে একাধিক পুরুষ সম্পর্ক রাখে। সন্তান জন্মের পর তার পিতার পরিচয় জানা যায় না। (*আল-কামিল ফিত তারিখ*: ১২/৩৬০) ইবনু তাইমিয়া রহ. বলেন, সেনাদের মধ্যে খ্রিষ্টান, মুশরিক এবং মুসলমানও ছিল, তবে তাদের মধ্যে ইসলামের খুব কম নিদর্শনই বিদ্যমান ছিল। (*মাজমুউল ফাতাওয়া*: ২৮/৫০৩-৫০৫) –সম্পাদক

বোঝায়। এ অধ্যায়ে মোঙ্গল জাতির আলোচনা, আর উসমানি সাম্রাজ্যের অধ্যায়ে তুর্কিদের আলোচনা সবিস্তারে করা হবে ইনশাআল্লাহ।

মোঙ্গল বলতে স্বজাতীয় লোকদের পাশাপাশি এসব গোষ্ঠীকেও বোঝানোর কারণ হলো, মোঙ্গল জাতির জনক চেঙ্গিস খান তার আশপাশের অন্যান্য অঞ্চলেও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বরং মোঙ্গল বলতে (মধ্য) এশিয়ার অধিকাংশ জাতিকেই বোঝানো হয়।

এখন প্রশ্ন হলো, শোষণ ও হত্যা ছাড়া মুসলমানদের ইতিহাসে মোঙ্গলদের অবদান আর কী ছিল? আপনি মুসলমান হিসেবে মোঙ্গলদের বাগদাদ ধ্বংস ও আইনে জালুতে তাদের পরাস্ত হওয়া ছাড়া তাদের ব্যাপারে আর কী ইতিহাস জানেন?

এর উত্তর হচ্ছে—যা এখনো অনেক মুসলমান জানে না, মুসলমানদের ভূখণ্ডে প্রবেশের পঁয়ত্রিশ বছর পর মোঙ্গলদের অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। বরং মুসলমানদের ভূমিতে তাদের প্রবেশের অর্ধ-শতাব্দী যেতে না যেতেই তাদের অধিকাংশ লোক মুসলমান হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের অনেককে দিয়েই আল্লাহ তাআলা ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন। বহু ভূখণ্ড বিজয় করে তারা সেখানে মুসলমানদের ভিত মজবুত করেছে, যা দীর্ঘদিন পর্যন্ত অক্ষত ছিল। বরং তাদের অনেকে তো ইসলামের খাতিরে স্বজাতির সাথেও যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে।

মুসলমানদের ভূখণ্ড দখল করার উদ্দেশ্যে তৈমুর লংয়ের নেতৃত্বে মোঙ্গল ও তাতারি আগ্রাসন হালাকু খানের পর পুনরায় সাধারণ মুসলমানদের কাছে তাতারি ধ্বংসচিত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে এবারের আগ্রাসনে তাতাররা সবাই মুসলমান। তারা এমন সব পদ্ধতি ও কর্মপন্থা অবলম্বন করে, যা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাদের পূর্বপুরুষদের সকল কদর্যতাকে ছাপিয়ে যায়।

আমরা অস্বীকার করি না যে, ইসলাম গ্রহণের পরও তাতারদের বড় একটি অংশই পূর্ববর্তীদের অভ্যাস-চরিত্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। আর ইসলামি আকিদা এবং দাওয়াহর অবস্থাও পূর্বেকার মুসলমানদের যুগের মতো ছিল না। কিন্তু আমাদের এ কথা ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে, মুসলমানদের ইতিহাসে তাদের অবদান ও ইসলামি ভূখণ্ডের সীমা বৃদ্ধি করতে তাদের পদক্ষেপ এমন অভূতপূর্ব ছিল, আজ পর্যন্ত যার পুনরাবৃত্তি

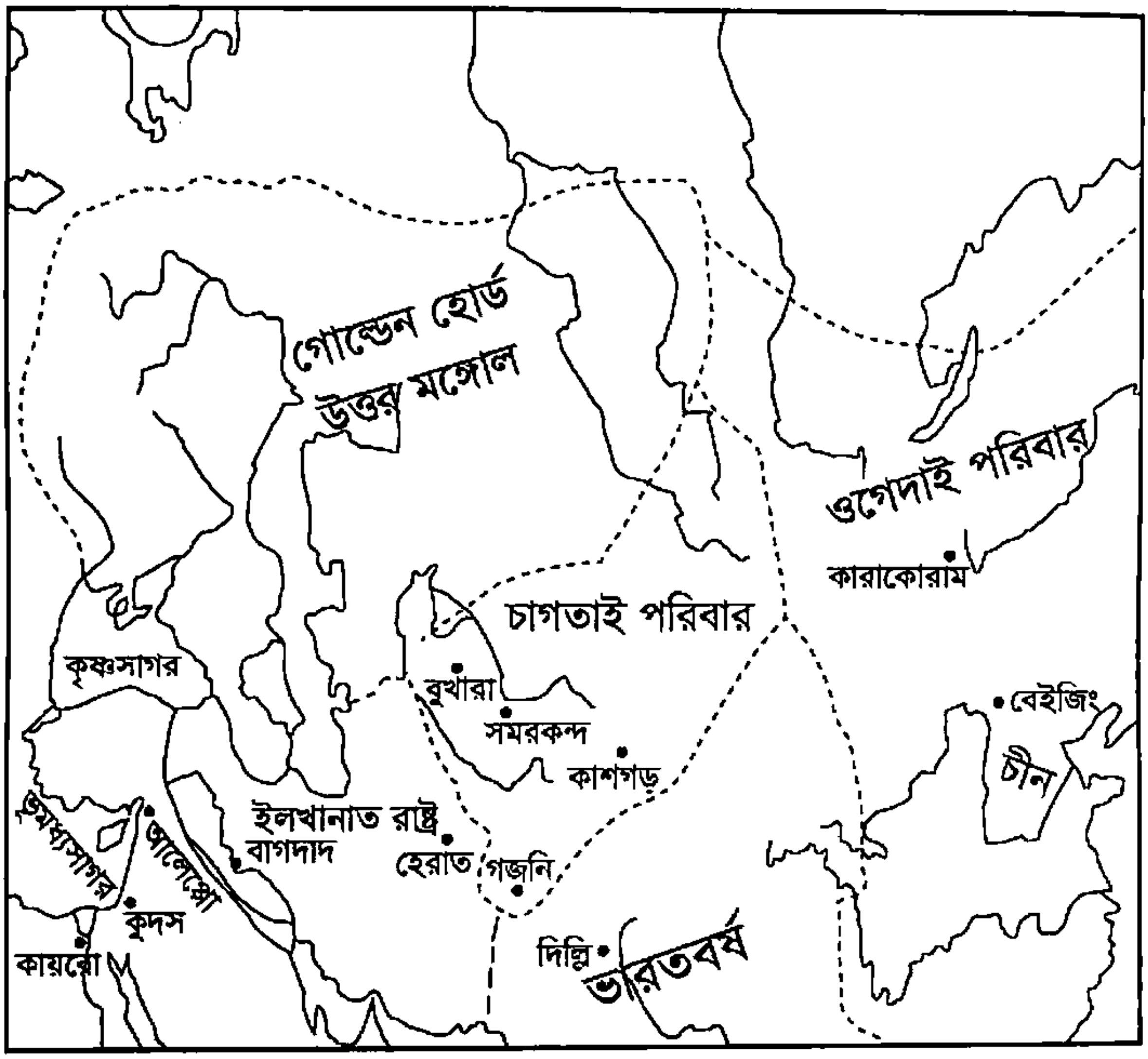
ঘটেনি। এমনইভাবে যেসব অঞ্চলে মুসলমানরা ইতিপূর্বে পা ফেলতে পারেনি, সেখানেও তারা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। তাদেরকে উৎখাত ও নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামের শত্রুদের অব্যাহত ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও তারা সেসব অঞ্চলে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করেছে। এজন্য তারা অমানুষিক কষ্ট সহ্য করেছে এবং আজও সয়ে যাচ্ছে। এতসব বিপর্যয়ের মুখেও তারা তাদের ধর্মকে আঁকড়ে ধরে আছে। যেদিন মুসলমানরা সঠিক পথে (তথা খিলাফতের পথে) ফিরে আসবে, সেদিন এসব অঞ্চলে ও পুরো পৃথিবীতে মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে এসব মুসলমান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে ইনশাআল্লাহ।

আমরা বলতে পারি যে, তাতার মুসলমানরা প্রাচ্য থেকে আরব ও মধ্য ইউরোপের সীমান্ত পর্যন্ত ইসলামের ভূখণ্ড বিস্তৃত করেছিল। তাদের ইতিহাসে ধোঁয়াশা থাকার অন্যতম কারণ হলো, তারা তাদের শাসিত সমাজের সাথে মিশে একাকার হয়ে যায় এবং সেই সমাজের অংশে পরিণত হয়। অপরদিকে তাদের বিশাল সাম্রাজ্য বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যায়। এ সকল রাষ্ট্রের মধ্যে অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ চলতেই থাকে। ফলে তারা ইসলাম গ্রহণের পরও একক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। এমনকি তৈমুর লং মোঙ্গল সাম্রাজ্যের বিশাল অংশ নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করতে সক্ষম হলেও এসব এলাকার বিচ্ছিন্নতাকে ঠেকাতে পারেননি।

মোঙ্গলদের বৃহৎ সাম্রাজ্য যেভাবে ভাগ হয়

চেঙ্গিস খান পৃথিবীর বড় একটি অংশকে দখল করে নিয়েছিলেন এবং তার সাম্রাজ্যের রাজত্বভার প্রথমা স্ত্রীর সন্তানদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। মোঙ্গল সংবিধান 'ইয়াসাক'-এর আইন অনুযায়ী এটি সম্পন্ন হয়েছিল। তখন তিনি তার বড় ছেলে জোচি খানকে রাশিয়া, খোয়ারিজম (খিভা), ককেশাস, কাজান (যা বর্তমানে রাশিয়ার অন্তর্গত) ও পশ্চিমের বিস্তৃত অঞ্চলগুলো দিয়ে দেন। তার আরেক ছেলে চাগতাইকে দেন উইঘুর অঞ্চল (বর্তমান চীনের কাংসু প্রদেশ), পশ্চিম তুর্কিস্তান ও মাওয়ারাউন নাহার (ট্রান্সঅক্সিয়ানা)-এর দেশগুলো। তার ছেলে তুলুইকে দেন খোরাসান, পারস্য এবং আরব ও এশিয়া মাইনরের সম্ভাব্য বিজিত অঞ্চলগুলো। তার আরেক ছেলে ওগেদাইকে বর্তমান মঙ্গোলিয়া, চীন, পূর্ব তুর্কিস্তান এবং প্রাচ্যের বিজয়সম্ভাব্য অঞ্চলগুলোর দায়িত্ব দেন।

আমরা এই অধ্যায়ে প্রতিটি অঞ্চলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত অঞ্চলগুলোর ইতিহাস বিবৃত করব। আর হিন্দুস্তানের ইতিহাস নিয়ে এর শেষাংশে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা উপস্থাপন করব, যেখানকার শেষ মুসলিম শাসন ছিল এই মোঙ্গল (মোঘল) জাতির হাতে।



মানচিত্র নং-১১
মোঙ্গল রাষ্ট্রবিভাজন-পরবর্তী মানচিত্র

বস্তুত, তাদের সময়েই হিন্দুস্তানে ইসলামি রাষ্ট্র সবচেয়ে বেশি প্রসারিত হয়েছিল। অতএব, নিম্নবর্ণিত ধারায় আমাদের আলোচনা উপস্থাপিত হবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইউরোপের পূর্বাঞ্চল ও সাইবেরিয়ার পশ্চিমাঞ্চল।
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইরান অঞ্চল।
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : চীন ও মঙ্গোলিয়া।
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : পশ্চিম তুর্কিস্তান অঞ্চল।
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ভারতবর্ষ।

মূল আলোচনা শুরু করার পূর্বে তাতারদের মধ্যে ইসলাম প্রসারের আলৌকিকতা নিয়ে আল্লামা আবুল হাসান আলি নদবি রহ.-এর মূল্যবান কিছু কথা উদ্ধৃতি করব।

তাতারদের মধ্যে ইসলামের প্রসার

মুসলিম ইতিহাসবিদ ও বিজ্ঞজনদের মতে তাতারদের ধ্বংসযজ্ঞের স্রোতে ইসলামি বিশ্ব প্রায় ভেসে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, এর সকল চিহ্ন ও ঐতিহ্য প্রায় মুছেই যেতে বসেছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই তাতারদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে এবং ইসলামের দাঈদের ওসিলায় যে সাফল্য আসে, এতদিনের তির-বর্শা ও সুলতান-বাদশাহদের শক্তিপ্রয়োগেও তা সম্ভব হয়নি। ইসলাম তার (পূর্বের) শত্রুদের অন্তরে জায়গা করে নিতে থাকে এবং তাদের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। মুসলমানদের ওপর কর্তৃত্বকারী এ জনগোষ্ঠীর ইসলামের সামনে নত হয়ে যাওয়াটা ছিল ইতিহাসের দুর্লভ ও আশ্চর্যজনক একটি অধ্যায়। কেননা, তাতাররা ইসলামি বিশ্বের ওপর বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় হামলে পড়েছিল। আর সমগ্র ইসলামি বিশ্বে তাদের দখলদারি প্রতিষ্ঠা করা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় ছিল না, যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা-ই মনে হয়। কেননা, সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামি বিশ্ব সামগ্রিকভাবে ওই সকল ব্যাধি ও দুর্বলতায় আক্রান্ত ছিল, যা সাধারণত কোনো জাতি সভ্যতা ও শক্তির উচ্চ শিখরে আরোহণ করলে হয়ে থাকে। অপরদিকে তাতাররা হলো এমন শক্তিশালী জনগোষ্ঠী, যারা গ্রামীণ জীবন থেকে উঠে এসেছে। নির্বুদ্ধিতা ও পাষণ্ডতা যাদের রক্তমাংসে মিশে আছে। তবে অবাক করা বিষয় হলো, এই সম্প্রদায়ই পরাজিত ও অধীনস্থ মুসলমানদের সামনে নত হয়ে গেছে এবং নিজেদের শক্তিসামর্থ্যের সর্বোচ্চ চূড়ায় অবস্থান করেও ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে। অথচ ইসলাম তখন রাজনৈতিক ও বস্তুগত সকল ক্ষমতাই হারিয়ে বসেছিল। তখন তাতারদের দৃষ্টিতে মুসলমানরা ছিল উপহাস ও উপেক্ষার পাত্র।

টি. ডব্লিউ. আর্নল্ড এ বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে তার বিখ্যাত গ্রন্থ *preaching of islam*-এ লিখেছেন, 'কিন্তু তখন হারানো গৌরব ও শৌর্যবীর্যের ধ্বংসস্তূপ থেকে গা ঝাড়া দিয়ে জেগে ওঠা ইসলামের জন্য খুবই জরুরি ছিল। আর ইসলাম তার দাঈদের চেষ্টা-মেহনতে বিজয়ী ও বর্বর তাতারদেরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতে এবং তাকে দ্বীন হিসেবে

গ্রহণ করিয়ে নিতে সক্ষমও হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অবদানই ছিল ওই সকল মুসলিম দাঈর, যারা তৎকালীন আরও দুটি শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মের মোকাবিলা করতে চরমভাবে হিমশিম খাচ্ছিল। যেগুলো তখন যেকোনো উপায়েই এই প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যেতে সচেষ্ট ছিল। বিশ্বের ইতিহাসে এই প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় কোনো নজির নেই। এই তুমুল প্রতিযোগিতাটি সংঘটিত হয় খ্রিষ্টবাদ, ইসলাম ও বৌদ্ধ ধর্মের মাঝে। প্রত্যেকটি ধর্মই অপর ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। প্রত্যেকেই চাইত ওই সকল বিজয়ী তাতারদের হৃদয় জয় করতে, যারা অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে সকল অঞ্চলেই সব ধর্মের অনুসারীদের মাথা নত করে দিয়েছিল।'

(তিনি আরও বলেন,) 'বোঝা যায়, মোঙ্গল শাসনের আওতাধীন অঞ্চলে ইসলামের খ্রিষ্ট ও বৌদ্ধ ধর্মের মতো অন্যান্য শক্তিশালী ধর্মের সাথে পেরে ওঠা সহজ ছিল না। বরং এই দুই ধর্মের সাথে প্রতিযোগিতায় সাফল্য পাওয়া ছিল কল্পনাতীত। কেননা, মুসলমানরা তখন অন্যদের চেয়ে মোঙ্গলদের হামলায় বেশি পর্যুদস্ত হয়েছিল। এমনকি এশিয়া মহাদেশের মধ্যে সে সময়ের ধর্মীয় ও ইসলামি জ্ঞানের সর্বোচ্চ কেন্দ্রীয় শহরগুলোর অধিকাংশই বিরান ও অকেজো হয়ে গিয়েছিল। ফকিহ ও সুফি দরবেশদের পরিণাম ছিল মৃত্যু অথবা বন্দিত্ব। মোঙ্গলদের যে সকল বাদশাহ সকল ধর্মের প্রতি কিছুটা সহনশীল ছিল তাদেরও অনেকে ইসলাম ধর্মের প্রতি বিভিন্ন মাত্রায় ঘৃণা প্রকাশ করেছে। চেঙ্গিস খান ইসলাম-নির্ধারিত পদ্ধতিতে যারা জীবজন্তু জবাই করে, এমন প্রত্যেককে হত্যা করার ফরমান জারি করেছিলেন। কুবলাই খানও এ কাজে তার অনুসরণ করেন। বরং একধাপ এগিয়ে তিনি ইসলাম-নির্ধারিত পদ্ধতিতে যারা পশু জবাই করে, তাদেরকে দেখিয়ে দিতে পারলে পুরস্কার দিতেন। তিনি মুসলমানদের সাত বছর যাবৎ অনেক নিপীড়ন করেন এবং অনেককে হত্যা করেন। অবস্থা এমন ছিল যে, বহু নিঃস্ব দেউলিয়া ওই আইনের ভিত্তিতে মুসলমানদের সম্পদ উপার্জনের সুযোগ পেয়ে যায়। বহু ক্রীতদাস তাদের মুসলিম মনিবের ব্যাপারে এ রকম মিথ্যা অপবাদ দিয়ে মুক্ত হয়ে যায়। ১২৪৬-১২৪৮ খ্রিষ্টাব্দে গুয়ুক খানের শাসনামলে মুসলমানরা নিপীড়ন ও পাষণ্ডতার সর্বোচ্চ পর্যায় দেখেছে। তিনি রাষ্ট্রের দায়দায়িত্ব তার দুইজন খ্রিষ্টান উজিরের (মন্ত্রী) হাতে দিয়ে রেখেছিলেন। তার আদালতে খ্রিষ্টীয় পাদরিদের আনাগোনা ছিল বেশি।'

তিনি আরও লেখেন, '১২৮৪-১২৯১ খ্রিষ্টাব্দে পারস্যে মোঙ্গল ইলখানাতের[৩] চতুর্থ সুলতান আরগুন সে দেশের মুসলমানদেরকে অত্যাচার করেন এবং মুসলমানরা অর্থনৈতিক ও বিচারবিভাগের যেসব পদে এতদিন নিয়োজিত ছিল, সেখান থেকে তাদেরকে পদচ্যুত করেন। রাজপ্রাসাদে তাদের যাওয়া নিষেধ করে দেন। এত জটিলতা থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত এই বর্বর অত্যাচারী মোঙ্গলরা মুসলমানদের ধর্মই গ্রহণ করে, যাদেরকে এতদিন তারা জুলুম-অত্যাচারে জর্জরিত করে রেখেছিল এবং পদতলে পিষ্ট করে আসছিল।

নিশ্চয়ই এটি বিস্ময়কর এক ইতিহাস। তবে আমাদের অবাক হতে হয় এই ভেবে, এসব বিবৃতি ইতিহাসে বিস্তারিত ও বিশদভাবে পাওয়া যায় না। আমরা ওই সকল বীর ও মহাত্মাদের নামই এখনো জানতে পারিনি, যারা মুসলমানদের এই বিশাল অবদানের জন্ম দিয়েছেন এবং মোঙ্গলদের মতো এত পাষাণ এক জাতিকে ইসলামের ছায়াতলে এনেছেন। অথচ ইতিহাসে ইসলামি অবদান হিসাবে এগুলো কোনো অর্থেই কম গুরুত্বের নয়। তাদের অবদান শুধু মুসলমানদের ওপরেই নয়; বরং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমগ্র মানবজাতির ওপর। কেননা, তারা এ বিশ্বকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন এবং তাকে এমন এক জাতির ছায়াতলে এনেছিলেন, যারা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছেন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধর্মের প্রতি আন্তরিকভাবে অন্যদের দাওয়াত দিয়েছেন।

---

৩. **ইলখানাত** (ফারসি: ایلخانان, *Ilkhanan*; Mongolian : Хүлэгийн улс, *Hulagu-yn Ulus*) ছিল মোঙ্গল সাম্রাজ্য হতে উদ্ভূত একটি খানাত (রাজ্য)। এটি মোঙ্গল হালাকু খানের পরিবার কর্তৃক শাসিত হয়। খ্রিষ্ট ১৩ শতাব্দীতে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইরান ছিল এর প্রাথমিক ভিত্তিভূমি। এ ছাড়াও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল যেমন বর্তমান আজারবাইজান এবং তুরস্কের মধ্য ও পূর্বাঞ্চল এর অন্তর্গত ছিল। ইলখানাত মূলত চেঙ্গিস খানের খোয়ারিজমীয় সাম্রাজ্য অভিযানের ওপর ভিত্তি লাভ করে এবং হালাকু খান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। হালাকু খান চেঙ্গিস খানের নাতি ছিলেন। সাম্রাজ্যের শেষ সীমায় বর্তমান ইরান, ইরাক, তুর্কমেনিস্তান, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, জর্জিয়া, তুরস্ক, পশ্চিম আফগানিস্তান ও দক্ষিণ পশ্চিম পাকিস্তান এর সীমানাভুক্ত ছিল। মাহমুদ কাজান থেকে শুরু করে পরবর্তী ইলখানাত শাসকরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন। [উইকিপিডিয়া, ঈষৎ পরিমার্জিত] –সম্পাদক

চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর পর তার সাম্রাজ্য চারটি উপসাম্রাজ্যে বিভক্ত হয়। এই চার উপসাম্রাজ্যে ইসলাম ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। তাতাররাও তাদের শাসকদের প্রচেষ্টায় ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। মাত্র একশ বছরের মধ্যেই তাতাররা প্রায় সবাই ইসলাম কবুল করে নিয়েছিল।

আর্নল্ড এমন অনেক ঘটনাই বর্ণনা করেছেন, যা এ বিষয়ে আরও পরিষ্কার ধারণা দেয়। চেঙ্গিস খানের বড় ছেলে জোচি খান মোঙ্গল সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলীয় সিয়েরা দারদা শাসন করতেন। তার এলাকায় ইসলামের প্রচার-প্রসারের বর্ণনা দিতে গিয়ে আর্নল্ড বলেছেন—

'১২৫৬–১২৬৭ খ্রিষ্টাব্দের শাসক বারকে খান মোঙ্গল শাসকদের মধ্যে প্রথম মুসলমান। তিনি রাশিয়ায় ১২৫৬ ও ১২৬৭-এর মধ্যবর্তী সময়ে গোল্ডেন হোর্ডের গোত্রপতি ছিলেন। (এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, নাজমুদ্দিন মুখতার জাহিদি রহ. ১২৬০ সালে বারকে খানের জন্য একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেছিলেন, যা দলিল-প্রমাণ সহকারে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত প্রমাণ করে এবং রিসালাত অস্বীকারকারীদের বক্তব্য খণ্ডন করে। এ পুস্তিকাটি সে সময়ে মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের মাঝে হওয়া বিতর্ক সভাগুলোর চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে।)[৪] তার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে বলা হয় যে, তিনি একদিন বুখারা থেকে আগত একটি বাণিজ্যিক কাফেলার মুখোমুখি হন। দুইজন ব্যবসায়ীকে ইসলামি আকিদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তারা এমন চমৎকার সুন্দর ব্যাখ্যা পেশ করে যে, একসময় তিনি এ ধর্ম গ্রহণ করে নেন এবং এর প্রতি পুরোপুরি আন্তরিক হয়ে পড়েন। তিনি তার ছোট ভাইয়ের কাছেই প্রথমে তার ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেন এবং তাকেও তার পথে চলতে অনুপ্রাণিত করেন। এরপর তিনি ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন।'

---

৪. নাজমুদ্দিন মুখতার যাহেদি ছিলেন হানাফি মাজহাবের বিখ্যাত ফকিহ। তিনি রোম ও বাগদাদ সফর করেছিলেন। তাতার সম্রাট বারকে খান তার সাথে দেখা করে ইসলাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তখন তিনি নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রিসালাত প্রমাণ করে *আর-রিসালাতুন নাসিরিয়্যা* লেখেন। ১২৬০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার লেখা আরও কয়েকটি গ্রন্থ হলো, *আল-হাভি ফিল ফাতাওয়া*, *আল-মুজতাবা শারহু মুখতাসারিল কুদুরি*। (*আল-আলাম*, ৭/১৯৩, খাইরুদ্দিন যিরিকলি) –সম্পাদক

তিনি আরও বলেছেন, 'সুলতান বারকে খান মিশরের মামলুক শাসক রুকনুদ্দিন জাহের বাইবার্স (১২৬০-১২৭৭ খ্রি.)-কে মিত্র বানান। বাইবার্স নিজের পক্ষ থেকেই এ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সূচনা করেন। গোল্ডেন হোর্ডের দুইশ সৈন্যের ক্ষুদ্র একটি প্লাটুনকে তিনি অভ্যর্থনা জানান। (ঘটনার বিবরণ ছিল এরকম,) যখন বারকে খানের এসব সৈন্য তাদের সম্রাট এবং বাগদাদজয়ী হালাকু খানের মাঝে কঠিন শত্রুতার বিষয়টি বুঝতে পারল, তখন তারা সবাই সিরিয়ার দিকে পলায়ন করে। তাদের গন্তব্য ছিল মূলত মিশর। এখানে এসে তারা সুলতান বাইবার্সের রাজপ্রাসাদে উষ্ণ অভ্যর্থনা ও সম্মান পান। বাইবার্স তাদেরকে ইসলামের সত্যতার বিষয়টি বোঝাতে সক্ষম হন এবং তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। ইতিপূর্বে সুলতান বাইবার্স স্বয়ং হালাকু খানের সাথে যুদ্ধ করে তাকে পরাজিত করেছিলেন এবং কিছুদিন পূর্বেই তাকে সিরিয়া থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। সুলতান বাইবার্স এদের মধ্য থেকে দুইজন আশ্রয়প্রার্থী মোঙ্গল ও অন্যান্য কয়েকজন দূতকে একটি চিঠি নিয়ে বারকে খানের কাছে পাঠান। তারা মিশরে ফেরার সময় এ বার্তা নিয়ে ফেরে যে, বারকে খানের সাম্রাজ্যে প্রত্যেক শাসকের জন্য বিশেষ ইমাম এবং মুআজ্জিন নিয়োগ দেওয়া আছে। আর শিশুরা মাদরাসায় কুরআনে কারিম হিফজ করছে। সুলতান বাইবার্স ও বারকে খানের মাঝে সংঘটিত এ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ফলে গোল্ডেন হোর্ডের প্রতিনিধিদল প্রচুর পরিমাণে মিশরে আসতে থাকে এবং দ্বীন হিসেবে ইসলামকে গ্রহণ করে নিতে থাকে।'

আর্নল্ড চেঙ্গিস বংশের দ্বিতীয় সাম্রাজ্য ইলখানাতে ইসলাম প্রসারের বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করেছেন :

'পারস্যের দেশগুলোতে যেখানে হালাকু খান মোঙ্গল ইলখানাত বংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—খুবই সীমিত পরিসরে সেখানে ইসলামের প্রসার ঘটেছিল। বারকে খান এবং মিশরের সুলতানের আক্রমণকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে হালাকু খান আর্মেনিয়ার শাসক এবং ক্রুসেডারদের মতো খ্রিষ্টান শক্তিগুলোর সাথে মিত্রতা গড়ে তোলেন। হালাকুর সবচেয়ে প্রিয়তমা স্ত্রীও ছিলেন খ্রিষ্টান। তাই তিনি তার স্বামীকে স্বভাবতই তার ধর্মীয় ভাইদের পক্ষপাতিত্ব করতে ফুসলিয়ে থাকবেন। তিনি হালাকু খানের ছেলে আবাকা খানকে (১২৬৫-১২৮১ খ্রিষ্টাব্দ) কনস্টান্টিনোপলের সম্রাটের মেয়ের সাথে বিয়ে করিয়ে দেন। যদিও আবাকা খান তার নিজ

ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিষ্টবাদ গ্রহণ করেননি, তবু তার রাজ্য খ্রিষ্টান ধর্ম-পণ্ডিতদের দিয়েই মুখরিত ছিল। ইউরোপের বিভিন্ন শাসনকর্তার কাছে তিনি দূত পাঠিয়েছিলেন। ফ্রান্সের রাজা সেন্ট লুইস, সিসিলির রাজা শার্ল, অ্যারাগনের শাসক জেমস প্রমুখের সঙ্গে পত্রযোগাযোগ করে তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে মৈত্রী গঠন করতে চেয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে মোঙ্গলদের ষোলোজন রাষ্ট্রদূতকে ১২৭৪ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় লিউন সম্মেলনে প্রেরণ করা হয়। তখন প্রধান রাষ্ট্রদূত খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে। তাকে ও তার কয়েকজন সাথিকে খ্রিষ্টধর্মের নিয়মানুসারে জলে গোসল করিয়ে সে ধর্মে দীক্ষিত করা হয়। খ্রিষ্টানরা আরও আশাবাদী হয়ে ওঠে। তারা আবাকা খানের পক্ষ থেকেও খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের আশা করে। কিন্তু পরে প্রমাণিত হয় যে, এই সকল আশা ছিল মরীচিকা। তার ভাই তেকুদার আহমাদ[৫] ছিলেন পারস্যে ইসলাম গ্রহণকারী মোঙ্গল মুসলমানদের প্রথম বাদশাহ। তিনি খ্রিষ্টান ধর্মের ওপর বেড়ে উঠেছিলেন। যেমন, তার সমকালীন এক খ্রিষ্টান লেখকের বর্ণনা অনুযায়ী আমরা জানতে পারি, শৈশবে তিনি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তখন তার নাম ছিল নিকুলা। কিন্তু বয়স বাড়ার পর মুসলমানদের সাথে মেলামেশার সুবাদে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং একজন ধার্মিক মুসলমান হিসেবে পরিচিতি পান। খ্রিষ্টবাদ থেকে ফিরে এসে তিনি মুহাম্মাদ খান নাম ধারণ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি তার সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করেছেন সকল তাতারকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধর্মে নিয়ে আসতে। কিন্তু যখন তারা ধর্ম থেকে ফিরে আসার ব্যাপারে নিজেদের কঠোর মনোভাব প্রকাশ করল, তিনি আর তাদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করাতে সাহস পাননি। তবে তাদেরকে সম্মানজনক উপাধি, উপহার ও দান-দাক্ষিণ্য প্রদান করে সেই উদ্দেশ্যে লেগে থাকেন। ফলে এক বিশাল সংখ্যক তাতার তার সময়েই মুসলিম আকিদাবিশ্বাস গ্রহণ করে নেয়।'

তেকুদার আহমাদ তার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ চিঠি মারফত মিশরের মামলুক সুলতান কালাউনের কাছে পাঠান। চিঠির ভাষ্য ছিল :

মিশরের বাদশাহ বরাবর,

---

৫. তেকুদার আহমাদ বিন হালাকু খান। তিনি ১২৪৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৮২ থেকে ১২৮৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেন। -সম্পাদক

পরকথা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর সাহায্য ও হিদায়াতের আলো দিয়েই শৈশবে আমাদেরকে তাঁর রুবুবিয়্যাত এবং তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়ার তাওফিক দিয়েছেন। আরও তাওফিক দিয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের সত্যতার সাক্ষ্য দিতে এবং আল্লাহর নেককার ওলিদের প্রতি সুধারণা পোষণ করতে। আল্লাহ তাআলা যার মঙ্গল চান, তার অন্তরকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। তাই আমরা ক্রমাগত আল্লাহর কালিমাকে সুউচ্চ এবং মুসলমান ও ইসলামি শরিয়তকে সমুন্নত রাখার প্রতি ঝুঁকছি। মহান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ আমাদের ওপর যে, তিনি আমাদের বংশকে এক মহারাজত্ব দান করেছেন। আমার ভাই এখন সেই রাজত্বের কর্ণধার। আমাদের সাম্রাজ্যের জ্ঞানী-গুণী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি, সকল ভাই, সন্তানসন্ততি, আমির, গভর্নর, সেনাপতি, গোত্রপতিসহ আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, আমাদের এই সুবিশাল বাহিনী, যাদের পদভারে ধরণি যেন ক্লান্ত, যাদের শক্তিমত্তা ও প্রাচুর্যের কারণে সমগ্র বিশ্ব ভীত-সন্ত্রস্ত, তাদের এক বিরাট অংশ আমরা এতদিন যে কাজে মগ্ন ছিলাম, এখন সবাই ভুল বুঝতে পেরেছি। যে সত্য ও সুন্দর প্রতিষ্ঠা করা আমাদের কর্ম ছিল, তার সাথে আমাদের বর্তমান কর্মের কোনো মিল নেই। মূলত ইসলামের সত্য-সুন্দর পথ অবলম্বন করলেই সে লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে। রক্তপাত ও হানাহানির পথ বর্জন করে শান্তি ও নিরাপত্তা (যা এতদিন আমরাই নষ্ট করেছি) পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া আমাদের কর্তব্য।

এর মাধ্যমে মুসলিমরা শহর-নগরে শান্তি ও নিরাপত্তার জিন্দেগি যাপন করবে। এতে সম্মান জানানো হবে আল্লাহর নির্দেশনাকে এবং এতে সৃষ্টিজগতের প্রতি সদাচার করা হবে। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দিয়েছেন। আমরা চাই এতদিনের প্রজ্বলিত আগুন নিভিয়ে দিতে, ফিতনা-ফাসাদ বিলুপ্ত করতে, বিশ্বের জন্য যা কল্যাণকর তা করতে এবং যা অকল্যাণকর তা দূর করতে। এখন আর আমরা উপযুক্ত কারণ তালাশ না করে রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ব

না। এখন থেকে আমাদের দৃঢ় নিয়ত হলো, সর্বদা সততার ওপর অটল থাকব এবং সফলতার জন্য যা প্রয়োজন তাই করব।

আমরা শাইখ কুতুবুদ্দিন এবং আতাবেক বাহাউদ্দিনকে আমাদের বিচারবিভাগ এবং ইসলামি বিষয়ে সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্য নির্বাচন করেছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন সত্য পথ ও তার পথিকদের অনুসরণ করার আগ্রহ। কেউ যদি ইসলামের নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনো প্রমাণ তালাশ করে, তাহলে তা সে আমাদের পুরাতন অবস্থা ও বর্তমান অবস্থা দেখলেই পাবে। এখন থেকে আমরা আল্লাহর কালিমা সমুন্নত করার মেহনত শুরু করলাম। ইনশাআল্লাহ আমরা ইসলামের প্রতিটি নির্দেশ বাস্তবায়ন করব। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত দ্বীনের চাহিদা অনুযায়ী এই দ্বীনকে অন্য সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দেবো। আমরা জনগণের অন্তরে প্রশান্তির বাতাস বইয়ে দিতে চাই। এতদিন আমাদের সাথে যে যা করেছে, সব ক্ষমা করে দিয়েছি। সবার সাথে ক্ষমার আচরণ প্রদর্শন করছি। সবাইকে বলেছি, ইসলাম গ্রহণের দ্বারা আল্লাহ পেছনের সব অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

মুসলমানদের ওয়াকফ সম্পত্তি তথা মসজিদ, মাদরাসা ও দর্শনীয় স্থান সংস্কারে হাত দিয়েছি। হাজিদের কাফেলাকে সম্মান করতে সবাইকে নির্দেশনা দিয়েছি। বরং তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী জোগান দিয়ে কাফেলা তৈরি করে দিতে বলেছি। পথের নিরাপত্তা বিধান ও নির্বিঘ্নে চলাচল নিশ্চিত করতে বলেছি। এসব দেশে গমনাগমনকারী বাণিজ্যিক কাফেলার জন্য সীমান্ত উন্মুক্ত করে দিয়েছি। তাদের ইচ্ছামতো ও প্রয়োজন অনুযায়ী যেখানে ইচ্ছা তারা যেতে পারে। এসব পূরণের জন্য মিশরের সুলতানের সাথে সন্ধি করা প্রয়োজন। এতে বিরান ভূমিগুলো আবার আবাদ হবে। বিশৃঙ্খলা দূর হবে। ধারালো তলোয়ার কোষবদ্ধ হবে। সবাই সুখ শান্তির দেশে বাস করবে। মুসলিম উম্মাহর অপমান ও অপদস্থতার দিন সমাপ্ত হবে।

যারা মোঙ্গল ইতিহাস পড়বে, এটা তাদের ভালো লাগার একটা অনুষঙ্গ হবে যে, নিপীড়ন ও রক্তপ্রবাহের ঘটনা পড়ে শেষ করতেই সর্বোচ্চ

মানবতা ও সম্প্রীতির একটি অধ্যায়ের শুরু করতে পারবে। যার বর্ণনা মিশরের মামলুক বাদশাহকে লেখা তেকুদার আহমাদের চিঠিতে আছে। মোঙ্গলদের মতো নিষ্ঠুর এই জাতিগোষ্ঠী থেকে এমন এমন আচরণ প্রকাশিত হতে পারে ভেবে বিস্মিত হবে পাঠক।

তেকুদার আহমাদের খ্রিষ্টান নির্যাতন ওই সকল মোঙ্গলীয়দের রাগিয়ে তুলেছিল, যারা ধর্ম ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও খ্রিষ্টানদের সাথে খুব মিশে চলত। তারা এই অভিযোগ উত্থাপন করে কুবলাই খানের কাছে আর বলে, তেকুদার খান তার পূর্বসূরিদের আদর্শ মানে না। তখন তার বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ গড়ে ওঠে, যার মূলে ছিল তারই ভ্রাতুষ্পুত্র আরগুন। তিনি তাকে হত্যাপূর্বক তার সিংহাসনে বসেন। আরগুনের সংক্ষিপ্ত শাসনামলে ১২৮৪ থেকে ১২৯১ পর্যন্ত খ্রিষ্টানরা তাদের আসনে নতুনভাবে জেঁকে বসে। অপরদিকে জুলুম-নির্যাতন সয়ে যাওয়া ছাড়া মুসলমানদের আর কোনো উপায় থাকে না। তাদেরকে অর্থনৈতিক ও বিচার সংশ্লিষ্ট সব বিভাগ থেকে বিতাড়িত করা হয় এবং রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করাও তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়।

কিন্তু ১২৯৫ সালে ইলখানাতের সপ্তম সুলতান গাজান (শাসনকাল ১২৯৫-১৩০৪ খ্রিষ্টাব্দ) ইসলাম গ্রহণের আগ পর্যন্ত তেকুদারের পরবর্তী শাসকরা তারকা পূজাতেই পড়ে ছিল। তিনি এসে ইসলামকে পারস্যের রাষ্ট্রীয় ধর্ম ঘোষণা করেন। গাজানের আগে শেষ তিন মোঙ্গল শাসকের সময়ে খ্রিষ্টানরা পারস্যের শাসক পরিবারকে ইসলাম ধর্ম থেকে বিমুখ করতে বেশ আশাবাদী হয়ে উঠেছিল। এই পরিবারই তাদের প্রতি অনেক বেশি সহানুভূতি দেখাতে তাদেরকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়েছিল। গাজানের আগের ছিলেন বাইদো খান। পারস্যে ফিতনার মূলে তিনিই ছিলেন। ১২৯৫ সালে মাত্র কয়েক মাস তিনি ক্ষমতায় অবস্থান করেন। তিনি খ্রিষ্টধর্মকে ইসলামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করতেন। এমনকি মোঙ্গলদের মাঝে যেন ইসলাম প্রসারিত না হয়, সেজন্য প্রতিবন্ধক দাঁড় করাতে শুরু করেন। তিনি তার রাজ্যে ইসলাম প্রচার নিষিদ্ধ করে দেন।

গাজান বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের আগে খোরাসানের বেশকিছু বৌদ্ধ উপাসনালয় সংস্কার করেন। তিনি এ ধর্মের যাজকদের সংশ্রবে খুবই আনন্দিত হতেন। মোঙ্গলরা যখন থেকে এই অঞ্চলে রাজত্ব বিস্তার করেছে, তখন থেকেই এসব যাজকেরা প্রচুর পরিমাণে এই অঞ্চলে

আসতে শুরু করে। তবে বোঝা যায়, সুলতান গাজানের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের প্রতি ঝোঁক ছিল। কেননা, তিনি তৎকালে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন।[৬]

তার উজির রশিদ উদ্দিন[৭], যিনি একজন আলেম এবং সে সময়ের ইতিহাসবেত্তা, তাকে ইসলামের সত্যতা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। যা তাকে তার পুরো রাজত্বকালে ইসলামের রীতিনীতিকে মর্যাদার সাথে রক্ষা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

ইবনে কাসির রহ. গাজানের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ৬৯৪ হিজরির কথা উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকদের মতামত পরখ করলেও প্রমাণিত হয় যে, এ ক্ষেত্রে অবদান স্বীকার করতে হবে তুর্কি আমির তোজোনের। কেননা, তাতারদের রাজা তার চেষ্টা-শ্রমের বিনিময়েই ইসলাম গ্রহণ করেন।

৬৯৪ হিজরির ঘটনা বিবৃত করতে গিয়ে ইবনে কাসির রহ. লেখেন, তখন তাতারদের বাদশাহ কাজান বিন আরগুন বিন আবাকা বিন তুলুই বিন[৮]

---

৬. সুলতান গাজান মামলুক সুলতানের সাথে লড়াই করেছিলেন। তাকে নিরুৎসাহিত করতে ইমাম ইবনে তাইমিয়া তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু গাযান ইমামের আহ্বানে সাড়া দেননি। ফলে তার প্রেরিত বাহিনীর সাথে ৭০২ হিজরিতে মামলুকদের ঐতিহাসিক শাকহাবের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। গাজানের সাথে ইবনে তাইমিয়ার সাক্ষাতের ঘটনা ইমাম যাহাবি *তারিখুল ইসলাম* (৫২/৭০) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন । ইবনু কাসির *আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ* (১৭/৭১৭) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া ঘটনাটি বিস্তারিত জানতে উমর বিন আলি বাজ্জার রচিত *আল-আলামুল আলিয়্যা ফি মানাকিবি শাইখিল ইসলাম ইবনি তাইমিয়্যাহ* গ্রন্থের ৬৩-৬৬ পৃষ্ঠা দেখা যেতে পারে। শাকহাবের যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ জানতে দেখুন, আল্লামা মাকরিজি রচিত *আস-সুলুক লি-মারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক*: ২/৩৫৫, ৩৫৬, । মুহাম্মদ বিন ইয়াস হানাফি রচিত *বাদায়িউয যুহুর ফি ওয়াকায়িউদ দুহুর*: ১/৪১৩। -সম্পাদক

৭. রশিদুদ্দিন ফজলুল্লাহ হামাদানি। তিনি একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ও ঐতিহাসিক। ১২৪৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাতারদের ইতিহাস বিষয়ে তার লিখিত *জামিউত তাওয়ারিখ* গ্রন্থটি আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। পৃথিবীর বহু ভাষায় এটি অনুবাদ হয়েছে। ১৩১৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন। -সম্পাদক

৮. অনেক স্থানে এরকম ইবনে/বিন শব্দ ও তার দু-পাশে নামের ধারা পাওয়া যায়। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, ইবনে/বিন আরবি শব্দটির অর্থ হচ্ছে সন্তান, পুত্র ইত্যাদি। এই শব্দটি আরবি ভাষায় বংশ পরম্পরায় যোগসূত্র বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইবনে/বিন শব্দটির পূর্বে যেই নামটি থাকে, সেটি হয়ে থাকে পুত্রের নাম। আর শব্দটির পরবর্তী=

চেঙ্গিস খান আমির তোজোনের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাতাররা প্রায় সবাই তখন ইসলাম গ্রহণ করে। ওই দিন তারা মানুষের জন্য স্বর্ণমুদ্রা ও হীরা-জহরত ছিটিয়ে দেয়। আমির কাজানের নাম দেওয়া হয় মাহমুদ। তিনি জুমার নামাজে শরিক হন। খ্রিষ্টানদের অনেকগুলো গির্জা ধ্বংস করেন। তাদের ওপর জিজিয়া আরোপ করেন। বাগদাদ ও অন্যান্য দেশের দখলকৃত সম্পদ ফিরিয়ে দেন।

আর্নল্ড বলেন, ১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মাদ খোদাওয়ান্দ (মূল নাম উইলজাইতু) নামে তার যে ভাই তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন, তিনি তার মাতৃধর্মানুসারে খ্রিষ্টবাদ লালন করতেন। নিকোলাই নাম রেখে তাকে খ্রিষ্টীয় রীতিতে দীক্ষাস্নান করানো হয়। তবে মায়ের মৃত্যুর পর যুবক বয়সেই তিনি ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। এ ক্ষেত্রে প্রভাবক ছিল তার স্ত্রী।

ইবনে বতুতা উল্লেখ করেন, এই শাসকের বিপুল প্রভাব পড়েছিল মোঙ্গলদের ওপর। ওই আমল থেকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম পারস্যের ইলখানাত সাম্রাজ্যের সাধারণ ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠা পায়।

ওই পরিবারের তৃতীয় শাখাটি শাসন করত মধ্য এশিয়ার দেশগুলো। তার প্রতিষ্ঠাতা চেঙ্গিস খানের ছেলে চাগতাই। আর্নল্ড বলেন, চাগতাই শাসিত মোঙ্গল সাম্রাজ্যে ইসলামের প্রচার-প্রসার সম্বন্ধে যে সকল খবর ও তথ্য আমাদের জানা আছে, তা খুবই স্বল্প। তবে এই পরিবারের অনেক শাসকই তখন কোনো না কোনো মুসলিম উজিরকে তার সভাসদ হিসেবে রাখতেন। অথচ তখনও ইসলামের প্রতি তাদের সামান্য ঝোঁকও লক্ষ করা যায়নি। এদিকে চাগতাই তার মুসলিম প্রজাদের ওপর কঠিন কঠিন সব বিধিনিষেধ দিয়ে রেখেছিলেন, যা মুসলমানদের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি ও অন্যান্য অনেক বিষয়ের ওপর এই নিষেধাজ্ঞা আসে। যেমন, প্রাণী জবেহ করা এবং অজুসংক্রান্ত ফরজ বিষয়সমূহে

=নামটি হয়ে থাকে উক্ত পুত্রের পিতার নাম। (তবে পরবর্তী নামটি কখনো সরাসরি পিতা না হয়ে অন্য কোনো পূর্বপুরুষেরও হয়ে থাকে। যেমন, আহমাদ ইবনে হাম্বল; এখানে হাম্বল মূল ইমাম আহমাদের দাদার নাম। ইমামের বাবার নাম হচ্ছে মুহাম্মাদ।) তো, আমাদের আলোচিত বংশধারাটির সারমর্ম হচ্ছে, চেঙ্গিস খানের পুত্র তুলুই, তার পুত্র আবাকা, তার পুত্র আরগুন, তার পুত্র কাজান। -সম্পাদক

নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। ঐতিহাসিক জুযজানির[১] বর্ণনা অনুযায়ী, এই চাগতাই মোঙ্গলদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিরোধী ছিল মুসলমানদের। তার ইসলামবিদ্বেষ একসময় এমন পর্যায়ে ঠেকেছিল যে, কেউ তার সামনে 'মুসলিম' নামটি উচ্চারণ করুক, তা-ও তিনি চাইতেন না। শুধু নীচুতা বোঝানোর জন্য এই শব্দ ব্যবহার করলেই ছাড় পাওয়া যেত। কারা হালাকুর (চাগতাইয়ের পৌত্র) স্ত্রী ওরগানা তার ছেলেকে ইসলামি অনুশাসনে প্রতিপালিত করেছিলেন। ১২৬৪ খ্রিষ্টাব্দে মুবারক শাহ নামে তিনি চাগতাই শাসনের ক্ষমতার দাবিদার হয়ে সামনে আসেন। চাগতাই সাম্রাজ্যের ক্ষমতা নিয়ে তখন মোঙ্গল শাসকদের মাঝে চলছিল তুমুল প্রতিযোগিতা। কিন্তু খুব দ্রুতই তার চাচাতো ভাই বুরাক খান তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন।

মোঙ্গলদের মধ্যে তার ইসলাম গ্রহণের কোনো প্রভাব প্রতিফলিত হয়নি। কেননা, বাস্তবে যদি আমরা তার সন্তানদের দিকে দেখি, তাহলে এমন কাউকে পাব না, যে বাবার ধর্ম গ্রহণ করেছে। বর্ণিত আছে, স্বয়ং বুরাক খানও ১২৭০ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে এই ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তার নাম পরিবর্তন করে গিয়াস উদ্দিন নাম ধারণ করেন। তবে ইসলামের ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী তাকে দাফন করা হয়নি; বরং প্রাচীন মোঙ্গলীয় রীতিতে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। তার মৃত্যুর পর ইতিপূর্বে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তারা আবার তাদের তারকাপূজার ধর্মে ফিরে যায়। চাগতাই সাম্রাজ্যীয় মোঙ্গলদের মাঝে পূর্ণমাত্রায় ইসলামের প্রসার হয়েছে মুবারক খানের ইসলাম গ্রহণের পরবর্তী শতাব্দীর মাঝামাঝিতে এসে। ১৩২৬ খ্রিষ্টাব্দের দিকে তারমাশিরিনের ইসলাম গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে। এবার মোঙ্গলরা তাদের নতুন ধর্মকে আঁকড়ে ধরা শুরু করে তাদের নেতার অনুসরণে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও মোঙ্গলদের মনে ইসলাম পরিপূর্ণরূপে প্রোথিত হতে পারেনি। কেননা, (যদি এ ইতিহাস সত্যি হয়ে থাকে) পরবর্তী ১০ বছরে তাদের বুজুন নামক যে বাদশাহ ছিলেন, তিনি

---

১. জুযজানি : আবু উমার মিনহাজ উদ্দিন উসমান ইবনে ইবরাহিম আল জুযজানি। ১১৯৩ খ্রিষ্টাব্দে আফগানিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তেরোতম শতকের বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ছিলেন। ১২২৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দিল্লিতে আগমন করেন। দিল্লির সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদের নাম অনুসারে *তাবাকাতে নাসিরি* নামে বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। দিল্লিতেই তিনি ইনতেকাল করেন। -সম্পাদক

তারমাশিরিনকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন। তারপর মুসলমানদের ওপর করেছেন অসহনীয় নির্যাতন। এর কয়েক বছর পরেই কাশগরে প্রথম মুসলিম শাসকের আগমনের কথা শোনা যায়। চাগতাই পরিবারের দুর্বলতাই এই রাজ্যটিকে স্বাধীন হতে সাহায্য করে।

কোনো ঐতিহাসিক বলেন, কাশগরের রাজা তুঘলক তৈমুর খান (শাসনকাল: ১৩৪৭-১৩৬৩ খ্রিষ্টাব্দ) বুখারার কোনো এক বুজুর্গের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। বুজুর্গের নাম ছিল জামাল উদ্দিন। তার সাথে ব্যবসায়িক এক কাফেলা ছিল। তারা তখন সেসব ভূখণ্ড অতিক্রম করছিল, যেগুলো বাদশাহ নিছক শিকারের জন্য বরাদ্দ রেখেছিলেন। তখন রাজা আদেশ করলেন তাদের হাত-পা বেঁধে তার সামনে উপস্থিত করতে। তাদের উপস্থিত করা হলে তিনি রাগতস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, এই ভূখণ্ডে প্রবেশ করার সাহস কীভাবে করল তারা! বৃদ্ধ উত্তর দিলেন, তারা ভিনদেশী। তারা জানে না যে, নিষিদ্ধ ভূখণ্ডে পা রেখেছে তারা। রাজা যখন জানলেন যে, তারা পারস্যের অধিবাসী, তখন তিনি বললেন, পারসিকদের চেয়ে কুকুরও দামি। তখন বৃদ্ধ ব্যক্তিটি বললেন, হ্যাঁ, সত্য যে আমরা কুকুরের চেয়েও অধম ছিলাম, যদি না আমরা এই সত্য ধর্ম গ্রহণ করে নিতাম। রাজা এমন উত্তর শুনে শিকার থেকে ফিরে আসার পর এই সাহসী পারসিক বৃদ্ধকে তার সামনে উপস্থিত করতে বললেন। তারপর একান্তে তাকে তার সে ধর্মের কথা জিজ্ঞাসা করলেন এবং জানতে চাইলেন, তিনি কী কথা বলতে চেয়েছেন। বৃদ্ধ তখন আত্মমর্যাদা আর গাম্ভীর্যের সাথে এমনভাবে ইসলামের মৌলিক পরিচয়ের তুলে ধরেন যে, আমিরের মনের দুয়ার ইসলামের জন্য খুলে যেতে শুরু করে এবং তিনি ইসলামের জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠেন। ধীরে ধীরে মোমের মতো গলে যেতে থাকে তার মন। বৃদ্ধ তাকে কুফরের ভয়ংকর রূপটিও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। বাদশাহ তাতে নিজের ভুল বিশ্বাসের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে থাকেন এবং এ কথা বলেন যে, আমি যদিও এখন ইসলাম গ্রহণ করব, কিন্তু আমার প্রজাদের এখনই সরল পথে নিয়ে আসা আমার পক্ষে সহজ বিষয় নয়। এ ক্ষেত্রে আপনি আমাকে কিছু সময় দিন, যখন আমার পূর্বপুরুষের রাজত্ব আমার হাতে চলে আসবে, তখন পুণরায় আপনি আমার কাছে আসুন।

চাগতাইয়ের সাম্রাজ্য তখন বিচ্ছিন্নরূপে দীর্ঘদিন যাবৎ খণ্ড-খণ্ড রাজ্য হিসেবে শাসিত হয়ে আসছিল। একসময় সুলতান তুঘলক তৈমুর গোটা সাম্রাজ্য নিজের রাজত্বের অধীনে আনতে সক্ষম হন এবং রাজা হিসাবে সাম্রাজ্যকে আগের মতোই ঐক্যবদ্ধ করতে সফল হন। অন্যদিকে বৃদ্ধ বুজুর্গ জামাল উদ্দিন তার দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু তখন তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। বুজুর্গ বৃদ্ধের যখন মৃত্যু ঘনিয়ে এলো, তখন তিনি তার ছেলে রশিদ উদ্দিনকে বলে গেলেন যে, খুব অল্পসময়ের মধ্যে তুঘলক তৈমুর বিশাল রাজত্বের অধিকারী হয়ে যাবেন। তার কাছে গিয়ে আমার সালাম বলো আর আমাকে দেওয়া তার প্রতিশ্রুতির বিষয়টি মনে করিয়ে দিয়ো।

অল্প কয়েক বছর পর রশিদ উদ্দিন তুঘলক খানের সেনাছাউনীতে যান। ততদিনে তুঘলক তৈমুর নিজের পিতার অসিয়ত পূরণ করে পূর্বপুরুষের রাজ্যসমূহ অধিকার করে সিংহাসনে বসেছেন। কিন্তু অনেক কাঠখড় পোড়ালেও রশিদ উদ্দিন বাদশাহর নিকট উপস্থিত হতে পারলেন না। তাই একদিন এক কৌশলের আশ্রয় নিলেন।

একদিন খুব সকালে বাদশাহর তাবুর কাছাকাছি এক জায়গায় জোরেশোরে আজান দিতে শুরু করলেন। আজানের আওয়াজ বাদশাহর ঘুম ভাঙায়। রাগতস্বরে বাদশাহ ফরমান করেন তাকে দরবারে উপস্থিত করতে। বাদশাহর সামনে আসার এই সুযোগে রশিদ উদ্দিন তার পিতার পয়গাম পৌঁছে দেয়। তুঘলক তৈমুর তার পুরোনো প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করে তাকে বলেন, 'বিশ্বাস করুন, যখন থেকে আমি আমার পৈতৃক রাজত্ব লাভ করি, তখন থেকেই এই প্রতিশ্রুতির কথা মনে করছি। কিন্তু যাকে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছি, তিনি আজও আমার কাছে আসেননি। আর এখন যেহেতু আপনি চলে এসেছেন, তাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি।' তারপর বাদশাহ কালিমায়ে শাহাদাতাইন পড়ে মুসলমান হয়ে যান। তৈমুরের রাজ্যে ইসলামের সূর্য উদিত হয়। দূরীভূত হয় সব অন্ধকার। এই ধর্ম যেন অন্যদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করে, সে লক্ষ্যে বাদশাহ ও রশিদ উদ্দিন মিলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বাদশাহ গভর্নরদের একে একে স্বাগত জানাবেন। তাদের সামনে ইসলাম পেশ করবেন। যে গ্রহণ করবে তাকে উত্তম উপহার দেবেন। আর যে

প্রত্যাখ্যান করবে, তাকে তারকা ও মূর্তি পূজারিদের মতো জবাই করবেন।

চেঙ্গিস খানের বংশের চতুর্থ শাখাটি ওগেদাই খানের সাথে সম্পৃক্ত। মাংকো খান ও কুবলাই খানের মতো বিজয়ী বীর এ বংশ থেকেই বেরিয়েছেন। চেঙ্গিস বংশের এই অংশটি তাতার সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশে রাজত্ব করত। তাদের সম্পর্কে আর্নল্ড বলেন, 'চেঙ্গিস খানের বংশীয় এই শাখায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন অনেক অনুসারী পাওয়া যাবে, যারা মোঙ্গল সাম্রাজ্যের সীমান্তেই ছড়িয়ে পড়েছিল জিহাদের জন্য এবং কাফেরদের ইসলামের ছায়ায় নিয়ে আসার জন্য। তাই ওগেদাইয়ের শাসনকালে অর্থাৎ ১২২৯ থেকে ১২৪১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বৌদ্ধ কুগুজের ইসলাম গ্রহণের কথা আমরা ইতিহাসে জানতে পারি। তিনি মোঙ্গলদের পক্ষ থেকে নিয়োগকৃত পারস্যের শাসক ছিলেন। তৈমুর খানের শাসনকালে (১২২৩-১২২৮ খ্রিষ্টাব্দ) রাজা কুবলাইয়ের পৌত্র 'আনন্দ'-এর ইসলাম গ্রহণের কথা জানা যায়। শুধু নিজে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাই নয়; বরং তানগুতের অধিবাসীদের মধ্যে প্রচুর লোককে ইসলামধর্ম গ্রহণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। তৈমুরের দরবারে ডাক পড়ার পর অনেক চেষ্টা করেও তাকে ইসলামধর্ম থেকে টলানো যায়নি। তিনি নতুন ধর্মকে আঁকড়ে ধরে থাকায় তৈমুর তাকে কারাগারের অন্ধকারে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু খুব অল্পদিনের মাথায় তানগুতবাসীর বিদ্রোহের ভয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়, যারা আনন্দকে প্রচুর পরিমাণ ভালোবাসত। এভাবেই এই জনগোষ্ঠী, যারা ইসলামি বিশ্বাসকে তছনছ করেছে, পায়ের তলায় পিষে ফেলেছে, যাদের সামনে কোনো শক্তি দাঁড়ানোর সাহস পেত না, মাত্র অল্পকয়েক বছরের ব্যবধানে ইসলামের ছায়াতলে এসে পড়ে। আর এই সত্য আরও একবার ভাস্বর হয়ে উঠেছে যে, ইসলামের আছে গভীরতম আবেদনশক্তি। তার রয়েছে হৃদয়কে বশে আনার এবং বন্ধু ও সহচর বানানোর স্বভাবজাত ক্ষমতা।

তাতাররা শুধু নামেই মুসলমান হয়নি; বরং তাদের মধ্যেও জন্ম নিয়েছেন অনেক ফকিহ, আলেম, মুজাহিদ, দাঈ, দরবেশ। যারা ছিলেন সততা ও একনিষ্ঠ বিশ্বাসের অধিকারী। তারা ইতিহাসের কঠিন একটি মুহূর্তে ইসলামকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রেখেছিলেন।

পূর্ব ইউরোপ ও পশ্চিম সাইবেরিয়ায় মোঙ্গল শাসন

এই পরিচ্ছেদে আমরা চেঙ্গিস খানের বড় ছেলে জোচি খানকে প্রদেয় রাশিয়া, বুলগেরিয়া ও ককেশাস অঞ্চলের ইতিহাস আলোচনা করব। ওই তিন দেশ ছাড়াও পূর্ব ইউরোপ ও পশ্চিম সাইবেরিয়াও তার শাসনের এবং আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। উপরোল্লেখিত অঞ্চলগুলোকে জোচি খানের পরিবারটি শাসন করত। একে উত্তর মোঙ্গল সম্প্রদায় অথবা গোল্ডেন হোর্ড বলা হয়। চেঙ্গিস খান তার মৃত্যুর পর মোঙ্গলদের প্রধান খান তথা বাদশাহর পদ জোচি খানকে দেওয়ার অসিয়ত করে যায়। কিন্তু চেঙ্গিস খানের আগেই জোচি খানের মৃত্যু হওয়ায় ওই পদের জন্য তার ভাই ওগেদাইকে নির্বাচিত করা হয়। এভাবে জোচি খানের বংশ থেকে প্রধান খানের পদটি হারিয়ে যায়। তা সত্ত্বেও মোঙ্গলদের কাছে জোচি খানের পরিবারের বিশেষ কদর ছিল। মোঙ্গলদের যুদ্ধে প্রাপ্ত গনিমতের এক-তৃতীয়াংশ তারা পেত। যা খান-এ আজমের কাছে প্রেরিত সম্পদের সমপরিমাণ ছিল।

বাতু খান

বাতু খান তার পিতা জোচি খানের মৃত্যুর পর শাসক হয়। তবে তার চাচা ওগেদাইয়ের প্রতি ছিল তার মনে চরম হিংসা। সে মনে করত, ওগেদাই খান জোর করেই জোচি খানের বংশ থেকে প্রধান খানের পদ ছিনিয়ে নিয়েছে।

বাতু খানের রাজ্য বিস্তার

প্রধান খান ওগেদাই ৩০ হাজার সৈন্যের একদলকে বাতু খানের নেতৃত্বে প্রস্তুত করেন। এই দলে তিনজন উপসেনাপতি ছিল—ওগেদাইয়ের ছেলে গুয়ুক, তুলুইয়ের ছেলে মাংকো এবং চাগতাইয়ের ছেলে বাইদার। আর প্রধান সেনাপতি ছিল বাতু খান। ৩৩ হাজার সৈন্যের এই দলটি বুলগেরিয়ার শাসককে পরাজিত করে। যা এখনকার রাশিয়ার কাজান শহর ও তার আশপাশের কিছু অংশ। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা বলকান অঞ্চলে

পালিয়ে যায় এবং ওই অঞ্চলকেই বসবাসের জন্য বেছে নেয়। তাদের আশ্রয় নেওয়া এলাকাই বর্তমান নতুন বুলগেরিয়া। বুলগেরিয়ার অধিবাসীরা ইতিপূর্বে মোঙ্গলদের সাথে বিদ্রোহ করেছিল। সে কারণেই মূলত তাদের এই অভিযান। যখন তারা বুলগেরিয়ায় আধিপত্য পেয়ে গেল তাদের এই অগ্রসরতা প্রসারিত হতে থাকল পূর্ব ইউরোপ পর্যন্ত। তারপর তারা খাজার সাম্রাজ্য পেরিয়ে এগোতে থাকল রাশিয়া পর্যন্ত। সে সময়ের রাশিয়ায় সর্ববৃহৎ শহর ছিল কিয়েভ নগরী, যা বর্তমানে ইউক্রেনের রাজধানী। তারা এটি বিধ্বস্ত করে মস্কোতে প্রবেশ করে এবং এই শহরটি জ্বালিয়ে ছারখার করে দেয়। অতঃপর দুই ভাগে ভাগ হয়ে একদল বাতুর নেতৃত্বে হাঙ্গেরির অঞ্চলগুলো জয় করতে চলে যায় এবং অবশেষে জয় করে ওই দেশের সৈন্যদের কচুকাটা করে কিচ্ছা খতম করে দেয়। আর দ্বিতীয় দলটি বাইদারের নেতৃত্বে জার্মানির দিকে যায়। তবে এরা পরাস্ত হয়। পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে বাইদার মারা যায়। আর এই পরাজয় থেকেই মোঙ্গলদের ইউরোপে বিজয়াভিযান থেমে যায়। সেই সময়ে খানে-আজম ওগেদাই মারা যায়। মোঙ্গলদের খানে-আজম হিসেবে নির্বাচিত হয় গুয়ুক খান বিন ওগেদাই। ইউরোপে যুদ্ধগুলো থেমে যায়। মোঙ্গলদের অনেকগুলো গোত্র রাশিয়ার ভলগা নদীর অঞ্চলে চলে আসে। সেখানে স্থায়ী হয়ে ভলগা নদীর তীরে তারা সারাই নগরী নির্মাণ করে। যা উত্তর মোঙ্গল সাম্রাজ্যের রাজধানী হয়।

উত্তরাঞ্চলীয় মোঙ্গলদের উপর ইসলামের প্রভাব

জোচি খানের ছেলেদের অন্তরে ইসলামের দারুণ প্রভাব পড়েছিল। এর কারণ হলো জোচি খান বিয়ে করে খোয়ারিজম শাহের মেয়ে রিসালাহকে। যিনি মোঙ্গলদের হাতে বন্দি হয়েছিলেন। তিনি সুলতান জালাল উদ্দিনের বোন। তো তিনি জোচি খানের পরিবার হিসেবে যখন থাকতে লাগলেন তখন জোচি খানের সন্তান বাতু, বারকে ও অন্যান্যদের অন্তরে ইসলাম প্রভাব ফেলতে থাকে। এজন্য বাতু ইসলাম গ্রহণ না করলেও মুসলমানদের প্রতি ছিলেন সদয়। এদিকে গুয়ুক খান খানে আজমের পদে অধিষ্ঠিত হওয়ায় বাতু খানের হিংসা আরও তুঙ্গে ওঠে। তা ছাড়া গুয়ুক আগে থেকেই ইউরোপের যুদ্ধগুলোতে ছিল বাতুর নেতৃত্বাধীন। ওগেদাইয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় সে প্রতিপালিত হয় এক খ্রিষ্টানের হাতে। তাই খানে আজমের পদে অধিষ্ঠিত হয়েই সে নিজের খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ

করার কথা ঘোষণা করে দেয়। তখন অনেক খ্রিষ্টান পাদরি-যাজক মোঙ্গল সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তারা গুয়ুককে বাতুর বিরুদ্ধে ফুসলাতে থাকে। কেননা বাতু ছিল মুসলমানদের প্রতি সহনশীল মনোভাবের। এক সময় উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রকট হয়। গুয়ুক বাতুর বিরুদ্ধে বাহিনী প্রস্তুত করে। কিন্তু বাতুর কাছে বাহিনী পৌঁছানোর আগেই ৬৪৬ হিজরিতে (১২৪৮ খ্রিষ্টাব্দে) গুয়ুক মারা যায়। বাতু তখন চেষ্টা করে ওগেদাইয়ের বংশ থেকে খানে আজমের পদ বের করে আনতে। তাই তার ছোট ভাই বারকে খানের সাহায্যে খানে-আজম পদে অধিষ্ঠিত করে মাংকো ইবনে তুলুই খানকে। এভাবে ৬৪৮ হিজরিতে ওগেদাই বংশ থেকে তুলুই বংশে স্থানান্তরিত হয়ে যায় মোঙ্গলদের খানে-আজম পদ।

ছারতাক

৬৫০ হিজরিতে (১২৫২ খ্রিষ্টাব্দে) বাতু মারা গেলে তার ছেলে ছারতাক উত্তর মোঙ্গলদের শাসনভার গ্রহণ করে। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই সে মারা যায়। এদিকে তার সন্তানরাও অনেক ছোট থাকায় তার চাচা বারকে খান এই পদে অধিষ্ঠিত হন।

বারকে খান

বারকে খানকে ধরা হয় মোঙ্গলদের প্রথম মুসলিম শাসক। এজন্যই অন্যান্য মোঙ্গলীয় পরিবার থেকে উত্তরাঞ্চলীয় মোঙ্গলরা ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী ছিল। ৬৫০ হিজরিতে মোঙ্গলদের প্রধান রাজধানী কারাকোরাম থেকে ফেরার সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি যখন বুখারার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন সেখানকার এক আলিমের সাথে দেখা করেন এবং তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। ৬৫৩ হিজরিতে তিনি (১২৫৫ খ্রিষ্টাব্দে) উত্তর মোঙ্গল সাম্রাজ্যের শাসক হন। তার ইসলাম গ্রহণের ফলে উত্তরের অনেক মোঙ্গল ইসলাম গ্রহণ করে। ইসলামের প্রতি তার ছিল সীমাহীন ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। বাগদাদের খলিফা মুতাসিমের হাতে বাইআত হন এবং সারাই শহর প্রতিষ্ঠা করেন (যা বর্তমান রাশিয়ার সারাতোভ শহর হিসেবে পরিচিত)। এটিকে উত্তরীয় মোঙ্গলদের রাজধানী করেন এবং তৎকালে দুনিয়ার সর্ববৃহৎ শহর হিসেবে একে গড়ে তোলেন। যাতে অনেক মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল।

বারকে খান ও হালাকুর মাঝে দ্বন্দ্ব এবং মুসলমানদের প্রতি বারকে খানের সহনশীলতা

হালাকু খান তার ভাই মাংকোকে বাগদাদ আক্রমণ করার জন্য প্রলুব্ধ করেছিল। স্বপ্ন দেখিয়েছিল মুসলমানদের অন্যান্য দেশের ক্ষমতার। মাংকো এতে বেশ ভালোই প্রলুব্ধ হয়। এমনকি এই চিন্তা বাস্তবায়নের জন্য বাহিনী প্রস্তুত করে বসে। কিন্তু এই খবরটা বারকে খানের কাছে পৌঁছতেই তার শিরা-উপশিরা শিহরিত হয়ে উঠল। তখন তার ভাই বাতুর শাসনকাল চলে। তিনি তার ভাই বাতুকে বারবার অনুরোধ করেন মুসলমানদের ওপর এই আক্রমণ ঠেকাতে। তাকে বলেন, এই আমরাই মাংকোকে খানে আজমের পদে বসিয়েছি। সে আমাদেরকে অমান্য করতে পারে না। সে আমাদের উপকারের কোনো প্রতিদান তো দেয়নি এখন আমাদের বন্ধুদের অনিষ্ট সাধন করে আমাদের প্রতিদান দিতে চায়, আমাদের নিরাপত্তা প্রদানের মূল্য নষ্ট করতে চায়, খলিফার রাজত্ব নিজের করতে চায়। কিন্তু এটা তো তাকে মনে রাখতে হবে যে, খলিফা আমাদের বন্ধু। আমাদের মাঝে রয়েছে সন্ধি ও সম্প্রীতির। তার এই অপরিণামদর্শী কাজের পরিণামে কেবল ক্ষতিই হবে, যাতে কোনোরূপ সন্দেহ নেই। বাতু তার ভাইয়ের কথায় আশ্বস্ত হয়ে হালাকু খানের কাছে যুদ্ধ বন্ধের বার্তা পাঠায়। হালাকু তখন তার কথামতো দমে যায় এবং বাতুর মৃত্যু পর্যন্ত তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন স্থগিত রাখে। বাতু মারা গেলে সে আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ভ্রান্ত ইসমাইলি হাশিশি ফিরকার দুর্গগুলো দখল করে বাগদাদের দিকে এগিয়ে যায়। তখন শাসনভার গ্রহণ করে ফেলেছেন বারকে খান। তিনি হালাকুকে বাধা দিতে চাইলেন। কিন্তু তার সৈন্যরা তাকে সাহায্য করতে অস্বীকার করে বসল। কেননা তারা বারকে খানের আনুগত্য করে প্রধান খানের অবাধ্য হতে চায় না। তা ছাড়াও সংখ্যাগরিষ্ঠ সৈন্য ছিল তারকা পূজারি। তখনও তারা চেঙ্গিস খানের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি। ফলে বারকে খান হালাকু খানের মোকাবিলার জন্য একমাত্র পথ হিসেবে খোলা দেখল কোনো বাহানা তৈরি করা। তাই তিনি হালাকুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত তাবরিজ এবং মারাগার অধিকার দাবি করলেন এবং এই মর্মে ঘোষণা দিলেন যে, এখানে হালাকু আক্রমণ করলে সেটা তার নিজ অঞ্চলে আক্রমণের মতোই। অন্যদিকে বারকে খান গনিমতের এক-তৃতীয়াংশ দাবি করে হালাকুর কাছে দূত ও পত্র পাঠায়। বাতু খানের

আমলেও এই ভাগ অব্যাহত ছিল। কিন্তু হালাকু রেগে গিয়ে সব কজন দূতকে হত্যা করে। এমনকি নিজেই বারকে খানের বিরুদ্ধে সৈন্যসামন্ত প্রেরণ করে। ৬৬০ হিজরিতে (১২৬২ খ্রিষ্টাব্দে) এই সৈন্যদল চরমভাবে পরাজিত হয়। হালাকু হার না মেনে ওই বছরই তাবাই নোয়ানের নেতৃত্বে বারকে খানের ওপর আবার আক্রমণ করে। এবার নোগাইয়ের নেতৃত্বাধীন বারকে খানের সৈন্যদল পরাস্ত হয়। হালাকু এরপর খোদ বারকে খানকে আক্রমণ করার জন্য সৈন্য প্রস্তুত করে। তার ছেলে আবাকার নেতৃত্বে সাহায্য করার জন্য এক সৈন্যদল পাঠায়। বাহিনী যখন বারকে খানের মোকাবিলার জন্য অগ্রসর হতে থাকে বারকে খান তখন নিজেই নেতৃত্ব দিয়ে বাহিনী নিয়ে বের হন এবং হালাকুর বাহিনীকে ৬৬১ হিজরিতে (১২৬৩ খ্রিষ্টাব্দে) ককেশাসের মাটিতে চরমভাবে পরাস্ত করেন। হালাকুর দলের বাকিরা তার ছেলে আবাকার সঙ্গে পালিয়ে যায়।

মিশরের মামলুকদের সাথে বোঝাপড়া

সুলতান বাইবার্স এবং বারকে খানের মধ্যে অনেক চিঠিপত্র আদান-প্রদান হয়। বাইবার্স বারকে খানকে হালাকুর বিরুদ্ধে লড়তে উদ্বুদ্ধ করে যান। কেননা, ইসলামের দিক থেকে নিজ পরিবার বা বংশের হলেও ধর্ম সেখানে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের হুকুম দেয়। এরপর বারকে খান হালাকুর বিরুদ্ধে সুলতান বাইবার্সের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। কেননা, সুলতান বাইবার্স তখন হালাকুর সাথে সরাসরি যুদ্ধরত। মামলুকদের ওপর চাপ কমানোর জন্য বারকে খান সাহায্যের হাত বাড়ায়।

পৌত্তলিক মোঙ্গলদের ঐক্য ভাঙতে বারকে খানের প্রচেষ্টা

মুসলমানদের সাহায্য আর স্বগোত্রের সাথে যুদ্ধ করেই বারকে খান ক্ষান্তি দিলেন না। বরং তিনি তারকাপূজারি মোঙ্গলদের দুর্বল করে তাদের ঐক্যকে নষ্ট করতে কাজ করলেন। যাতে এই সুযোগে ক্ষমতা তার হাতে চলে আসে এবং তিনি ইসলামের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। ভাগ্যক্রমে একবার খানে-আজম মাংকো খান কিছু বিদ্রোহীকে দমনের জন্য বেরিয়ে যায়। সাথে থাকে তার ভাই কুবলাই খান। ফিরে আসার আগ পর্যন্ত রাজধানীর দায়িত্ব অর্পণ করে যায় আরেক ভাই আরতাক বুকাকে। বারকে খানের ভাগ্যের আরেক চক্র দেখা গেল। মাংকো খান

রাস্তায় মারা যায়। তখন আরতাক বুকা ও কুবলাই খানের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ পেয়ে যায় বারকে খান। আমির ও সৈন্যরা কুবলাইকে সিংহাসনে বসাতে চাইল। অপরদিকে বারকে খান কুবলাইয়ের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য আরতাক বুকাকে শক্তি দিয়ে সাহায্য করেন। আরতাক ও তার ভাইয়ের মধ্যেখানে আজমের সিংহাসন নিয়ে চরম দ্বন্দ্ব শুরু হয়। বারকে খান ওগেদাই পরিবারকে আরতাক বুকাকে সাহায্যের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। এভাবে ৬৫৮ হিজরিতে (১২৬০ খ্রিষ্টাব্দে) দুই ভাইয়ের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায় এবং অনেক বছর যাবৎ যুদ্ধ স্থায়ী হয়। একসময় হালাকু এই যুদ্ধ থামাতে সিরিয়ার যুদ্ধ একপ্রকার বাধ্য হয়েই বন্ধ করে দিয়ে কারাকোরামে প্রবেশ করে এবং তার ভাই কুবলাই খানকে খানে আজমের সিংহাসনে বসায়। অন্যদিকে ওগেদাই পরিবারকেও দমিয়ে দেয়। এ সময় বারকে খান হালাকু খানের অধীনস্থ শামের বহু সৈন্যকে সুলতান বাইবার্সের দলে ভিড়তে এবং ইসলাম গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। বহু সৈন্য তার আনুগত্য করে হালাকু খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। বারকে খানের এই কাজ দেখে হালাকুর মনে ক্রোধ ও হিংসার আগুন দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। একসময় 'মৃগী' রোগে আক্রান্ত হয়ে সে ৬৬৩ হিজরিতে (১২৬৫ খ্রিষ্টাব্দে) মারা যায়। তার মৃত্যুর পর বারকে খানের ওপর এই ক্রোধ দমনের উত্তরাধিকার পায় হালাকুর ছেলে আবাকা খান। তাই এবার সে যুদ্ধের জন্য বের হয়। তবে বারকে খানের সেনাপতি নোগাই পাল্টা আক্রমণ করে বসে। আবাকা খান একের পর এক আক্রমণ করতে থাকে এবং একসময় বারকে খানের সৈন্যদের ওপর বিজয়ী হতে সক্ষম হয়। এই যুদ্ধে সেনাপতি নোগাইয়ের চোখ তির দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়। একসাথে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে বারকে খানের কাছে তার ছিল বিশেষ মর্যাদা। এরপর বারকে খান নিজেই আবাকার সাথে লড়াই করতে রওনা হন। কিন্তু ৬৬৫ হিজরিতে পথে থাকতেই তিনি প্রয়াত হন।

মাংকো তৈমুর

বারকে খানের পর এই অঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ করে মাংকো তৈমুর বিন তোগান বিন বাতু। কেননা বারকে খানের কোনো সন্তানসন্ততি ছিল না। তার মাঝে ও আবাকা খানের মাঝে যে যুদ্ধগুলো হয়েছিল বিজয় তাতে শেষমেশ আবাকা খানেরই হয়েছিল। এদিকে মাংকো তৈমুরের সাথে

কনস্টান্টিনোপল সম্রাটের যুদ্ধ শুরু হয়। যাতে সম্রাটের রাজ্যের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

তোদান মাংকো

মাংকো তৈমুর ৬৭৯ হিজরিতে (১২৮০ খ্রিষ্টাব্দে) মারা গেলে তার জায়গায় আসীন হয় তার ভাই তোদান মাংকো। চাগতাই বংশের বুরাক খানের সাথে তার লড়াই হলে তাতে তিনিই বিজয়ী হন। তাদের মধ্যে সন্ধি হয়। বুরাক খানকে সে আবাকার সাথে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে আবাকা খানের সাথে বুরাক খানেরও লড়াই শুরু হয়।

দীর্ঘদিন মামলুক সুলতান কালাউনের সাথে পত্র আদান-প্রদানের পর তোদান মাংকো নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেন এবং রাজ্যে ইসলামি শরিয়ত বাস্তবায়নে কাজ করেন। একসময় আলেমদের সংশ্রবে চলে যাওয়ার জন্য শাসনভার ছেড়ে দেন। ৬৮৬ হিজরিতে (১২৮৭ খ্রিষ্টাব্দে) উত্তর মোঙ্গলদের শাসক হিসেবে তার ভাতিজা তালাবোগা তার স্থলাভিষিক্ত হয়।

তালাবোগা

উত্তরের কিছু জাতির সাথে যুদ্ধ করার সময় তালাবোগা ও সেনাপতি নোগাইয়ের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি হয়। রাস্তায় তালাবোগার সঙ্গে আসা সব সৈন্য নিহত হয়। অপর দিকে নোগাইয়ের সকল সৈন্য অক্ষত থাকে। ফলে তালাবোগা ধারণা করে নোগাই তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে। নোগাইও তালাবোগার মনের কথা ধরে ফেলে। তাই সে আগেভাগেই তালাবোগাকে সরিয়ে দেওয়ার পথে হাঁটে এবং তার জায়গায় তার ভাই তাকতাইকে স্থলাভিষিক্ত করে ৬৯০ হিজরিতে।

তাকতাই

নোগাই ও তাকতাইর মাঝেও দ্বন্দ্ব হলো। তাকতাই নোগাইকে হত্যা করল। এরপর সে ইলখানাতের বাদশাহ গাজানের সাথে লড়াই করতে বের হয়। লড়াইয়ের উপলক্ষ্য, আজারবাইজান ও মারাগা করতলগত করা। কিন্তু গাজান তার সৈন্যসামন্তসহ তাকতায়ির মুখোমুখি হওয়ার আগেই মারা যায়। তাকতাই মাওয়ারাউন নাহার সুলতানের সঙ্গে ৭০৯ হিজরিতে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। অতঃপর ৭১২ হিজরিতে (১৩১২ খ্রিষ্টাব্দে) মৃত্যুবরণ করে।

গিয়াসউদ্দিন মুহাম্মাদ উজবেক

তিনি তাকতাইর নিজ হাতে হত্যাকৃত ভাই তুগরিলাজার পুত্র। চাগতাই বংশের মাওয়ারাউন নাহারের শাসক কোবেকের সাথে ইলখানাতের বাদশাহ আবু সাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সংঘবদ্ধ হয়। কিন্তু কোবেকের সেনাপতির পরাজয় গিয়াস উদ্দিনকে আবু সাইদের পথ থেকে সরে যেতে বাধ্য করে। ৭২২ হিজরিতে (১৩২২ খ্রিষ্টাব্দে) মুহাম্মাদ উজবেক মৃত্যুবরণ করেন।

মাহমুদ জানি বেগ

তিনি মুহাম্মাদ উজবেকের সন্তান। তার কালের স্মরণীয় ঘটনা হলো তিনি আজারবাইজানের কর্তৃত্ব নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। অতঃপর ৭৫৮ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মুহাম্মাদ বারদি বেগ

স্বৈরাচারী হিসেবে পরিচিত। তিনি মাহমুদ জানির সন্তান। নিকটাত্মীয়ের অধিকাংশকেই তিনি হত্যা করেছেন, যেন ক্ষমতার প্রসঙ্গে কেউ তার প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়। রাশিয়ার ওপর চড়া কর ও জিজিয়া আরোপ করেন। অতঃপর ৭৬২ হিজরিতে (১৩৬১ খ্রিষ্টাব্দে) মৃত্যুবরণ করেন।

উত্তর মোঙ্গল রাষ্ট্রভাগ ও বিশৃঙ্খলা

এটা ঠিক যে, উত্তর মোঙ্গলদের সাম্রাজ্য ইউরোপের মধ্যপোল্যান্ড থেকে বিস্তৃত হয়ে প্রাচ্যের মধ্য-সাইবেরিয়ায় পৌঁছেছে। আর এদিকে আর্কটিক মহাসাগর থেকে দক্ষিণ আজারবাইজান পর্যন্ত পৌঁছেছে। উত্তর মোঙ্গল সাম্রাজ্যের তখন বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ছিল। যেমন ইউরোপের পূর্বে ও সাইবেরিয়ার পশ্চিমে এবং ভলগা নদীর পাশে ছিল তাতার মুসলমানরা। এর পশ্চিমাংশে ছিল খ্রিষ্টান রুশরা। খোয়ারিজমে তুর্কিরা এবং আজারবাইজানে আজারীরা। এ ছাড়া ককেশাসের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী যেমন ছিল, তেমনই অন্য অনেক জনগোষ্ঠী তখন মোঙ্গল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতৎসত্ত্বেও মাহমুদ বারদির মৃত্যুর পর দেশে দেশে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে গিয়েছিল। তার সন্তান তোকতামিস ছিল ছোট। এর ফলে প্রকাশ্যেই ভাগ-বিভক্তি শুরু হয়ে গিয়েছিল। হাজি মুহাম্মাদ খান সাইবেরিয়া অধিকার করে। মামাই খান সারাই শহরে আবদুল্লাহ খানকে বসিয়ে নিজে ক্রিমিয়া অধিকার করে। আস্ত্রাক্যান অঞ্চল অধিকার করে নেয় হাজি শারকাস।

এদিকে তোকতামিস পালিয়ে সমরকন্দের চাগতাইদের কাছে চলে আসে। এ সময় তৈমুর লং বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সে তোকতামিসকে অভিবাদন দিয়ে তার রাজ্য তার কাছে ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু এই অবস্থা বেশি দিন না যেতেই তাদের মাঝে দ্বন্দ্ব লেগে ৭৮৮ হিজরিতে (১৩৮৬ খ্রিষ্টাব্দে) লড়াই শুরু হয়। এই লড়াই শেষ হয় উত্তর মোঙ্গলদেরকে নিজ শাসনাধীন করে তৈমুর লংয়ের বিজয়ের মাধ্যমে। তোকতামিস আত্মগোপন করে। শেষমেশ তার কী হয়েছিল সেই ব্যাপারে অনেক কথা পাওয়া যায়।

উত্তর মোঙ্গলদের নিজের করতলগত করার পর তৈমুর লং তার পক্ষ থেকে একজন শাসক নির্ধারণ করে দেয়। আর নিজে অন্যান্য অঞ্চলের জন্য যুদ্ধে মনোযোগী হয়। ফলে এই দেশগুলোতে ক্রমান্বয়ে ভাগ ও বিভক্তি হতে শুরু করে। বহুসংখ্যক রাজা-বাদশাহ উত্তর মোঙ্গলদের দেশগুলো শাসন করে। তাতার ও লিথুয়ানিয়ানদের মধ্যে বেশ কয়েকবার যুদ্ধ হয়। তাতে তাতাররা জয়লাভ করে। অনুরূপ ৮১১ হিজরিতে রাশিয়া ও তাতারদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। একসময় তারা উভয়েই লিথুয়ানিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। উত্তর মোঙ্গলদের মধ্যে কয়েকটি রাজ্য আত্মপ্রকাশ করে, যেমনঃ ক্রিমিয়া, কাজান, আস্ত্রাক্যান, সাইবেরিয়া ও খোয়ারিজম। এই সবগুলোই সারাই শহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং পরস্পরে লড়াই শুরু করে। একদল রাশিয়া ও একদল লিথুয়ানিয়ানদের পক্ষ নেয়। উত্তরাঞ্চলীয় মোঙ্গলদের রাজ্যে যেন স্পেনের করুণ দৃশ্য পুনরায় চিত্রায়িত হয়। বিভিন্ন সুযোগে রুশরা একের পর এক এসব রাজ্য হজম করতে থাকে। খোয়ারিজম ছাড়া বাকি খানাতগুলো নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করব। পশ্চিম তুর্কিস্তানের আলোচনায় আলাদা একটি অধ্যায়ের মধ্যে খোয়ারিজম নিয়ে আলোচনা করব।

খানিয়াতে কাজান

মুহাম্মাদ ওগলান খান

তৈমুর লংয়ের পর উত্তর মোঙ্গলদের রাজধানী সারাইয়ের সাথে রাশিয়ার কাজানের সম্পর্ক হয়ে যায়। ৮৪১ হিজরিতে (১৪৩৭ খ্রিষ্টাব্দে) সারাইয়ের দুই সম্রাট মুহাম্মাদ ওগলান ও তার ভাই কাজাক মুহাম্মাদের মাঝে যখন যুদ্ধ হয়, তখন কাজাক সারাইতে আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। একসময় মুহাম্মাদ ওগলান কাজানে পালিয়ে আসে এবং কাজানসহ তৎসংলগ্ন আরও কিছু অঞ্চল শাসন করে। এগুলোকে সারাই থেকে আলাদা করে স্বতন্ত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। দিনে দিনে তা সম্প্রসারণের কাজে হাত চালাতে থাকেন। মুহাম্মাদ ওগলান রাশিয়া আক্রমণ করেন। কেননা তিনি যখন তার ভাইয়ের কাছ থেকে পালিয়ে রুশদের আশ্রয় কামনা করেন, তখন সারাইয়ের প্রাক্তন শাসক থাকাকালে বহু ভালো আচরণের পরও তার সাথে বিমাতাসুলভ আচরণ করেছে। তাই বেশ কয়েকবারই তিনি রুশদের দেশের ওপর হামলা করেন। ৮৫০ হিজরিতে (১৪৪৬ খ্রিষ্টাব্দে) আক্রমণের আগ পর্যন্ত তিনি শুধু গনিমত নিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন। কিন্তু এ বছর তিনি অবরোধ করেন এবং তা খুবই সঙ্গোপনে। তার অবরোধের সময় সুযোগ বুঝে শাইবানের এক শাসক কাজান দখল করে নেয়। তাই তিনি মস্কো থেকে অবরোধ উঠিয়ে নিতে বাধ্য হন এবং কাজান ফিরে নিজের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন।

মাহমুদ খান

মুহাম্মাদ ওগলান মস্কোর পথে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ শহর সারাহর কর্তৃত্ব ছেড়ে দেন। এটি তার ও তার সন্তান মাহমুদের মাঝে দ্বন্দ্বের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মাহমুদ তার বাবা-মাকে হত্যা করে ৮৫০ হিজরিতে (১৪৪৬ খ্রিষ্টাব্দে) ক্ষমতা দখল করে। এই হত্যার ফলে মাহমুদের অন্যান্য ভাই মস্কো পালিয়ে যায়। ৮৭২ হিজরিতে (১৪৬৭ খ্রিষ্টাব্দে) মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মাহমুদের হাতে ক্ষমতা ছিল।

ইবরাহিম খান

মাহমুদ খানের সন্তান। তার মা মস্কোতে পালিয়ে গিয়ে তার এক চাচা কাশেমকে বিয়ে করেন। ৮৭৩ হিজরিতে (১৪৬৮ খ্রিষ্টাব্দে) মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রাশিয়ার সাহায্যে তিনি কাজানের ওপর আক্রমণ করে যান। ইবরাহিমের মায়ের প্রচেষ্টা ছিল পুত্র ও রাজা তৃতীয় ইভানের মধ্যে সমঝোতা কায়িম করা। তা সত্ত্বেও রাশিয়া ও কাজানের মধ্যে যুদ্ধ লেগেই ছিল। একসময় রাশিয়া কাজানের কিছু কিছু অংশ বিধ্বস্ত করে মস্কোর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। ইবরাহিমের মৃত্যু হয় ৮৮৩ হিজরিতে (১৪৭৮ খ্রিষ্টাব্দে) ।

ইলহাম খান

তিনি শাসন করেন ১০ বছর। তার ভাই মুহাম্মাদ আমিন তার সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। তাই সে মস্কো গিয়ে সাহায্য কামনা করে। রুশরা তাকে সাহায্য করে। সাহায্য পেয়ে ৮৯৩ হিজরির (১৪৮৮ খ্রিষ্টাব্দের) দিকে সে কাজানের উপর হামলা করে। একসময় কাজান তার দখলে চলে আসে। ইলহাম খানকে ক্ষমতা থেকে নামিয়ে তাতে সে আসন গাড়ে। আর তার ভাই রুশদের হাতে বন্দি হয়।

মুহাম্মাদ আমিন খান

কাজানের অধিবাসীরা মুহাম্মাদ আমিনের ওপর রুষ্ট হলে ককেশাসের মামুক খান শাইবানির সাথে যোগাযোগ করে, তাকে মুহাম্মাদ আমিনের পর শাহ হিসেবে পাওয়ার জন্য। ৯০২ হিজরিতে (১৪৯৬ খ্রিষ্টাব্দে) মামুক কাজানে প্রবেশ করতে চেষ্টা করে। মুহাম্মাদ আমিন রাজা তৃতীয় ইভানের নিকট সাহায্য চায়। রাজা তৃতীয় ইভান তাকে সাহায্য করলে মামুকের কাজান প্রবেশ অভিযান ব্যর্থ হয়। কিন্তু মামুক বারবার চেষ্টা করতে থাকে। অবশেষে সে কাজানে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। আর মুহাম্মাদ আমিন তার পরিবার নিয়ে পালিয়ে যায় মস্কোতে। কিন্তু মামুকও কাজানিদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। ফলে তার এক যুদ্ধে বের হওয়াকে সুযোগ মনে করে কাজানিরা শহরের সব দরজা বন্ধ করে দেয়। তারা রাজা তৃতীয় ইভানের সাথে পত্র যোগাযোগ করে মুহাম্মাদ আমিনের ভাই আবদুল লতিফকে তাদের শাসক হিসেবে চায়। রাজা ইভান এতে একমত পোষণ করে। এরপর আবদুল লতিফ সিংহাসনে বসে। কিন্তু মুহাম্মাদ

আমিন ৯০৮ হিজরিতে (১৫০২ খ্রিষ্টাব্দে) আবার কাজান অধিকার করতে সক্ষম হয় এবং আবদুল লতিফকে বন্দি করে রাশিয়া পাঠিয়ে দেয়। এ সময় মুহাম্মাদ আমিনের স্ত্রী, যে ইতিপূর্বে ইলহাম খানের স্ত্রী ছিল মুহাম্মাদ আমিনকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। এজন্য কাজান ও উরাল তীরবর্তী শহরগুলোর এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মুহাম্মাদ আমিন রাশিয়ার দিকে বের হয়। এভাবেই মুহাম্মাদ আমিনের সময় কাজান ও রুশ বাহিনীর মধ্যে বহু যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ওই সময় মুহাম্মাদ আমিনের ভাই আবদুল লতিফকে ক্রিমিয়ার বাদশাহ মাঙ্কলি খানের মধ্যস্থতায় মুক্ত করে দেওয়া হয়। আবদুল লতিফ পুনরায় কাজানে ফিরে আসে। মুহাম্মাদ আমিন তাকে শুধু নিরাপত্তাই দেয়নি; বরং তাকে সেখানে তার পরবর্তী শাসক হিসেবেও নিযুক্ত করে। কিন্তু ৯২৫ হিজরিতে (১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দে) আমিনের মৃত্যুর আগেই সে পরলোকগত হয়। ওই সময় আর কোনো ভাবী শাসক ছিল না, ফলে রাশিয়া শাইখ আলি খানকে কাজানের গভর্নর নিযুক্ত করে।

সাহিব কুরাই

মুহাম্মাদ কুরাই খান তার ভাই সাহিব কুরাই খানকে ক্রিমিয়ার কাজান শহরের দায়িত্বশীল নির্বাচিত করার জন্য মস্কোকে প্রস্তাব দেয়। কিন্তু মুসলমানদের ঐক্যের ভয়ে মস্কো তা প্রত্যাখ্যান করে। মুহাম্মাদ কুরাইয়ের সাথে কাজানের অধিবাসীরা একাত্মতা প্রকাশ করে। তাদের সহযোগিতায় শাইখ আলিকে অপসারণ করে সাহিব কুরাই খানকে কাজানের দায়িত্বশীল মনোনীত করা হয়। ফলে কাজান ও ক্রিমিয়া রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ পরিচালনায় একমত হয়ে যায়। শাইখ আলির নেতৃত্বে মস্কো তার বাহিনীকে কাজানের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রেরণ করে। ৯৩০-৯৩১ হিজরি সনে (১৫২৫-১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে) এ বাহিনী কাজানের অধিবাসীদের ওপর নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালায়। এ সময় সাহিব কুরাই খান অত্র অঞ্চলের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য উসমানি খলিফা সুলাইমান কানুনিকে আবেদন করেন। খলিফা রাজি হন এবং মস্কোবাসীকে এ সংবাদ জানানোর জন্য দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু রুশরা তা প্রত্যাখ্যান করে।

সাফা কুরাই

রুশ বাহিনী দ্রুত তাদের বাহিনীকে কাজান প্রেরণ করে; যখন সাহিব কুরাই উসমানি খলিফার সহযোগিতা কামনায় খলিফার নিকট গমন করছিলেন। তখন দায়িত্বশীল হিসেবে তার ভাতিজা সাফা কুরাইকে তার দায়িত্বে রেখে যান। রুশ বাহিনী কাজান দখল করার আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু কাজান অধিবাসীদের শক্ত প্রতিরোধে তারা পরাজিত হয়। তবে কাজানের অধিবাসীরা যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে যায়। ফলে রুশ বাহিনীর কাছে তারা আবেদন জানায় যে, তারা তাদের অনুসারী হয়ে থাকবে। ফলে ৯৩৯ হিজরি সনে জান আলিকে দায়িত্বশীল হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। সাফা কুরাই বাধ্য হয়ে দায়িত্ব ছেড়ে নিজ এলাকা অভিমুখে রওনা হন। ক্রিমিয়া সর্বদা রুশদের ওপর হামলা করত, যেন কাজানের ওপর থেকে বিপদ কিছুটা কমে যায়।

কিছুদিন পরেই মস্কোর গভর্নর ওয়াসিলি ইনতেকাল করে। তার ছেলে ইভান রাহিব তখন দায়িত্ব গ্রহণ করে। মুসলমানদের ওপর বিভিন্ন জুলুম অত্যাচারের কারণে তাকে 'রাহিব' (ভয়ানক) নামক উপাধিতে স্মরণ করা হয়। ৯৪২ হিজরি সনে (১৫৩৫ খ্রিষ্টাব্দে) কাজানের দায়িত্বশীলরা জান আলিকে হত্যা করে ফেলে এবং সাফা কুরাইকে পুনরায় দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আবেদন জানায়। সে ফিরে এসে দায়িত্ব গ্রহণ করে। পরবর্তী বছর রুশদের সাথে সে যুদ্ধ করে। ৯৫৬ হিজরি সনে (১৫৪৯ খ্রিষ্টাব্দে) সাফা কুরাই ইনতেকাল করে। কাজান এলাকা তখন শাসকশূন্য হয়ে পড়ে।

রুশ বাহিনীর সাথে বেশকিছু সংঘাতের পর শাইখ আলিকে পুনরায় দায়িত্বে নিয়ে আসার ওপর সন্ধি হয়। এজন্য ক্রিমিয়ার অনেক আমিরকে কাজান থেকে বহিষ্কার করা হয়। এদের মাঝে সাহিব কুরাইয়ের পুত্র বুলাক কুরাইও ছিল।

কিছুদিন পর ইভান রাহিব কাজান সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানে মনোযোগী হয়। এ ক্ষেত্রে লিথুয়ানিয়াবাসী এবং আস্ট্রাক্যান রাজ্যের সাথে সুসম্পর্ককে শক্তি হিসেবে ব্যবহার করে। ক্রিমিয়া কর্তৃক কাজানের প্রতি সাহায্য, খলিফা সুলাইমান কানুনি কর্তৃক নোগাই শাসকের প্রতি রাশিয়ানদের প্রতিহত করার দূত প্রেরণ এবং নোগাই শাসকের কাজান পৌঁছে যাওয়া, কোনোটিই ইভানের ইচ্ছার সামনে বাধা হতে পারেনি। সকলের তৎপরতায় শাইখ আলিকে অপসারণ করে মুহাম্মাদ খানকে

ক্ষমতায় বসানো হয়েছিল। কিন্তু ইভান রাহিব স্বার্থপর বিশ্বাসঘাতক শাইখ আলির সাথে কাজান অভিমুখে বের হয় এবং সেখানকার অধিবাসীদের সাথে তুমুল লড়াইয়ের পর ৯৫৯ হিজরিতে (১৫৫২ খ্রিষ্টাব্দে) সেখানে প্রবেশ করে। এভাবে রাশিয়া অঞ্চলটি গ্রাস করে নেয় এবং তার অভিবাসীদের ওপর নিকৃষ্ট নির্যাতনের সূত্রপাত হয়, যা পরে আলোচিত হবে।

খানিয়াতে আসতারাখান

(আস্ত্রাক্যান/ আলহাজ তারখান)

আলহাজ শারকাস খান ৭৬২ হিজরিতে সারাই রাজ্য থেকে আস্ত্রাক্যান রাজ্যের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং রাজধানী সারাইয়ে হামলা করে সেখানে প্রবেশ করতে সক্ষম হন। কিন্তু কয়েক মাস পরই তাকে সেখানকার দখল ছেড়ে আসতে হয়। মোঙ্গলদের উত্তর সাম্রাজ্যে তৈমুর লং হামলা করার পর সারাই এলাকায় কুয়াইরজাক খানকে দায়িত্বশীল মনোনীত করা হয়। ৮০২ হিজরিতে (১৩৯৯ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি মৃত্যুবরণ করলে তৈমুর কুতলুগকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তারপর বুরাক খান দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার সময়েই মুহাম্মাদ ওগলান সারাই অঞ্চল দখল করেন।

আস্ত্রাক্যান আহমাদ খানের শাসনামলে ক্রিমিয়া রাজ্যের অধীনস্থ হয়। অতঃপর হুসাইন খান তাকে স্বাধীন রাজ্য বলে ঘোষণা করেন। তারপর ৯৩০ হিজরিতে (১৫২৩ খ্রিষ্টাব্দে) মুহাম্মাদ কুরাইয়ের শাসনামলে পুনরায় তা ক্রিমিয়ার অধীনে চলে আসে।

আস্ত্রাক্যান ক্রিমিয়ার আবদুল কারিম বিন আহমাদ খানের দখলে থাকে। তারপর তার ভাতিজা আকুবেগ বিন কাসিম, তারপর ৯৪১ হিজরি সনে (১৫৩৪ খ্রিষ্টাব্দে) আবদুর রহমান খানের দখলে। তারপর নোগাই গোষ্ঠী হামলা করে আস্ত্রাক্যান দখল করে নেয়। দরবেশ আলি খানকে সেখানকার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ৯৪৮ হিজরিতে (১৫৪১ খ্রিষ্টাব্দে) হায়দার খান বিন আহমাদ খানকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তারপর আহমাদ খানের নাতি আক কাদাক খানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এরপর ইয়ামগুরজি এ অঞ্চলের দায়িত্ব লাভ করেন। একপর্যায়ে সাহিব কুরাই খান ৯৫৮ হিজরিতে (১৫৫১ খ্রিষ্টাব্দে) অঞ্চলটি দখল করেন এবং দরবেশ আলি খানকে দায়িত্বে ফিরিয়ে আনেন। তারপর ইয়ামগুরজি পুনরায় আস্ত্রাক্যান রাজ্য দখল করতে সক্ষম হন এবং ক্রিমিয়ার শাসক ও নোগাইদের আমিরের সাথে উসমানি খিলাফতের সমর্থনে একমত হন। অন্যদিকে রাশিয়ান শাসক ইভান রাহিব আস্ত্রাক্যান দখলের ইচ্ছা করেন। নোগাইদের আমির মির্জা ইউসুফ এ বিষয়ে তার সাথে একাত্মতা পোষণ করেন। রাশিয়ান শাসক ইয়ামগুরজির প্রতি আস্ত্রাক্যানের সাথে

যুদ্ধে জড়ানোর হুমকি দেন। তিনি ইয়ামগুরজির নিকট দরবেশ আলি খানকে পুনরায় আস্ত্রাক্যানের ক্ষমতায় আনতে দাবি জানান। কিন্তু ইয়ামগুরজি এতে সম্মত না হওয়ায় ৯৬২ হিজরিতে (১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দে) মির্জা ইসমাইলের নেতৃত্বে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং এর মাধ্যমে ইভান এ অঞ্চল দখল করে নিতে সক্ষম হন। দরবেশ আলি খানকে সেখানকার দায়িত্ব দেওয়া হয়। দরবেশ আলি খান রুশদের সাথে সন্ধি করেন যে, তিনি আস্ত্রাক্যানের জন্য কোনো ভাবী শাসক নিযুক্ত করে যাবেন না। অর্থাৎ, তার মৃত্যুর পর এ অঞ্চল রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। তবে দরবেশ আলি চেষ্টা করছিলেন ক্রিমিয়ার শাসক দৌলত কুরাইয়ের সাথে সন্ধি করে তার কোনো সন্তানকে আমির নির্বাচিত করে যেতে। রুশ বাহিনী এ বিষয়ে অবগত হলে ৯৬৫ হিজরিতে (১৫৫৮ খ্রিষ্টাব্দে) আস্ত্রাক্যানের ওপর হামলা করে তা দখল করে নেয় এবং তাতার মুসলমানদের ওপর নৃশংস নিপীড়ন চালায়।

খানিয়াতে সাইবেরিয়া

বাতু বিন জোচি তার ভাই শাইবান আলিকে উরাল পর্বতমালার পূর্বাঞ্চলীয় গভর্নর নির্ধারণ করেন। তিনি তখন সাইবেরিয়া নামক একটি শহর প্রতিষ্ঠা করেন।

এরপর উত্তর মোঙ্গল সাম্রাজ্যের রাজধানী সারাইয়ের অধীনে ৬৪০ হিজরিতে (১২৪২ খ্রিষ্টাব্দে) সাইবেরিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা পায়। শাইবানি পরিবারের সদস্যরাই সেখানে ধারাবাহিক শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকে। কিন্তু তৈমুর লংয়ের শাসনক্ষমতার পর সারাই থেকে অন্য রাজ্যগুলোর মতো সাইবেরিয়াও স্বাধীন হয়ে যায়। কুতশুম খান ক্ষমতা গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত শাইবানি বংশধররা শাসনকার্য পরিচালনা করে। তিনি এসে রুশদের আনুগত্যমূলক তার পূর্বপুরুষদের কৃত চুক্তি ভঙ্গ করেন এবং রুশবিরোধী যুদ্ধে নোগাইদের সাথে হাত মেলান। কাজাখদের রুশবিরোধিতায় উদ্বুদ্ধ করে। ঠিক এ সময় ইয়ারমুক বিন তাইমা ধূমকেতুর মতো আত্মপ্রকাশ করে এবং কাজাখদের কিছু নরাধমকে নিজের মতাবলম্বী বানিয়ে নিতে সক্ষম হয়। তাতারের বিভিন্ন এলাকায় তারা হামলা শুরু করে। ১০০৩ হিজরিতে (১৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দে) তারা সাইবেরিয়ার একটি দুর্গ দখল করে নেয় এবং রুশদের কাছে তা বিক্রি করে দেয়। কুতশুম তখন বাশকোরতোস্তান (বাশকির) রাজ্যের দিকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন এবং নিবাস হিসেবে উফা শহরকে বেছে নেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সেখানেই বসবাস করেন। তার পুত্রদ্বয় আলি খান ও আইশাম খান পিতার শাসনকৃত এলাকাসমূহ রাশিয়ানদের থেকে পুনরুদ্ধার করতে চেষ্টা করে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে রুশ বাহিনী কাজান, আস্ত্রাক্যান, সাইবেরিয়া ইত্যাদি এলাকায় নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে উরাল পর্বতমালার পূর্বদিকে এগিয়ে যাওয়ার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখে। এরপর তারা নোগাইদের রাজ্যও নিজেদের দখলে নিয়ে নেয় এবং বনি শাইবান প্রতিষ্ঠিত সাইবেরিয়ান অধিকাংশ রাজ্যের দফারফা করে।

খানিয়াতে ক্রিমিয়া

মামাই

৭৬২ হিজরি সনে (১৩৬০ খ্রিষ্টাব্দে) মুহাম্মাদ বারদির জামাতা মামাই ক্রিমিয়া এলাকা নিয়ে সারাই থেকে পৃথক হয়ে যান এবং সেখানে আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ উজবেক খানকে ক্ষমতার মসনদে বসাতে সক্ষম হন। কিন্তু রুশ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ শুরু হলে তিনি পুনরায় ক্রিমিয়ায় ফিরে যেতে বাধ্য হন। তৈমুর লংয়ের আক্রমণ পর্যন্ত তিনি স্বঅবস্থায় বহাল থাকেন। এরপর তৈমুর লং উত্তর মোঙ্গলীয় সাম্রাজ্য দখল করে নেন এবং কুয়াইরজাক খানকে সেখানকার শাসক হিসেবে নিযুক্ত করেন।

হাজি কুরাই

৮৩৯ হিজরিতে (১৪৩৫ খ্রিষ্টাব্দে) মুহাম্মাদ ওগলান তার শাসনামলে নিজের ভাইয়ের সাথে বিরোধে জাড়িয়ে পড়লে ওগলানিদের অনেকে ক্রিমিয়া উপদ্বীপের প্রতি মনোযোগী হন। যেমনঃ গিয়াস উদ্দিন, দৌলত বারদি। হাজি কুরাই ৮৭১ হিজরিতে (১৪৬৬ খ্রিষ্টাব্দে) মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ক্রিমিয়ার শাসনক্ষমতা পরিচালনা করেন।

মাঙ্কলি কুরাই

তিনি হলেন হাজি কুরাইয়ের সন্তান। তার শাসনকালেই তার ভাই সদর তার সাথে বিদ্রোহ করেন। তিনি ক্রিমিয়ার আকফা শহরের কিছু উপকূলীয় অঞ্চলের অধিকারী জেনোয়া অধিবাসীদের পৃষ্ঠপোষকতা পান। ঠিক সে সময় সুলতান মুহাম্মাদ ফাতিহ রহ. জেনোয়াবাসীর সাথে যুদ্ধ করছিলেন। তিনি ক্রিমিয়া অঞ্চলকে তাদের থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হন। মাঙ্কলি কুরাই মুহাম্মাদ ফাতিহ রহ.-এর হাতে গ্রেফতার হলে তিনি তাকে নিয়ে ইস্তাম্বুলে চলে যান। কিছুদিন পর তাকে ক্রিমিয়ার দায়িত্বশীল নির্বাচন করে প্রেরণ করেন। সেই সময় থেকে ক্রিমিয়া উসমানি খিলাফতের অধীন হয়ে যায়।

ক্রিমিয়া ও সারাইয়ের মধ্যে শত্রুতা ছিল দীর্ঘদিন ধরে। একপর্যায়ে মাঙ্কলি কুরাই ও রুশ বাহিনীর মাঝে সংঘাত শুরু হয়ে যায়। অন্যদিকে আহমাদ খান লিথুয়ানিয়াবাসীদের নিয়ে সারাইয়ের সাথে ঐক্যবদ্ধ হন। অতএব,

দুই মিত্রের মাঝে যুদ্ধবিগ্রহ শুরু হয়। মুরতাজা বিন আহমাদ খান সারাইয়ের ক্ষমতায় আরোহণ করেন এবং ক্রিমিয়ার সাথে তার যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। ৮৯০ হিজরিতে (১৪৮৫ খ্রিষ্টাব্দে) মাঙ্কলি কুরাই সারাই এলাকায় বিজয় লাভ করেন এবং মুরতাজা খানকে বন্দি করে নেন। কিন্তু সারাইয়ের অধিবাসীরা পরবর্তী বছর হামলা করে ক্রিমিয়ার ওপর বিজয় অর্জন করে এবং মুরতাজা খানকে মুক্ত করে নেয়।

মাঙ্কলি কুরাই লিথুয়ানিয়াবাসীদের ওপর বড় ধরনের বিজয় লাভ করেন। মুরতাজা খানের ভাই আহমাদ খান বাধা হয়ে না দাঁড়ালে সকলেই তার বশ্যতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হতো। মাঙ্কলি কুরাই ৯০৭ হিজরিতে সারাই অঞ্চলের ওপর হামলা করে। তখন লিথুয়ানিয়াবাসী সারাইয়ের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়াতে পিছুটান দেখায়। অতএব, মাঙ্কলি কুরাই শহরে প্রবেশ করে ব্যাপক তাণ্ডব চালিয়ে পুরো এলাকা একেবারে মানচিত্র থেকেই নিশ্চিহ্ন করে দেন।

৯১৭ হিজরির দিকে লিথুয়ানিয়াবাসীদের সাথে রুশ সম্পর্কে ভাটা পড়ে। কারণ, লিথুয়ানিয়াবাসী তখন ক্রিমিয়ান তাতারদের সঙ্গে রাশিয়া আক্রমণের ব্যাপারে সন্ধিবদ্ধ হয়। ৯১৯ হিজরিতে মাঙ্কলি কুরাই ইনতেকাল করে।

মুহাম্মাদ কুরাই

মাঙ্কলি কুরাইয়ের মৃত্যুর পর তার ছেলে মুহাম্মাদ কুরাই ৯২১ হিজরিতে শাসনক্ষমতায় আসীন হন। তিনি তার ভাই সাহিব কুরাইকে কাজানের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে, পাশাপাশি আস্ত্রাক্যানের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। অতএব, এ সকল রাজ্য রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ঐক্যবদ্ধরূপে দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু রুশ বাহিনীর ধারাবাহিক হামলার কারণে কাজানের অধিবাসীরা তাদের সাথে সন্ধি করতে মনস্থির করে। ক্রিমিয়ার তাতাররা সেখানে দৃঢ়পদ হতে সক্ষম হলো না। তাতাররা রুশদের সাথে সার্বক্ষণিক যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল। তারা মস্কো থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত টুলা শহরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। এরপর টুলার পার্শ্ববর্তী রাজ্য রাযানে ছড়িয়ে পড়ে। তখন রাশিয়া উসমানি খলিফা প্রথম সেলিমের কাছে সাহায্যপ্রার্থনা জানায়। অতএব তিনি মুহাম্মাদ কুরাইয়ের নিকট হামলার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞামূলক বার্তা প্রেরণ করেন। মুহাম্মাদ কুরাই খলিফাকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে, রুশ বাহিনী

ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতিসাধনে মারাত্মক ভূমিকা পালনকারী। তবুও তিনি তার সিদ্ধান্তে গোঁ ধরে থাকেন। এমনইভাবে উসমানি খলিফা সুলাইমান কানুনি, বিশেষত তার ওপর অত্যন্ত প্রভাবের অধিকারিনী তার রাশিয়ান স্ত্রী রোকসালানও একই সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। এজন্য রুশ এলাকায় আক্রমণ অব্যাহত থাকেনি। মুহাম্মাদ কুরাই পোল্যান্ড অধিবাসীদের সাথেও যুদ্ধে লিপ্ত হন।

সাআদাত কুরাই

৯২৯ হিজরিতে (১৫২২ খ্রিষ্টাব্দে) মুহাম্মাদ কুরাইয়ের দুই পুত্র গাজি ও বাবা গাদ্দারি করে নিজেদের পিতাকে হত্যা করে। গাজি শাসনক্ষমতায় আরোহণ করে। ক্রিমিয়ায় ঘটে যাওয়া এ পরিস্থিতিকে উসমানি খলিফা মেনে নিতে পারেননি। মুহাম্মাদ কুরাইয়ের ভাই সাআদাত কুরাইকে তিনি নিজের প্রতিনিধি নির্ধারণ করেন। শাসনক্ষমতা স্থির হওয়ামাত্রই তিনি গাজি ও বাবাকে আটক করে তাদেরকে হত্যা করেন।

ইসলাম কুরাই

৯৩৮ হিজরিতে (১৫৩১ খ্রিষ্টাব্দে) ক্রিমিয়ার ক্ষমতার মসনদে ইসলাম কুরাই বসেন। উসমানি খলিফা ইসলাম কুরাইয়ের সাথে এ ব্যাপারে একমত হন যে, ক্রিমিয়াকে উসমানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং তিনি হবেন ক্রিমিয়ার গভর্নর। কিছুদিন পর সাহিব কুরাই ফিরে এলে ক্রিমিয়ার ক্ষমতা গ্রহণের ব্যাপারে উসমানি খলিফা তাকে সহযোগিতা করেন এবং তিনি তার ভাতিজা ইসলাম কুরাইকে হত্যা করেন।

সাহিব কুরাই

রুশ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ চরম আকার ধারণ করে। বিশেষত সাহিব কুরাই তখন কাজানের শাসনকর্তা ছিলেন। এলাকাটি তিনি তার ভাতিজা সাফা কুরাইয়ের কর্তৃত্বে রেখে সেখান থেকে বের হয়ে যান। অতঃপর ৯৫৮ হিজরিতে (১৫৫১ খ্রিষ্টাব্দে) আস্ত্রাক্যানকে তিনি নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে সক্ষম হন।

দৌলত কুরাই

সাহিব কুরাইকে হত্যা করা হয়। তার অপরাধ ছিল, কাজানের অন্তর্গত আস্ত্রাক্যান দখলের প্রচেষ্টা। কিন্তু দৌলত কুরাই রুশদের হাত থেকে

কাজানকে উদ্ধার করতে পারেনি। ৯৮৫ হিজরি পর্যন্ত তিনি ক্রিমিয়ার দায়িত্বশীল ছিলেন।

দ্বিতীয় মুহাম্মাদ কুরাই

মুহাম্মাদ কুরাই উসমানি সেনাপতি উসমান পাশাকে ককেশাস অভিযানে সহযোগিতা না করে টালবাহানা করতে লাগলেন। এতে উসমান পাশা ক্ষুব্ধ হয়ে মুহাম্মাদ কুরাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর মনস্থ করলেন। তিনি মুহাম্মাদের ভাই ইসলাম কুরাইকে ক্রিমিয়ার সিংহাসনে বসানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার সাহায্য চাইলেন। ইসলাম কুরাই তাতে সম্মত হয়ে মুহাম্মাদ কুরাইকে হত্যা করলেন এবং ওয়াদা অনুযায়ী ক্রিমিয়ার শাসনক্ষমতায় আরোহণ করলেন। এরপর থেকে ক্রিমিয়ার শাসক নির্বাচনের চাবিকাঠি ইস্তাম্বুলের হাতে চলে গেল।

ক্রিমিয়ায় রুশ কর্তৃত্ব

রাশিয়া কাজাখ গোষ্ঠীকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারার কারণ হলো উসমানি প্রধানমন্ত্রী কারা মোস্তফার মন্দ আচরণ। ১১২৫ হিজরি (১৭১৩ খ্রিষ্টাব্দ) সালের এডির্নে চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়া ক্রিমিয়াকে জিজিয়া প্রদান বন্ধ করে দেয়। এরপর তারা আজভের একটি বন্দর দখল করে নিতে সক্ষম হয়। ১১৮৬ হিজরিতে (১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে) ক্রিমিয়ার শাসক নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করে রাশিয়া। তারা শাহিন পাশার পক্ষ নেয়। এরপর ক্রিমিয়ায় তৃতীয় দৌলত কুরাইয়ের কর্তৃত্বের সময় রাশিয়া ১১৮৯ হিজরিতে (১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে) কুচুক কায়নারচা চুক্তির মাধ্যমে উসমানিদের বাধ্য করে ক্রিমিয়াকে স্বাধীনতা দিতে। তারা শাহিন পাশাকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনে। ১১৯৭ হিজরিতে (১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দে) চূড়ান্তরূপে ক্রিমিয়া দখল করে নেয় রাশিয়া। উসমানিরা আর ক্রিমিয়া পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয় না। সোভিয়েত রাশিয়া প্রতিষ্ঠার পর তারা ইউক্রেনকে উপহার হিসেবে ক্রিমিয়া প্রদান করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পরও ক্রিমিয়া ইউক্রেনের অধিভুক্তই রয়ে যায়।

রুশরা অনেক মুসলিম শাসিত অঞ্চল হজম করে ফেলেছিল। যেমন উত্তর মোঙ্গল সাম্রাজ্য, ককেশাস, তুর্কিস্তান ইত্যাদি। তারা যেখানে প্রবেশ করত, বিশেষ করে মস্কোর নিকটবর্তী এলাকাগুলোতে মুসলিমদের ওপর

কঠিন নির্যাতনের পন্থা গ্রহণ করত।[১০] তাদের অত্যাচার স্পেনের জেরা পদ্ধতির চেয়েও মারাত্মক ছিল। এমনকি তারা আরও নতুন নতুন পন্থা বের করে নির্যাতন চালাত। আমরা উদাহরণস্বরূপ কিছু উল্লেখ করছি, যদিও এগুলোই সব নয়—

- স্পেনের সাথে যোগাযোগ করে সেখানকার মুসলিমদের যেভাবে নির্যাতন করা হয়েছিল, সে পন্থা জেনে নেওয়া হতো।
- খুন, ইজ্জত লুণ্ঠনসহ নির্যাতন ও ধ্বংসের সব রকম পন্থা প্রয়োগ করা হতো।
- দেশত্যাগ করতে বাধ্য করা হতো। বিপুল সংখ্যক স্থানীয় তাতার মুসলিম হিজরত করে বিভিন্ন মুসলিম দেশ ও ইউরোপ-আমেরিকায় চলে গিয়েছিল। যারা থেকে যেত, তাদেরকে সোভিয়েতের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হতো। যে কারণে প্রতিটি এলাকায় মুসলিমরা সংখ্যালঘু হিসেবে বিবেচিত হয়। অনেককে পাঠানো হয়েছিল সাইবেরিয়ার বরফাবৃত শীতল অঞ্চলে, যেখানে ঠান্ডার সাথে লড়াই করেই অনেক মানুষের জীবন নিঃশেষ হয়ে যেত। ক্রিমিয়া, চেচনিয়া, বাশকোরতোস্তান ইত্যাদি অঞ্চলের তাতার মুসলিমদের গোটা বংশকেই সাইবেরিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অনেক জাতির ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতি প্রয়োগ হয়েছিল।
- স্থানীয় মুসলিমদের সংখ্যা কমানোর উদ্দেশ্যে তাদের বসবাসের এলাকায় রুশ বসতি বিস্তার করা শুরু হয়। স্থানীয়দের উর্বর ভূমিসমূহের মালিকানা বাজেয়াপ্ত করে রুশ অভিবাসীদের সোপর্দ করা হয়। মুসলিমদের বাড়িঘর প্রচুর পরিমাণে ধ্বংস করা হয়। অন্যান্য অমুসলিম জাতিগুলোকেও মুসলিম অঞ্চলগুলোর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। ক্রিমিয়া অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক ইহুদিকে অভিবাসিত করা হয়।
- মসজিদ ভাঙা থেকে শুরু করে, সেগুলোকে গির্জা, ঘোড়ার আস্তাবল, সেনাক্যাম্প, নাট্যশালা, মদের আড্ডা ইত্যাদিতে

---

১০. সাধারণত এটি ইনকুইজিশন নামে পরিচিত।

পরিণত করা হয়। মুসলিম ওয়াকফ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। দ্বীনি মাদরাসা-মক্তবগুলোকে খ্রিষ্টধর্মের প্রচারকেন্দ্রে রূপান্তরিত করা হয়।

- মুসলমানদের ওপর দুঃসাধ্য করের বোঝা চাপানো এবং অতি নিম্নমানের জীবনযাত্রার দিকে ঠেলে দেওয়ার মাধ্যমে তাদের জীবন দুর্বিষহ করে তোলা হয়েছিল। সেনাবাহিনীর চাকরিতে তাদের জবরদস্তিমূলক প্রবেশ করানো হতো। অবশ্য কেউ যদি ধর্ম ত্যাগ করত, তাহলে সে সব ধরনের চাপ থেকে মুক্তি পেয়ে যেত। তবে ধর্মত্যাগীদের সংখ্যাটা ছিল খুবই কম। এ ছাড়া অনেক মুসলিম নিজেদের ধর্ম গোপন করে দ্বীন রক্ষা করছিল।

- খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হতো। অর্থোডক্স ছাড়া অন্য কোনো ধর্মমত গ্রহণের শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। জারদের শাসনামলে এ ব্যাপারে আইন করা হয়। ইভান রাহিব, গ্রেট পিটার, সম্রাজ্ঞী হান্না, জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার প্রমুখের সময় এই সংক্রান্ত আইন বলবৎ থাকে। এর ওপর নানা যুগ পার হয়ে একপর্যায়ে তা শিথিলতার পথে হাঁটতে শুরু করে। যেমন দ্বিতীয় ক্যাথরিনের যুগ। তবে সেটা ইসলামের প্রতি ভালোবাসার জন্য নয়; বরং সে সময় রুশ সম্রাট উসমানিদের সাথে যুদ্ধরত ছিল। তাই তাদের ভয়ে স্থানীয়দের প্রতি কড়াকড়ির সাহস পায়নি রাশিয়ানরা। পাশাপাশি মুসলিমদের পাশে পাওয়া ও ব্যবহার করার জন্য তাদেরকে হেনস্তা করা কমিয়ে দেওয়া হয়। মোটকথা, অত্যাচারের সময়গুলো থেকে বহু মুসলিম ইসলামের পরিচয় গোপন করে প্রকাশ্যে নিজেদের খ্রিষ্টান পরিচয় দিত। কিন্তু তাদের অন্তর ছিল ইসলামের বিশ্বাসে পরিপূর্ণ। তারা প্রজন্ম পরম্পরায় গোপনে ইসলামের শিক্ষা সন্তানদের মাঝে টিকিয়ে রেখেছিল। এজন্য দেখা গেছে, ১৩২৩ হিজরিতে (১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে) ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হলে বহু তাতার মুসলিম নিজেদের ইসলামি পরিচয় প্রকাশ করে, কয়েক শতাব্দী যাবৎ যা গোপন করে রাখা হয়েছিল খ্রিষ্টান পরিচয়ের আড়ালে।

- মুসলিম পিতামাতা থেকে সন্তানদের কেড়ে নিয়ে জোরপূর্বক খ্রিষ্টান মিশনারি স্কুলে রেখে প্রতিপালন করা হতো।
- সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার পর ধর্ম সম্পর্কে তাদের চিন্তাধারা সব ধর্মের জন্যই ক্ষতিকর ছিল। তারা ধর্মকে তুলনা করত আফিমের সাথে। এজন্য ইসলাম, খ্রিষ্টধর্ম, ইহুদি ও বৌদ্ধ সব ধর্মকেই তারা নিষিদ্ধ করেছিল। কিন্তু সে সময়ও বিশেষভাবে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের নির্যাতন ও ধর-পাকড়াও করা হতো, যেটা অন্যদের বেলায় দেখা যেত না।

সোভিয়েত আমলে ইসলাম বিরোধিতার নমুনা

- সোভিয়েত আমলে মুসলিমদের যে নির্যাতন করা হয়েছে, সে তুলনায় অন্য ধর্মানুসারীদের তেমন কিছুই করা হয়নি। মূলত ধর্মহীন বলা হলেও সোভিয়েত আন্দোলনের নেতাদের কিছু ছিল ইহুদি আর কিছু খ্রিষ্টান। কোনো মুসলমান যতই আনুগত্য দেখিয়ে পার্টির কেন্দ্রে যাওয়ার চেষ্টা করত, তাদের সে সুযোগ দেওয়া হতো না। কম্যুনিজমের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যশীল হলেও কোনো মুসলিমকে বিশ্বাস করা হতো না; বরং মুসলিম বলে সামান্য সন্দেহবশত বহু মানুষকে পার্টি থেকে বহিষ্কার হতে হয় ও শাস্তির মুখে পড়তে হয়।
- হজ পালন, জাকাত আদায়সহ অন্যান্য নেক আমল থেকেও মুসলিমদের বাধা দেওয়া হতো। মুসলিম নারীদের পর্দায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হতো। রমজানে রোজা বাধাগ্রস্ত করার জন্য কর্মঘণ্টা বাড়িয়ে দেওয়া হতো। মসজিদে নামাজ আদায় করলে ভীতি প্রদর্শন করা হতো।
- রাজনৈতিক সচেতনতামূলক সংগঠনের মাধ্যমে প্রোপাগান্ডা ছড়ানো ছিল অন্যতম হাতিয়ার। সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত সবকটি অঞ্চলের ভাষায় এমন সব বইপত্র লেখা হতো, যেগুলোয় থাকত ইসলামবিদ্বেষী ও তার প্রতি ঠাট্টা, অপমানজনক কথাবার্তা। ইসলামকে পশ্চাৎপদ, অনগ্রসর ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে মুসলিমদের হীনম্মন্য করার চেষ্টা চলত।

- রুশ ভাষা শিক্ষা ছিল বাধ্যতামূলক। মাতৃভাষা লিখতে হতো ভিন্ন লিপিতে, যেন অল্পদিনেই তারা শেকড় হারিয়ে ফেলে।
- সহশিক্ষার প্রতি তোরজোর চলত, যার দ্বারা চরিত্র নষ্ট হয় এবং প্রবৃত্তির চাহিদা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।
- এতসব জুলুমের মুখে কেউ যদি প্রতিবাদী হয়ে উঠত, তাহলে তার বিরুদ্ধে চলত গুম, খুন। জানা যায়, সোভিয়েত নেতা স্টালিনের শাসনকালে প্রায় ১১ মিলিয়ন মুসলিমকে হত্যা করা হয়। বহু মুসলিম পরিবারকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার মিথ্যা অভিযোগে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়।
- সোভিয়েত রাশিয়া নানারকম কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিল। তার একটি ছিল মিথ্যা আদমশুমারি প্রকাশ। আদমশুমারির নামে মুসলিমদের সংখ্যা প্রকৃত সংখ্যার চেয়ে অনেক কম প্রকাশ করা হতো। এর উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমদের মনোবল ভেঙে দেওয়া এবং পরিস্থিতি মেনে নিয়ে তারা যেন সোভিয়েত সরকারের অনুগত হয়ে চলে। সংখ্যা কম জানা থাকলে কেউ বিদ্রোহ বা অন্য ধরনের মুক্তি প্রচেষ্টা চালানোর সাহস পাবে না; এতে বরং তাদের ওপর কেবল অত্যাচারই বাড়বে। অথচ তখনকার মুসলমানদের প্রকৃত সংখ্যা প্রকাশিত সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। তখনও প্রায় ২০ মিলিয়নের বেশি মুসলিম বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করত। আবার তাদের বংশবৃদ্ধিও ছিল রুশ ও অন্যান্য ধর্মের লোকদের চেয়ে বেশি।
- সর্বোপরি চেষ্টা চলত মুসলিমরা যেন কখনো ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে। ছোট ছোট এলাকায় তাদের দেশগুলো বিভক্ত করে দেওয়া হয়। জাতীয়তাবাদের দ্বন্দ্বমুখর চেতনা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা চলত। তাদেরকে নানারকম সমস্যায় জর্জরিত করে রাখা হতো। তাদেরকে মিশ্রিত করে দেওয়া হয়েছিল রাশিয়ান সমাজের গভীরে। কোনোপ্রকারে জীবনধারণ করাই ছিল এক সংগ্রামের নাম। এ অবস্থায় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা হয়ে উঠেছিল দুঃস্বপ্নের মতো।

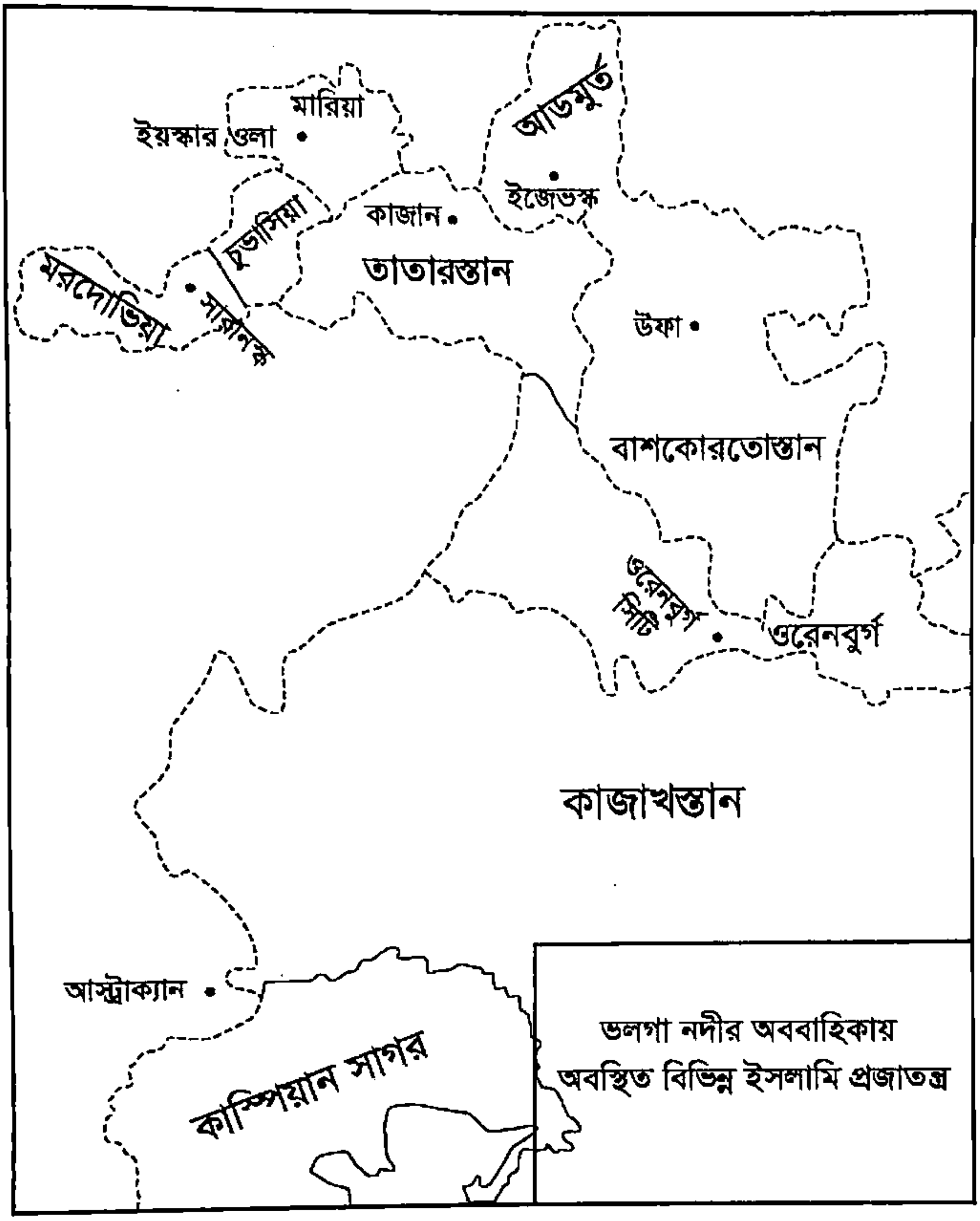
সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠন ও তার ভাঙন

সোভিয়েত আমলে রাষ্ট্রীয় কাঠামো বেশ জটিল আকার ধারণ করে। তিন স্তরে বিভক্ত শাসনাঞ্চল নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠিত হয়। প্রথম স্তরে ছিল ১৫টি প্রজাতন্ত্র। এগুলো মিলেই সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠিত হয়। সবগুলো প্রজাতন্ত্র একটি কেন্দ্র তথা মস্কো থেকে শাসন করা হতো। এই ১৫টি প্রজাতন্ত্রের মধ্যে ছিল মুসলিমপ্রধান তুর্কি প্রজাতন্ত্রগুলো ও আজারবাইজান প্রজাতন্ত্র। দ্বিতীয় স্তরে উপরিউক্ত ১৫টি প্রজাতন্ত্রের অধীনে আরও কিছু স্বায়ত্তশাসিত অঙ্গরাজ্য ছিল। কিন্তু এগুলোর স্বায়ত্তশাসন কেবল নামেই; কার্যত সেগুলো পরাধীনই ছিল। জনমনে খেয়ালি তৃপ্তি জাগাতে এগুলোর শুরুতে স্বায়ত্তশাসনের নাম জুড়ে দেওয়া হয়। তৃতীয় স্তরে ছিল পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলগুলো। এগুলোতেও কার্যত কোনো স্বাধীন স্বায়ত্তশাসন ছিল না।

মোঙ্গলদের উত্তর সাম্রাজ্য তথা গোল্ডেন হোর্ডের অধিকাংশ এলাকা ও ককেশাস অঞ্চল সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত ছিল। স্বশাসিত অঞ্চল শিরোনামে সবকিছুই ছিল মূলত রাশিয়ার অধীনে। আর ক্রিমিয়া রাজ্য ছিল সোভিয়েত ইউক্রেনের অধীনে।

১৪১১ হিজরিতে (১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে) সোভিয়েতের পতনের পর মূল কাঠামো সৃষ্টিকারী মুসলিম প্রজাতন্ত্রগুলো রাশিয়া থেকে স্বাধীনতা লাভ করে, যথাঃ আজারবাইজান, কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান, কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তান। কিন্তু স্বশাসিত রাজ্য ও অঞ্চলগুলো স্বাধীনতা লাভ করতে পারেনি। এগুলো রাশিয়া কিংবা ইউক্রেনের অন্তর্গত রয়ে যায়।

রাশিয়ার মধ্যে হারিয়ে যাওয়া মুসলিম স্বশাসিত অঞ্চল ও প্রদেশগুলোর মানচিত্র—



মানাচিত্র নং-১২

সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত স্বায়ত্তশাসিত মুসলিম প্রজাতন্ত্র ও অঞ্চলসমূহ

এই মানচিত্রে সোভিয়েত রাশিয়ার অন্তর্গত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মুসলিম স্বশাসিত এলাকা দেখানো হয়েছে।

- বাশকোরতোস্তান প্রজাতন্ত্র (Republic of Bashkortostan), রাজধানী স্টার্লিটামাক (Sterlitamak)।
- তাতারস্তান প্রজাতন্ত্র (Tatarstan), রাজধানী কাজান (Kazan)।

- চুভাসিয়া প্রজাতন্ত্র (Chuvashia Republic), রাজধানী চেবোকসারি (Cheboksary)।
- মরদোভিয়া প্রজাতন্ত্র (Mordovia), রাজধানী সারানস্ক (Saransk)।
- মারি এল প্রজাতন্ত্র (Mari El Republic), রাজধানী ইয়স্কার ওলা (Yoshkar-Ola)।
- আডমুর্ত প্রজাতন্ত্র (Udmurt Republic), রাজধানী ইজেভস্ক (Izhevsk)।
- ওরেনবুর্গ প্রদেশ (Orenburg Oblast), রাজধানী ওরেনবুর্গ শহর (Orenburg)।

মুসলিমদের প্রতিরোধ

ধর্মান্তর কিংবা নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে এত যে জুলুম অত্যাচার চলল, এরপরও কিন্তু মুসলিম উম্মাহ এই অঞ্চল থেকে হারিয়ে যায়নি। সবকিছু সহ্য করে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল প্রাণের চেয়েও প্রিয় ঈমান। উত্থানকালে তারা যেমন প্রচণ্ড প্রতাপে সবকিছু জয় করেছিল, পতনকালেও প্রচণ্ড ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছিল। তাতার মুসলিমদের ওপর রুশ অত্যাচারের মাত্রা সবকিছুকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কারণ, তাদের অবস্থান ছিল মস্কো থেকে কাছে। কিন্তু এতকিছুর পরও মুসলিমরা দুঃখ-দুর্দশা ভুলে রাশিয়ান বিধর্মীদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর চেষ্টা করেছে। তাদের দাওয়াতে তখনও বহু পৌত্তলিক গোষ্ঠী ইসলামের শীতল ছায়ায় প্রবেশ করে।

কোনোভাবে যদি নির্যাতন একটু শিথিল হতো, সে সময়টাকে তারা গ্রহণ করত গনিমত হিসেবে। যেমন, সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথরিনের সময়ে মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সে সময় বহু মানুষ তাদের গোপন ইসলামি পরিচয় প্রকাশ করে এবং চারদিকে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দিতে থাকে। কিন্তু ক্যাথরিনের শাসন পতনের পরই এমন সব জার ক্ষমতায় আসতে থাকে, যারা ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ দেখিয়ে পূর্বের জারদেরও ছাড়িয়ে যায়। ফলে অত্যাচারের মুখে মুসলিমরা আবার তাদের ইসলামি পরিচয় গোপন করতে বাধ্য হয়।

এসব কারণে রুশদের প্রতি তাতার মুসলিমদের ঘৃণা চরম আকার ধারণ করে। এমনকি ইসলাম তাদের রক্তেমাংসে মিশে যায়। একসময় তাতার আর মুসলিম শব্দ যেন সমার্থক হয়ে পড়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তাতাররা রাশিয়ান সরকার পতনের জন্য সব ধরনের চেষ্টায় অংশগ্রহণ করে। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হলো, প্রতিটি সংগ্রামী দলই তাতারদের আশাজনক প্রতিশ্রুতি দিত। কিন্তু ক্ষমতায় পৌঁছেই সেসব ভুলে যেত। কখনো আগের চেয়েও বেশি নির্যাতন চলত। তবে এরপরও মুসলিমরা সরলই রয়ে যায়। তারা রাজনৈতিক মিথ্যা আশ্বাসের শিকার হতেই থাকে একের পর এক। অতীতের ঘটনা থেকে তারা শিক্ষা নিতে পারেনি। গণতান্ত্রিক ফ্রন্টকে সহায়তা করা ছিল তাদের পূর্বের ভুলেরই পুনরাবৃত্তি; তারাও তাদের সাথে কথার বরখেলাপ করে। এরপর মুসলিমরা ঝুঁকল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী দলের দিকে। আবার সেই ওয়াদা ওয়াদা খেলার পুনরাবৃত্তিই ঘটল এবং নিষ্পেষিত হলো সরলপ্রাণ মুসলিমরা।

এরপর ১৩৩৬ হিজরি সনে (১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে) রাশিয়ায় এলো বলশেভিক বিপ্লব। এবারও তাদেরকে সুন্দর সুন্দর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। বলা হলো, তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হবে। জারদের সময়ে হওয়া অত্যাচার আর থাকবে না। অতএব, তারা যেন বলশেভিক বিপ্লবে সহায়তা করে। এবারও মুসলিমরা সরলভাবে বিশ্বাস করে নিলো বলশেভিকদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। কিন্তু তারা রাষ্ট্রক্ষমতায় এসে পূর্বের মতো অত্যাচার ও পরাধীনতা দুটোই আরও ভালো করে চাপিয়ে দিলো। তাদের বিরুদ্ধে অঙ্কিত হলো ভয়ানক নিষ্পেষণের ছক।

আরও বিভিন্ন পন্থায় তাতাররা আন্দোলন, সংগ্রাম করে মুক্তির প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক দল গঠন করে তার ব্যানারে কর্মসূচি পালন করত। কিন্তু সোভিয়েতরা সেগুলো নিশ্চিহ্ন করে দেয়। আর যা কিছু বাকি ছিল, সেগুলোর গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো দখল করে তারা নিজেরাই সব নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল।

স্বাধীনতা সংগ্রাম

তাতার মুসলিমরা রাশিয়া থেকে স্বাধীনতার জন্য স্বশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নেয়। ১৩৩৬ হিজরিতে (১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে) রাশিয়ার বলশেভিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বেশকিছু সেনা ফ্রন্ট তৈরি করে। তাতারস্তান ও বাশকোরতোস্তান প্রদেশ নিয়ে 'আইডেল উরাল' নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করে। কিন্তু রুশ বাহিনী এসে গুঁড়িয়ে দেয় স্বপ্নের স্বাধীনতা।

অন্যদিকে এর আগেই ক্রিমিয়ার তাতাররা একটি বোর্ড গঠন করে স্বাধীন রাষ্ট্রের লক্ষ্যে চেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু তাদের স্বাধীন রাষ্ট্রও তিন মাসের বেশি টিকেনি। রুশ শক্তি এখানেও তাতারদের স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ক্রিমিয়ান তাতাররা আরেকবার চেষ্টা করে রাশিয়া থেকে মুক্ত হওয়ার। তারা জার্মান বাহিনীকে সহায়তা করে এবং জার্মানদের আক্রমণের সময় প্রতিরোধ না করে আত্মসমর্পণ করে। তাদের ধারণা ছিল জার্মানরা এর মর্যাদা রক্ষা করবে। কিন্তু তা হয়নি। হিটলারের বাহিনী আত্মসমর্পণকারী তাতার মুসলিমদের নির্দেশ দেয় দেড়শ কিলোমিটার পথ খালি পায়ে হেঁটে যেতে। এই কঠিন পথযাত্রায় মৃত্যুযাত্রী হয়ে যায় বহু মুসলিম। যারা এই অমানুষিক পদযাত্রা শেষ করতে পেরেছিল তাদেরকে রাখা হয় কারাগারে। বন্দিদের ক্ষুৎপিপাসায় মারার জন্য কারাগারে খাবার সরবরাহ বন্ধ ছিল। সে অসহনীয় পরিবেশে জীবনের মায়ায় জীবিতরা মৃতদের লাশ খেয়ে বাঁচার চেষ্টা করে। এরপরও যারা টিকে ছিল তাদেরকে কারাগার থেকে বের করে এনে গুলিতে ঝাঁঝরা করে হত্যা করা হলো। কিন্তু দুর্ভোগ আরও বাকি ছিল।

জার্মানদের পরাজয়ের পর রাশিয়া ক্রিমিয়ার তাতারদের থেকে আরও বড় প্রতিশোধ নিতে শুরু করে। জার্মানদের সহযোগিতার কারণে তাদেরকে তারা যুদ্ধাপরাধী সাব্যস্ত করে এবং মসজিদ ধ্বংস করা ও জনসমক্ষে কুরআন পোড়ানোসহ নিরস্ত্র মানুষের ওপর অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপর জীবিতদের নির্বাসিত করা হয় সাইবেরিয়ার দুঃসহ বরফাবৃত এলাকায়। সেখানে অনেক তাতার মুসলমান মারা যায়। যারা ছিল তারাও মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। এরপর ক্রিমিয়া উপদ্বীপে হাতে গোনা কিছু তাতার ছাড়া আর কোনো মুসলিম অবশিষ্ট রইল না।

⸻দ্রষ্টব্য⸻

বর্তমানে সেসব মুসলিমের বংশধর যারা রাশিয়ায় বাস করে, তারা ভুলে গেছে তাদের ধর্মীয় পরিচয়। ক্রমাগত রাশিয়ান বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন এবং ইসলামের ওপর প্রোপাগান্ডার দরুন মুসলিমরা আজ হারিয়ে গেছে ভ্রান্ত ধারণার অতলে।

তুর্কিস্তান ও ককেশাসের মুসলিমদের আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আসবে ইনশাআল্লাহ।

ইরানে মোঙ্গল শাসন

চেঙ্গিস খান তার পুত্র তুলুইকে পারস্য, খোরাসান এবং আরব ও এশিয়া মাইনর যতদূর বিস্তৃত হবে তার সবটুকুর কর্তৃত্ব প্রদান করেন। চেঙ্গিসের বংশধরদের মধ্যে তুলুইয়ের সন্তানরাই সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যের রাজত্ব লাভ করেছিল। কারণ, একদিকে যেমন তুলুইয়ের পুত্র হালাকু খান এবং তারপর তার বংশধরগণ মধ্যপ্রাচ্য শাসন করে, অন্যদিকে হালাকুর ভাই কুবলাই খান চীনে শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এই অধ্যায়ে হালাকু খানের শাসিত অঞ্চল নিয়ে আলোচনা করা হবে, যার নাম ছিল ইলখানিয়া সাম্রাজ্য। পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে কুবলাইয়ের শাসিত এলাকা নিয়ে।

হালাকু খান

মোঙ্গল ইতিহাসের আলোচিত এক নাম হচ্ছে হালাকু খান। আব্বাসি খিলাফতের সমাপ্তি আলোচনায় এবং পূর্ববর্তী অধ্যায়েও আমরা তার সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তাতারদের সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহর মনে যে অসন্তোষ ও ঘৃণা কাজ করে, তার প্রধান কারণ এই হালাকু খান। তার নিষ্ঠুর অত্যাচার ও নির্মমতার কাহিনি শুনলে এখনো মানুষের গা শিউরে ওঠে!

হালাকু খান যুদ্ধনেশায় শুধু দেশ জয় করেই ক্ষান্ত হতেন না; বরং বিজিত অঞ্চলে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো ছিল তার প্রিয় স্বভাব। এই হালাকু খানের হাতে ধ্বংস হয় তৎকালীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র, সুন্দরতম নগরী ও আব্বাসীয় খিলাফতের রাজধানী বাগদাদ। ৬৫৬ হিজরিতে (১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে) বাগদাদে রীতিমতো গণহত্যা চলে হালাকু খানের হাতে। তারপর শামে প্রবেশ করে হালাকু খানের ঘাতক বাহিনী। দখল করে নেয় হালাব (আলেপ্পো)। এদিকে মোঙ্গল সাম্রাজ্যের সিংহাসন নিয়ে হালাকু খানের অন্যান্য ভাইয়ের মাঝে দ্বন্দ্ব চলছিল। হালাকু খান সাম্রাজ্যের কেন্দ্র কারাকোরামে ফিরে গিয়ে তার ভাই কুবলাই খানকে সাহায্য করেন। তার

সহায়তায় কুবলাই খান ওগেদাইয়ের সন্তানদের পরাজিত করে সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ও সিংহাসন দখলের মাধ্যমে গ্রেট খান উপাধি লাভ করেন। শামে ফেরার সময় হালাকু খান ভেবেছিলেন তার সহকারী কিতবুগা দামেশক বিজয় করে তার জন্য লাল গালিচা বিছিয়ে রাখবে। কিন্তু কিতবুগার বাহিনী আইনে জালুতে সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজের হাতে বিধ্বস্ত হয়। কিতবুগা নিজেও নিহত হয়। এতে মুসলিম পৃষ্ঠপোষক চাচাতো ভাই বারকে খানের প্রতি হালাকু খান চরম ক্রোধান্বিত হন। উভয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। প্রথম দফায় বারকে খান জয়ী হন। কিন্তু দ্বিতীয় দফায় হালাকু তার পুত্র আবাকা খানকে নিয়ে আবারও হামলা চালান। বারকে খানের বাহিনী দারবান্দ শহরে হালাকুর কাছে পরাজিত হয়। প্রতিক্রিয়ায় বারকে খান পুনরায় তার বাহিনী বিন্যস্ত করে হামলা চালান এবং ককেশাসের অন্তর্ভুক্ত তুর্ক নদীর তীরে হালাকু খানকে পরাস্ত করেন। হালাকু খানের সৈনিকদের উল্লেখযোগ্য অংশ পালিয়ে শামে চলে যায় এবং জাহের বাইবার্সের দলে যোগ দেয়। তারা ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। এ অবস্থায় হালাকু খান আরও চতুর্মুখী সমস্যার মুখে পড়েন ও তার পতন ঘটে।

মুসলিমদের প্রতি হালাকু খানের বিদ্বেষ ছিল সীমাতিরিক্ত। এক খ্রিষ্টান নারী বিয়ে করার পর বিদ্বেষের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য হালাকু খানকে নিয়মিত উসকানি দিত তার খ্রিষ্টান স্ত্রী। মৃত্যুর আগে হালাকু খানের কিছুটা সুমতি হয়। নিজের দ্বিতীয় পুত্র তেকুদারকে কোনো এক মুসলিম পরিবারে প্রতিপালন করার অসিয়ত করে যান। ৬৬৩ হিজরিতে (১২৬৫ খ্রিষ্টাব্দে) হালাকু খান মৃত্যুবরণ করেন।

আবাকা খান

হালাকু খানের পুত্র আবাকা খান। রাজত্বের পুরোটা সময় তার চতুর্মুখী যুদ্ধে যুদ্ধে কাটে। উত্তর দিকে লড়াই চলছিল আপন চাচাতো ভাইদের সাথে। প্রথম কিছুদিন বারকে খান, তারপর মাংকো তৈমুরের বিরুদ্ধে। মাংকোর বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে অনেক বড় বিজয় লাভ করেন আবাকা খান। কিন্তু এরপর তার বিরুদ্ধে একাট্টা হয় তিন বংশ। কেদু বিন কাশিনের নেতৃত্বে ওগেদাই বংশ এবং বুরাক খানের নেতৃত্বে চাগতাই বংশ এসে উত্তর সাম্রাজ্যের মোঙ্গলীয়দের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়। তারপর পূর্ব দিক থেকেও আক্রমণ শুরু হয়।

এদিকে পশ্চিম পাশে একের পর এক সংঘর্ষ চলছিল মামলুকদের সাথে। মামলুকরা একাধিকবার আবাকা খানের বিরুদ্ধে জয় লাভ করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি বিজয় আসে ৬৭৩ হিজরিতে (১২৭৪ খ্রিষ্টাব্দে)। বাইবার্সের সময়ে মামলুকরা আনাতোলিয়া পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। ৬৭৯ হিজরিতে (১২৮০ খ্রিষ্টাব্দে) আবাকা খান শাম দখলের চেষ্টা করে পর্যুদস্ত হয়। ৬৮০ হিজরিতে (১২৮১ খ্রিষ্টাব্দে) পুনরায় সুলতান কালাউনের বাহিনীর কাছে বিধ্বস্ত হয় তার বাহিনী। এ সময় ফুরাত নদী পর্যন্ত মামলুকদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ফুরাতই ছিল মামলুক ও ইলখানিয়া মোঙ্গল সাম্রাজ্যের সীমানা। ৬৮০ হিজরিতে (১২৮১ খ্রিষ্টাব্দে) আবাকা খান মৃত্যুবরণ করেন। তার সাম্রাজ্যে অধিষ্ঠিত হয় তার ভাই তেকুদার খান। আবাকা খান মুসলিমবিদ্বেষী হয়ে উঠেছিল তার বাবা হালাকু খানের উত্তরাধিকারসূত্রে। আবার আবাকা খানও নিজ পুত্র আরগুনের জন্য সেই উত্তরাধিকার রেখে যান অক্ষুণ্নভাবে। আবাকা খানের ইসলামবিদ্বেষের নেপথ্যে অন্যতম কারণ ছিল কনস্টান্টিনোপলের রাজকন্যা। খ্রিষ্টচক্র পরিকল্পনামাফিক তার সাথে রাজকন্যাকে বিয়ে দিয়েছিল তাকে ব্যবহার করে স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে।

তেকুদার

হালাকু বংশের প্রথম মুসলিম। এই পুত্রকে প্রতিপালনের জন্য হালাকু খান এক মুসলিম পরিবারকে দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। তেকুদার ইসলামি পরিবেশে লালিতপালিত হওয়ায় স্বভাবতই মুসলিম মানসিকতা নিয়ে বেড়ে ওঠেন। তিনি নিজের নাম রাখেন আহমাদ। ক্ষমতায় আরোহণ করে তেকুদার আহমাদ ৬৮১ হিজরিতে (১২৮২ খ্রিষ্টাব্দে) মামলুক সুলতান কালাউনের সাথে শান্তিচুক্তি করতে মনস্থ করেন। কিন্তু তখন আবাকা খানের পুত্র আরগুন খান চাচা তেকুদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাকে হত্যা করে ফেলেন। যেসময় তেকুদার মামলুক সুলতানের কাছে দূত প্রেরণ করেছিলেন ঠিক সে সময়ই তাকে হটিয়ে ক্ষমতায় বসেন ভাতিজা আরগুন।

আরগুন

আরগুন পিতার কাছ থেকে প্রচণ্ড ইসলামবিদ্বেষ নিয়ে বড় হন। তাই তিনি মুসলিম চাচা থেকে মুক্তি পেতে তাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেন। এরপর

মামলুক ও গোল্ডেন হোর্ডের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য মিত্রতা গড়ে তোলেন খ্রিষ্টশক্তি ও আর্মেনীয়দের সাথে। তখনকার গোল্ডেন হোর্ডের অধিপতি তোদান মাংকো খানও ছিলেন মুসলিম। ৬৯১ হিজরিতে (১২৯২ খ্রিষ্টাব্দে) আরগুন মৃত্যুবরণ করে। তার স্থলবর্তী হন তার ভাই কিগাতো।

কিগাতো

অল্প কয়েকদিন শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। ৬৯৩ হিজরিতে (১২৯৪ খ্রিষ্টাব্দে) নিহত হন।

বায়দো

তিনি হলেন কিগাতোর চাচাতো ভাই। অর্থাৎ হালাকু খানের ছেলে তারখাইয়ের পুত্র। তার শাসনকালও দীর্ঘ হয়নি। ৬৯৫ হিজরিতে (১২৯৬ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি নিহত হন।

গাজান

গাজান প্রথমে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তারপর ৬৯৪ হিজরিতে (১২৯৫ খ্রিষ্টাব্দে) ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়ে নিজের নাম রাখেন মাহমুদ। ৬৯৫ হিজরিতে (১২৯৬ খ্রিষ্টাব্দে) ক্ষমতায় বসার সাথে সাথেই তুলুই বংশের সকল মানুষসহ প্রায় ৭০ হাজার তাতার ইসলাম গ্রহণ করে। এর মাধ্যমে ইলখানিয়া সাম্রাজ্য মুসলিম সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। কিন্তু এরপরও মামলুকদের সাথে তার লড়াই অব্যাহত ছিল। অধিকাংশ যুদ্ধে তার পরাজয় হতো।

মামলুকদের বিরুদ্ধে তার বড় পরাজয়ের ঘটনাটি ঘটে ৭০২ হিজরিতে (১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দে) শাকহাব যুদ্ধে। শামে সংঘটিত এই যুদ্ধে তাতারদের মোকাবিলায় দাঁড়িয়েছিলেন মহান ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ., মামলুক সুলতান ও আব্বাসি খালিফা। এই যুদ্ধে গাজান ভীষণ পর্যুদস্ত হয়। একই সময়ে উত্তরে মারাগা ও তাবরিজ দখলকে কেন্দ্র করে গোল্ডেন হোর্ডের তৎকালীন ক্ষমতাসীন তাকতাইয়ের সাথেও লড়াই চলছিল। শামের পরাজয়ের ফলে উত্তরের লড়াইও থামিয়ে দিতে বাধ্য হন গাজান। ৭০৩ হিজরিতে (১৩০৪ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি ইনতেকাল করেন। তার স্থলবর্তী হন তারই ভাই উলজাইতু।

উলজাইতু

প্রথম জীবনে খ্রিষ্টধর্মে প্রতিপালিত হন। তারপর ইসলাম গ্রহণ করে মুহাম্মাদ (মুহাম্মাদ খরাবান্দা) নাম ধারণ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, ৭০৯ হিজরিতে তিনি শিয়া রাফেজি মতবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন, এমনকি শিয়া মতবাদ অনুসরণ করতে নিজ প্রজাদের বাধ্য করেন। মামলুক ও উত্তর মোঙ্গল সাম্রাজ্যের সাথে একাধিকবার তার সংঘর্ষ হয়। উত্তর সাম্রাজ্যের তাকতাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তার জয় লাভ হয়। এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা ছিল দুই পলাতক মামলুক আমির কারা সুনকুর ও আফরামের। এজন্য তাকতাই ইলখানিয়া সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযানের উদ্দেশ্যে মামলুক সুলতানের সাথে যোগাযোগ করে। কিন্তু কিছুদিনের মাঝেই তাকতাইয়ের মৃত্যু ঘটে। ইলখানিয়া বিরোধী যুদ্ধে অধিকাংশ জয় হয় মামলুকদেরই। ৭১৬ হিজরিতে (১৩১৬ খ্রিষ্টাব্দে) মুহাম্মাদ খরাবান্দার কাছে মক্কা থেকে হামিজা বিন আবি নুমাই এসে মক্কায় হামলা করতে উদ্বুদ্ধ করে। মুহাম্মাদ খরাবান্দা তাকে সহায়তা করে। মক্কাবাসী ছিল সুন্নি, এটিই হয়তো তাকে উদ্বুদ্ধ করে থাকবে। কিন্তু খরাবান্দা মক্কায় আক্রমণের আগেই মৃত্যুবরণ করেন। ফলে যুদ্ধ থেমে যায়। তারপর তার পুত্র আবু সাইদ ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

আবু সাইদ

আবু সাইদ ক্ষমতায় বসে নিতান্তই শিশু বয়সে। সে সময় তার মৃত বাবার মন্ত্রী চুবান উত্তর সাম্রাজ্যের সুলতান মুহাম্মাদ উজবেকের সাথে যোগাযোগ করে আবু সাইদের অঞ্চলে অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব জানান। কিন্তু মুহাম্মাদ উজবেক তা প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর চাগতাই পরিবারের সেনাপতি ইয়াইসুরের সাথে আবু সাইদের বাহিনীর লড়াই হয়। এ লড়াইয়ে আবু সাইদ জয়লাভ করে। আবু সাইদের বিরুদ্ধে মুহাম্মাদ উজবেক ও ইয়াইসুর একতাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ইয়াইসুরের পরাজয়ে মুহাম্মাদ উজবেককে যুদ্ধবিরতি দিয়ে পিছু হটতে হয়।

তখন মুহাম্মাদ উজবেক মামলুক সুলতানের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করতে চাইলেন। কিন্তু মামলুক সুলতান মুহাম্মাদ বিন কালাউন উল্টো সন্ধি করে নেন আবু সাইদের সাথে।

আবু সাইদের সময়ে ধীরে ধীরে তার পিতার শিয়া চিন্তাধারা বিলুপ্ত হয়ে সুন্নি মতবাদ ফিরে আসতে লাগল। অন্যদিকে সে সময় ইলখানিয়াজুড়ে বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আঞ্চলিক শাসকেরা তাদের এলাকা নিয়ে স্বাধীন হয়ে যেতে লাগল। ফলে অল্প সময়ে ইলখানিয়া সাম্রাজ্য কয়েক টুকরো হয়ে পড়ে। সেখানে তৈরি হয় কয়েকটি নতুন রাজ্য; যেমন জালায়িরিয়্যা, আরাতিকা ইত্যাদি। দেশজুড়ে সৃষ্টি হয় অরাজক এক পরিস্থিতি। এভাবে ইলখানিয়া সাম্রাজ্যের পতন ঘটে, যার শেষ শাসক ছিলেন আবু সাইদ।

৭৮৪ হিজরিতে (১৩৮২ খ্রিষ্টাব্দে) তৈমুর লং এই এলাকায় অভিযানের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। ৮০৭ হিজরিতে (১৪০৪ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি পুরো সাম্রাজ্যে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তৈমুরের মৃত্যুর পর আবার সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে যায়। তার বংশধরদের মাঝে সবকিছু ভাগবাটোয়ারা হয়ে পড়ে। তৈমুর ছিল শিয়া রাফেজি মতবাদের অনুসারী। এ মতবাদ তার বংশধরদের মাঝেও চলতে থাকে। তৈমুরীয় অঞ্চলে শিয়া মতবাদের বিস্তারে তাদের বিশেষ ভূমিকা ছিল।

সাফাভি শাসন[১১]

তৈমুরের বংশধরদের মাঝে সাম্রাজ্য খণ্ডবিখণ্ড হয়ে পড়ে এবং সেখানে দুর্বলতার রূপ প্রকট হতে শুরু করে। এই সুযোগে ইলখানিয়া সাম্রাজ্যে সাফাভিদের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

ইসমাইল সাফাভি

সাফাভি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ইসমাইল সাফাভি। পিতার নাম হায়দার, দাদা জুনাইদ। এই বংশের পূর্বপুরুষ সফিউদ্দিন আরদাবিলির (আরদাবিল আজারবাইজানের একটি শহর) নামানুসারে সাফাভি সাম্রাজ্যের নামকরণ হয় (সফি থেকে সাফাভি। ইসমাইল সাফাভি কিছু তুর্কমেন সৈনিক সংগ্রহ করে ৯০৭ হিজরিতে (১৪০৪ খ্রিষ্টাব্দে) আক-কিলুনি বংশের রাজত্ব দখল করে ইরাক ও আজারবাইজানের অধিকাংশ এলাকাজুড়ে নতুন সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। তাবরিজ ছিল এই সাম্রাজ্যের রাজধানী। তৈমুর বংশের অনুগত আমিররা ইসমাইলের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। ইসমাইল সাফাভি রাজত্বকালে শিয়া মতবাদ গ্রহণ করেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বিশাল রাজত্বের অধিকারী হয়ে ওঠেন। পূর্বে আফগানিস্তানের হেরাত ও আমু দরিয়া, দক্ষিণে আরব উপসাগর ও ওমান উপসাগর ছিল তার সীমানা।

---

১১. সাফাভি রাজবংশ ছিল পারস্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশগুলোর অন্যতম। একে আধুনিক পারস্যের ইতিহাসের সূচনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মুসলিমদের পারস্য বিজয়ের পর এটি অন্যতম বৃহৎ পারস্য সাম্রাজ্য। এই রাজবংশ ইসনা আশারিয়া (বারো ইমামপন্থি) শিয়া মতবাদকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। তাদের শাসনকাল ছিল ১৫০১-১৭৩৬ খ্রিষ্টাব্দ। সাম্রাজ্যের সীমায় আধুনিক ইরান, আজারবাইজান, বাহরাইন ও আর্মেনিয়া; জর্জিয়া, উত্তর ককেশাস, ইরাক, কুয়েত ও আফগানিস্তানের অধিকাংশ এবং তুরস্ক, সিরিয়া, পাকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও উজবেকিস্তানের অংশ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইংরেজিতে 'গান পাউডার এম্পায়ার' বা 'বারুদ সাম্রাজ্য' বলে পরিচিত সাম্রাজ্যগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম ছিল। অন্য সাম্রাজ্যগুলো ছিল সাফাভি সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী উসমানীয় সাম্রাজ্য ও মোঘল সাম্রাজ্য। উসমানিদের সাথে সাফাভিদের বেশ কয়েকটি যুদ্ধ হয়। সাফাভি শাসন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, ডক্টর সুহাইল তাক্কুশ রচিত *আদ দাওলাতুস সাফাভিয়্যাহ ফিল ইরান*। –সম্পাদক

শিয়ারা সংখ্যায় কম হলেও ত্রাণকর্তার মতো আবির্ভূত হওয়া ইসমাইলকে তারা সবাই সমর্থন দেয়। প্রতিটি যুদ্ধেই শিয়া সৈনিক ছিল তার প্রধান হাতিয়ার। একপর্যায়ে ৯২০ হিজরির এক যুদ্ধে চালদিরান রণাঙ্গনে উসমানিদের সাথে ইসমাইল পরাজিত হন। এই পরাজয়ের মধ্য দিয়ে দিয়ারেবকর, তাবরিজ অঞ্চল উসমানিদের হাতে চলে যায়। এ ছাড়া, পূর্বাঞ্চলে উজবেকদের সাথেও ইসমাইলের লড়াই ছিল অব্যাহত। শুরুর দিকে তিনি তাদের বিরুদ্ধে জয় লাভ করেন। তবে পরবর্তী সময়ে উজবেকরা জয় লাভ করে পরাজিত অঞ্চলসমূহ উদ্ধার করে নেয়। তারা ইসমাইলকে শিয়াবাদ ছেড়ে প্রকৃত ইসলাম ও আহলুস সুন্নাহর পথে ফিরে আসতে আহ্বান জানিয়েছিল। কিন্তু ইসমাইল এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে শিয়া মতবাদ আঁকড়ে থাকেন। তার সাথে দিল্লির শাসক বাবরের বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু তার শিয়া মতবাদের কারণে এই সম্পর্ক স্থায়ী হয়নি।

সুন্নি মুসলিমদের প্রতি প্রচণ্ড পরিমাণে বিদ্বেষী ছিলেন ইসমাইল সাফাভি। সুন্নিদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য পর্তুগিজ ও ক্রুসেডারদের সাথেও তার মিত্রতা গড়ে উঠেছিল। বিশেষত সুন্নিদের তৎকালীন বৃহৎ সাম্রাজ্য উসমানিদের মোকাবিলা ছিল এ ক্ষেত্রে তার লক্ষ্য।

৯৩০ হিজরিতে ইসমাইল মৃত্যুবরণ করেন। তার সিংহাসন লাভ করেন পুত্র তাহমাস্প। ইসমাইল রাজত্বকালে শাহ উপাধি ধারণ করেন। তার পরবর্তী সম্রাটদের কালেও এই রীতি অব্যাহত থাকে।

তাহমাস্প

অল্প বয়সেই রাজত্ব লাভ করেন তাহমাস্প। শুরুর দিকে রাজত্ব চলছিল কার্যত শিয়া নেতৃবৃন্দের হাতে। পুরোপুরি স্বনির্ভর হওয়ার পর তাহমাস্প নিজের দায়িত্ব সামলাতে শুরু করেন। উজবেকদের সাথে যুদ্ধে জয় পান তাহমাস্প। এদিকে বাগদাদের আমির উসমানি সুলতানের আনুগত্যের ঘোষণা দেয়। বাগদাদে কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনতে তাহমাস্প সেদিকে রওনা হন। কিন্তু তার আগেই উসমানিরা ইরাকে প্রবেশ করে বাগদাদে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে এবং ইরাক হতে সাফাভিদের বিতাড়িত করে। ঠিক সে সময় উজবেকরা পূর্ব দিক থেকে সাফাভি সাম্রাজ্যে আক্রমণ চালায় এবং খোরাসানের রাজধানী মাশহাদ দখল করে নেয়। দ্বিমুখী আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে তাহমাস্প উসমানিদের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। এর মাধ্যমে পূর্ব পশ্চিম দুই প্রান্তেই পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে। ৯৮৪ হিজরিতে (১৫৭৬

খ্রিষ্টাব্দে) তাহমাস্প মৃত্যুবরণ করেন। তারপর তার পুত্র ইসমাইল সিংহাসনে আরোহণ করেন।

তাহমাস্প ছিলেন ভীষণ কঠিন হৃদয়ের অধিকারী। কাউকে তিনি বিশ্বাস করতেন না; এমনকি নিজের সন্তানদেরও নয়। বিদ্রোহের আশঙ্কায় নিজ পুত্র ইসমাইলকে ২৫ বছর কারাবন্দি করে রাখেন। তার মৃত্যুর পর ইসমাইল মুক্তি পান। তখন ভাইদের মাঝে রাজত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। দুই ভাই মুহাম্মাদ ও আব্বাসকে পরাজিত করে ইসমাইল সিংহাসন দখল করেন। কিন্তু বসতে না বসতেই তাকে হত্যা করা হয়। ক্ষমতা চলে আসে অপর ভাই মুহাম্মাদ (খরাবান্ধ)-এর হাতে। তার দশ বছরের শাসন শেষে ৯৯৫ হিজরিতে (১৫৮৭ খ্রিষ্টাব্দে) সিংহাসনে বসেন আব্বাস।

আব্বাস

সাফাভি সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়া অরাজকতার সুযোগে উসমানিরা তাবরিজ, আর্মেনিয়া, জর্জিয়া, দাগিস্তান ইত্যাদি অঞ্চল দখল করে নেয়। শাহ আব্বাস ছিলেন খুবই চতুর শাসক। পূর্ব-পশ্চিমে একসাথে লড়াই চালিয়ে সাফাভিদের শক্তিক্ষয় হচ্ছিল বেশি। তাই শাহ আব্বাস ইস্পাহানে রাজধানী স্থানান্তর করে উসমানিদের সাথে সন্ধিপূর্বক আজারবাইজানসহ তাদের করায়ত্ত অঞ্চলের স্বীকৃতি দেন। এভাবে পশ্চিম দিক থেকে দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন পূর্বদিকে উজবেকদের ওপর এবং তাদের পরাজিত করে বিস্তৃত অঞ্চলে তার সাম্রাজ্য বিস্তার করেন।

উজবেকদের ঠান্ডা করে চুক্তির ঠিক পনেরো বছর পর উসমানিদের দিকে নজর দেন শাহ আব্বাস। সাফাভি সাম্রাজ্যের পুরোনো সীমানার যেসব অঞ্চল উসমানিদের দখলে চলে গেছে সেসব ফিরিয়ে নেওয়ার পালা এখন। আব্বাসকে সাহায্য করল ইংরেজরা। তারা যুদ্ধের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সরঞ্জাম সরবরাহ করল। সে সময় আনাতোলিয়ায় উসমানিদের মাঝে গৃহবিবাদ চলছিল। সব দিক থেকে উপযুক্ত সময়ে উসমানি সাম্রাজ্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন আব্বাস। তার থেকে নিকটবর্তী অঞ্চলগুলোর ওপর আক্রমণ চালাতে শুরু করেন। দখল করে নেন তাবরিজ, আর্মেনিয়া, আজারবাইজানের বিশাল অংশ ও কার্স। এরপর তিনি বাগদাদ অভিমুখী হন। কিন্তু বাগদাদে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হন। তখন তিনি ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেন। তৎকালীন বাগদাদের আমির জাতীয় স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধার প্রতিই লক্ষ রাখত বেশি। এই

সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে বাগদাদ কবজা করে নেন শাহ আব্বাস।

আব্বাসের সময় পর্তুগিজদের ক্ষমতার অন্তকাল চলছিল। ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ইংরেজরাও পর্তুগিজদের সহ্য করতে পারত না। এই সুবাদে আব্বাস ও ইংরেজ একাট্টা হয়ে ১০৩১ হিজরিতে (১৬২২ খ্রিষ্টাব্দে) হরমুজ প্রণালি থেকে পর্তুগিজদের বিতাড়িত করে। এর মাধ্যমে পর্তুগিজমুক্ত হয়ে যায় আরব উপসাগরীয় অঞ্চল।

শাহ আব্বাস শিয়া মতবাদে ভীষণ আকৃষ্ট ছিলেন। সুন্নি মুসলিমদের প্রতি ছিলেন প্রচণ্ড বিদ্বেষী। উসমানিদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য ইউরোপীয়দের সাথে মিত্রতা করার আকাঙ্ক্ষা ছিল তার সবসময়। আব্বাস ছিলেন অত্যন্ত রূঢ়। তার বড় ছেলেকে তিনি হত্যা করেন এবং তারই নির্দেশে চোখ উপড়ে ফেলা হয় আরও দুই ছেলের। আব্বাস মারা যান ১০৩৭ হিজরিতে (১৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে)। তার পরে ক্ষমতায় আরোহণ করেন তার নাতি সফিউদ্দিন।

সফিউদ্দিন

সাফাভি সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সময় ক্রমান্বয়ে শুরু হচ্ছিল। উসমানিদের সাথে যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে সাফাভিরা। ইরাক ও বাগদাদ উসমানিদের করায়ত্ত হয়। ১০৪৯ হিজরিতে (১৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দে) দুই সাম্রাজ্যের সীমানা নির্ধারণমূলক সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়।

দ্বিতীয় আব্বাস

১০৫২ হিজরিতে (১৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে) ক্ষমতায় আরোহণ করেন। রাজত্বের বিষয়ে তার চরম উদাসীনতা ছিল।

প্রথম সুলাইমান (দ্বিতীয় সফিউদ্দিন)

১০৭৭ হিজরিতে (১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে) সিংহাসন লাভ করেন। তার সময়ে ওলন্দাজ বাহিনী পারস্য উপসাগরের কেশম দ্বীপটি দখল করে নেয়। এদিকে উজবেকরা দখল করে খোরাসান। ওমানের ইয়ারুবিরা আক্রমণ চালায় 'বন্দর আব্বাস' অঞ্চলের পোতাশ্রয়ে।

প্রথম হুসাইন

দ্বিতীয় আব্বাসের পুত্র শাহ হুসাইন। তার শাসনকালে আফগানিদের বিদ্রোহের সূচনা হয়। মির মাহমুদ বিন উয়াইস হেরাত থেকে সাফাভি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করেন। ১১৩৫ হিজরিতে (১৬২৬ খ্রিষ্টাব্দে) ইরানের গুরুত্বপূর্ণ শহর মাশহাদ করায়ত্ত করেন। তারপর একে একে সাফাভিদের সব শহর জয় করতে করতে রাজধানী ইস্পাহানে পৌঁছে যান। উত্তরের কিছু অঞ্চল ছাড়া পুরো সাম্রাজ্য সাফাভিদের হাতছাড়া হয়ে যায়। এ সময় রাশিয়ান জার সম্রাট শাহ হুসাইনের সাথে বন্ধুত্বের ভাব দেখায়। প্রতিশ্রুতি দেয় আফগানিদের বিরুদ্ধে সামরিক সহযোগিতার। মূলত সাফাভিদের দুর্বলতার সুযোগে তাদের অঞ্চল দখল করে নেওয়াই ছিল রুশদের উদ্দেশ্য। সরল শাসক হুসাইনের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব হলো না। তিনি রাশিয়ার সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন।

দ্বিতীয় তাহমাস্প

রুশ বাহিনী সাফাভি সাম্রাজ্যে অনুপ্রবেশ করল এবং দাগিস্তান প্রদেশ দখল করে নিলো। এরপর হাত বাড়াল শামাকা অঞ্চলে দিকে। এ সময় উসমানিরা তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তারা রুশদের সতর্ক করে বলে, সাফাভি সাম্রাজ্যে আর এক কদম সামনে বাড়লে উসমানিদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। হুমকির মুখে থেমে গেল রুশ অগ্রযাত্রা।

এদিকে তাহমাস্প রুশদের সাথে সন্ধিচুক্তি করলেন। যার ভিত্তিতে রুশ দখলকৃত উত্তরাঞ্চলীয় অনেক এলাকার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। কিন্তু এসব অঞ্চলের অধিবাসীরা ক্রুসেডার রুশদের কবল থেকে উদ্ধার পেতে উসমানিদের সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন উসমানি ও রুশদের মাঝে এক চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী অঞ্চল এবং গিলান ও মাযানদারান রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। আর পশ্চিমাঞ্চলের কর্তৃত্ব থাকে উসমানিদের হাতে। এরপর উসমানিরা পারস্যে তাদের বিজয়াভিযান অব্যাহত রাখে। তারা দখল করে নেয় তাবরিজ এবং হামাদান। ঠিক সে সময় মির মাহমুদ সাফাভি পরিবারের অবশিষ্ট সদস্যদের হত্যা করছিল। একসময় মির মাহমুদ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। তার স্থলে ১১৩৭ হিজরিতে (১৭২৫ খ্রিষ্টাব্দে) আফগানিদের শাসক নির্বাচন করা হয় আমির

আশরাফকে। আশরাফ ও উসমানিদের মাঝে লড়াই বাধে। এরপর উভয় পক্ষ এ সন্ধিচুক্তিতে উপনীত হয় যে, আফগানি শাসক আশরাফ উসমানি সুলতানকে মুসলিম সাম্রাজ্যের খলিফা হিসেবে মেনে নেবে এবং পারস্যে তাদের অধিকৃত অঞ্চলের স্বীকৃতি দেবে। আর উসমানিরা আমির আশরাফকে পারস্যের শাহ হিসেবে মেনে নেবে।

এ সময় আত্মপ্রকাশ করে নাদির খান নামের এক ডাকাত। তাহমাস্পের সহযোগিতায় তার সহচরদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হেরাত ও মাশহাদ থেকে আফগানিরা তার হাতে বিতাড়িত হয়। এরপর তার বাহিনী পৌঁছে যায় রাজধানী ইস্পাহানে। নাদির খানের সাথে লড়াইয়ে আফগান নেতা আশরাফ নিহত হন। ৭ বছর পারস্য শাসন করার পর ১১৪২ হিজরিতে (১৭৩০ খ্রিষ্টাব্দে) নাদির খানের হাতে তার পতন ঘটে।

রাজত্বের নেশা পেয়ে বসল নাদির খানকে। আরও সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করে সে তার বিজয়াভিযান অব্যাহত রাখে। একপর্যায়ে উসমানিদের মুখোমুখি হয়ে তাদের পরাজিত করে হামাদান ও আজারবাইজান অধিকৃত করে নেয়। সুযোগ দেখে তাহমাস্প নিজের অস্তিত্ব জানান দিতে চাইলেন। সংঘর্ষ বাধিয়ে দিলেন উসমানিদের সাথে। কিন্তু ১১৪৪ হিজরির (১৭৩২ খ্রিষ্টাব্দে) এক যুদ্ধে তাকে পরাজিত হতে হলো। সন্ধিচুক্তি করে উসমানিদের হাতে সাম্রাজ্যের বেশকিছু অঞ্চল ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন।

আফশারি শাসন

নাদির খান

নাদির খান আফশারি শাসক গোষ্ঠীর প্রথম শাসক। তাহমাস্পের সহযোগী থেকে অচিরেই সে হয়ে ওঠেন ইরানের সম্রাট। প্রথমে তাহমাস্পের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তাকে আটক করেন। তবে নিজে সিংহাসনে না বসে তাহমাস্পের ছোট এক পুত্র আব্বাসকে বসান। আর উসমানিদের সাথে লড়াইয়ের কারণ দেখিয়ে নিজে হন তার অভিভাবক। এভাবে সাম্রাজ্যের ওপর তার প্রাথমিক কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। উসমানিদের সাথে লড়াইয়ে নাদির খান জয়ী হন। বাধ্য হয় উসমানিরা সন্ধি করতে। সন্ধি অনুযায়ী ইরাক ব্যতীত ইতিপূর্বে পারস্যে অধিকৃত অঞ্চলসমূহ হস্তান্তর করে উসমানিরা। এদিকে রুশদের থেকে মাযানদারান, গিলান, দাগিস্তান ও আজারবাইজান অধিকার করে নেন নাদির খান। নিয়ামক হিসেবে কাজ করে রুশদের প্রতি নাদির খানের হুমকি। অর্থাৎ এসব অঞ্চল ফিরিয়ে না দিলে রুশদের বিরুদ্ধে লড়তে উসমানিদের সাথে মিত্রতা করবে বলে হুমকি দেন নাদির খান। এতে বেশ কাজও হয়।

১১৪৮ হিজরিতে (১৭৩৬ খ্রিষ্টাব্দে) ইরানের কাগুজে শাসক তৃতীয় আব্বাস মৃত্যুবরণ করে। তার মৃত্যুর পর নাদির খান নিজেকে সাম্রাজ্যের অধিপতি ঘোষণা করেন। তারপর মনোযোগ দেন সাম্রাজ্য বিস্তারে। একে একে দখল করে নেন আফগানিস্তানের সমস্ত প্রদেশ। ১১৫০ হিজরিতে (১৭৩৮ খ্রিষ্টাব্দে) ওমান আক্রমণ করেন। তারপর আগমন করেন হিন্দুস্তানে। ১১৫১ হিজরিতে (১৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দে) দিল্লি দখল করে নেন। কিন্তু দিল্লিতে শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা থেকে বিরত থাকেন। এরপর উজবেকদের অঞ্চলে প্রবেশ করে বুখারা ও খোয়ারিজম দখল করে নেন। এই বিজয় মিছিল সত্ত্বেও নাদির খানের সাম্রাজ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল দেখা দেয়। জায়গায় জায়গায় বিদ্রোহ ও নানা আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। দাগিস্তানের লাজকি গোত্রের বিদ্রোহ এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বিদ্রোহ দমন করতে বের হয়ে সেখানে পরাজিত হন নাদির খান। পরাজয়ের ফলে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হন। সর্বত্র বিদ্রোহ ও যুদ্ধ ভয়াবহ আকার ধারণ করে। উসমানিরাসহ অন্যান্য বহু গোত্রের সাথে তার যুদ্ধ লেগেই থাকে।

নাদির খান তার রাজ্যে সুন্নি চিন্তাধারা পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। চেয়েছিলেন ইমাম জাফর সাদেকের মাজহাবকে মুসলিম সমাজে পঞ্চম মাজহাব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু উসমানিরা এর সাথে একমত ছিল না। কিন্তু ইরানবাসীকে এর ওপর বাধ্য করা হয়। নাদির খান একটি ইরানি নৌবাহিনী গঠনের চেষ্টা করেন, তবে তাতে ব্যর্থ হন। ১১৬০ হিজরিতে (১৭৪৭ খ্রিষ্টাব্দে) কুর্দিদের অঞ্চলে বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে ইনতেকাল করেন ডাকাত সর্দার থেকে পারস্যের অধিপতি হওয়া নাদির খান।

আলি বিন ইবরাহিম

নাদির খানের সেনাপতিদের মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয়। এক সুদক্ষ সেনাপতি আহমাদ খান দুররানি সবার থেকে পৃথক হয়ে আফগানিস্তানের কান্দাহার অঞ্চলে নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর দ্রুত রাজ্যের সীমা বিস্তৃত করেন। অন্যদিকে নাদির খানের ভাতিজা আলি কুলি খান পারস্যের সিংহাসনে বসেন। আলি কুলি খান পরিচিতি পান আদিল শাহ নামে। আদিল শাহ ক্ষমতায় বসেই সিংহাসন কণ্টকমুক্ত রাখতে নাদির খানের বংশের বাকি সদস্যদের হত্যা করে ফেলেন। জীবিত রাখেন শুধু তার নাতি শাহরুখকে। এদিকে একসময় আলি ও তার ভাই ইবরাহিমের মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এর জের ধরে ইবরাহিমকে হত্যা করেন আলি কুলি। তারপর তিনি নিজেও নিহত হন। সিংহাসনে বসেন শাহরুখ।

শাহরুখ

খুব অল্প বয়সে সাম্রাজ্যের ভার ন্যস্ত হয় শাহরুখের দুর্বল কাঁধে। তার দুর্বলতার সুযোগে মির্জা সাইয়িদ মুহাম্মাদ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। শাহরুখ শিয়াবাদের বিরুদ্ধে তার দাদা নাদির খানের শুরু করে যাওয়া মিশন পুনর্জীবিত করছে রব তুলে তার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগে এবং ক্ষমতা দখল করে নেয়। শাহরুখকে বন্দি করা হয় কারাগারে। কিন্তু শাহরুখের এক সেনাপতি ইউসুফ আলি ফের হামলা চালিয়ে মির্জা ও তার সন্তানদের হত্যা করতে সক্ষম হন। তারপর শাহরুখকে মুক্ত করে পুনরায় তাকে সিংহাসনে বসান ইউসুফ আলি। আর নিজেকে সম্রাটের অভিভাবক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। কারণ, সম্রাট তখনও নিতান্ত বালক।

কিছুদিন পর ইরান সাম্রাজ্যে একটি নৌবাহিনী ও একটি স্থলবাহিনী প্রবেশ করে। সামুদ্রিক বাহিনীর সেনারা ছিল আরবের। তাদের সেনাপতির নাম বলা হয় আলম খান। আর স্থলবাহিনী ছিল কুর্দিদের। তাদের সেনাপতির নাম জাফর খান। তারা একসাথে হামলা চালিয়ে ইউসুফকে গ্রেফতার করে হত্যা করে আর শাহরুখকে পুনরায় কারাগারে নিক্ষেপ করে। এরপর ক্ষমতার কোন্দল লেগে যায় এই দুই সেনাপতির মাঝেই। পারস্পরিক লড়াইয়ে জয়ী হন আলম খান। তবে আফগান শাসক আহমাদ দুররানির সাথে এক যুদ্ধে আলম খানও নিহত হয়। আহমাদ দুররানি খোরাসানকে পারস্য থেকে মুক্ত করে নিজের রাজ্যের অংশ করে নেন। এদিকে শাহরুখকে কারাগারেই রাখা হয়। ১২১০ হিজরিতে (১৭৯৬ খ্রিষ্টাব্দে) তার মৃত্যু হয়। আর এতেই ইতি ঘটে নাদির খান প্রতিষ্ঠিত আফশারি বংশীয় শাসনের।

জানদি শাসন

কারিম খান

কারিম খান জানদি ছিলেন নাদির খানের বাহিনীর এক কুর্দি সেনাপতি। তিনি বখতিয়ার গোত্রের নেতার সাথে মৈত্রী স্থাপন করেন। একপর্যায়ে উভয়ের মাঝে মতভেদ হয়। ফলে কারিম খান বখতিয়ার গোত্রীয় নেতাকে হত্যা করে ফেলেন। এর মাধ্যমে দক্ষিণ ইরানের কিছু অঞ্চল তার হস্তগত হয়। এরপর তিনি একে একে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোয় হামলা চালাতে থাকেন। হামলা করেন কাজার ও আফগানে। এদের সাথে লড়াইয়ে জয়ী হন কারিম খান। এভাবে দেখতে দেখতে তার শাসন স্থিতিশীল পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

জাকি খান

কারিম খানের বৈপিত্রেয় ভাই জাকি খান। কারিম খানের মৃত্যুর পর তিনি ক্ষমতায় আরোহণ করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ান কারিম খানের পুত্র আবুল ফাতাহ। জাকি খান কৌশলের আশ্রয় নিয়ে দাবি করেন যে, তিনি হচ্ছেন কেবল কারিম খানের অনুগত সেনাপতি। এরপর ধীরে ধীরে যখন তার ক্ষমতা পোক্ত হয়ে ওঠে, তখন প্রতিপক্ষকে কঠোর উপায়ে দমনের নীতি গ্রহণ করেন জাকি খান। দেখে দেখে সব বিরোধীকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়। কিন্তু জাকি খানের সৈনিকের একাংশ কারিম খানের অপর ভাই সাদেক খানের দলে ভিড়ে। এমতাবস্থায় সাদেক খানের সহযোগিতায় হাত বাড়ানো প্রতিটি লোকের ওপর জাকি খান কঠিন হুঁশিয়ারবাণী উচ্চারণ করেন। এতে লোকেরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

জাকি খান তার সেনাপতি মুরাদ খানের নেতৃত্বে কাজারদের বিরুদ্ধে একটি সেনাদল পাঠান। কাজার সেনাপতি ছিলেন আগা মুহাম্মাদ। কিন্তু মুরাদ খান বিশ্বাসঘাতকতা করেন জাকি খানের সাথে। ১১৯৫ হিজরিতে (১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি জাকি খানকে অতর্কিত আক্রমণ করে হত্যা করে ফেলেন।

জানদি সাম্রাজ্যের পতন

জাকি খানের মৃত্যুতে কারিম খানের পুত্র আবুল ফাতাহের ক্ষমতায় বসার সুযোগ উন্মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু বাধ সাধলেন তার চাচা সাদেক খান। সাদেক খান আবুল ফাতাহকে সরিয়ে নিজে ক্ষমতায় বসেন। কিন্তু লাভ হলো না, তার ক্ষমতার বাগডোর টেনে ধরলেন সেনাপতি আলি মুরাদ খান। সাদেক খানসহ জানদি পরিবারের সবাইকে হত্যা করলেন মুরাদ খান। শুধু জাফর খান নামে একজন জীবিত ছিল। মুরাদ খান ও কাজারদের মাঝে লড়াই শুরু হলে সুযোগের অপেক্ষায় থাকা জাফর খান বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে পথের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করলেন মুরাদ খান।

এরপর যুদ্ধ চলল জাফর খান আর কাজার নেতা আগা মুহাম্মাদের মাঝে। যুদ্ধ চলাকালে জাফর খানকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়। তার পুত্র লুতফ খান ক্ষণিকের জন্য সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। কিন্তু কাজারদের সাথে তার পরাজয় ঘটে। আত্মসমর্পণ করেন লুতফ খান। তাকে হত্যা করা হয়। কাজাররা জানদিদের অবশিষ্ট প্রত্যেককেই হত্যা করে। ১২০৯ হিজরিতে (১৭৯৪ খ্রিষ্টাব্দে) জানদিদের কোনো চিহ্নও আর বাকি থাকল না।

কাজার শাসন

আগা মুহাম্মাদ কাজার

১২০৯ হিজরিতে (১৭৯৪ খ্রিষ্টাব্দে) জানদিদের পুরোপুরি ধ্বংস করতে সক্ষম হন আগা মুহাম্মাদ। তারপর অধিকার করেন জর্জিয়া ও আর্মেনিয়া। সে সময় রুশ বাহিনী দাগিস্তান দখল করে নিয়েছিল। আজারবাইজানেও প্রবেশ করতে শুরু করে তারা। কিন্তু সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথরিনের মৃত্যুতে পিছিয়ে যায় রুশ বাহিনী। ক্ষমতায় আসে শান্তিপ্রিয় এক জার। আগা মুহাম্মাদ নিজের সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে তেহরানকে নির্বাচন করেন। ১২১১ হিজরিতে (১৭৯৬ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি নিহত হন।

ফাতাহ আলি শাহ

ফাতাহ আলি শাহ সবসময় ক্রুসেডারদের সাথে মিত্রতা করতে উন্মুখ ছিলেন। কিন্তু বারবার ইউরোপীয়রা তাকে ফিরিয়ে দেয়। তার চেষ্টায় ইংরেজরা মিত্রতার জন্য প্রায় তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তার সাথে মিত্রতা করলে রুশ-ফরাসি সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে আশঙ্কা করে তারা পিছিয়ে যায়। তারপর ফাতাহ আলি শাহ ফরাসিদের সাথে মিত্রতায় মনোযোগী হন। ফরাসিরা শাহের সাথে সন্ধি করে। চুক্তি অনুযায়ী আরব উপসাগরের খারগ দ্বীপ ফরাসিদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এর দুই মাস পর ফরাসিরা রুশদের সাথে চুক্তি করে। সেখানে ফরাসিদের পক্ষ থেকে রুশ বাহিনীকে পারস্য ও উসমানি শাসিত এলাকায় অনুপ্রবেশের সম্মতি দেওয়া হয়। এরপর রুশ বাহিনী পারস্য আক্রমণ করে আর্মেনিয়া দখল করে নেয়। পারস্যের শাহ রাশিয়াকে দাগিস্তান, জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, আজারবাইজানের অর্ধেকাংশসহ আরও কিছু অঞ্চল লিখে দিয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। কিন্তু রুশ লালসা এটুকুতে তৃপ্ত হলো না। ১২৪৩ হিজরিতে (১৮২৭ খ্রিষ্টাব্দে) রাশিয়া তাবরিজ দখল করে নেয়। শাহকে বাধ্য করে 'তুর্কমানচাঈ' চুক্তিপত্রে সই করতে।

ইতিপূর্বে ১২৩৫ হিজরিতে (১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে) ফাতাহ আলি শাহ উসমানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ইরাক পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন এবং কিছু কিছু অঞ্চল পুনরুদ্ধারে সক্ষমও হন। উসমানিদের সাথে 'আরদে রুম' চুক্তির মাধ্যমে ১২৩৮ হিজরিতে (১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দে) যুদ্ধবিরতি হয়।

মুহাম্মাদ শাহ আব্বাস

ফাতাহ আলি শাহের নাতি মুহাম্মাদ শাহ আব্বাস। ১২৫০ হিজরিতে (১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দে) সাম্রাজ্যের ভার গ্রহণ করেন। তার সময়ে একের পর এক বিদ্রোহ দানা বাঁধতে থাকে। কঠিন হাতে সেসব দমন করেন মুহাম্মাদ শাহ আব্বাস। তার সময়েই বাবিয়া ফিতনার সূচনা হয়। পরবর্তীকালে বাবিয়া থেকে উৎপত্তি হয় বাহাইয়া ফিতনার। এসব ফিতনার পেছনে ছিল রুশ সহযোগিতা। মুসলিমদের বিপাকে ফেলে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার হীন লক্ষ্যে রুশরা এসব ফিতনার পেছনে ইন্ধন জোগায়। ভ্রান্ত বাতিনি ফিরকা ইসমাইলিদের নেতা এ সময় হিন্দুস্তানে পালিয়ে যায়। অবশিষ্ট ইসমাইলিদের সাথে লড়াই অব্যাহত রাখেন মুহাম্মাদ শাহ আব্বাস। ইরানের ইসমাইলি বাতিনি নেতাকে তখন পৃষ্ঠপোষকতা করে ইংরেজরা।

শাহ আব্বাস আফগানিস্তানের সিস্তান অঞ্চলে প্রবেশ করে। এদিকে খারগ দ্বীপ দখল করে নেয় ইংরেজরা।

নাসিরুদ্দিন শাহ

১২৬৪ হিজরিতে (১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে) ক্ষমতায় আসেন নাসিরুদ্দিন শাহ। সে বছরই বাবিয়া বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। বিদ্রোহী নেতাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। হাসান বিন আলি মাযানদারানিকে এবং ইংরেজ পৃষ্ঠপোষকতায় পালিত ভ্রান্ত বাহাইয়া মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা বাহাউল্লাহকে নির্বাসিত করা হয়। আফগান শাসক ওশ মুহাম্মাদকে মোকাবিলা করতে ইংরেজদের সাথে হাত মেলান নাসিরুদ্দিন। কিন্তু ১২৭৪ হিজরিতে (১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে) ইংরেজ ও আফগানদের মাঝে প্যারিস চুক্তি সম্পাদিত হলে পশ্চিম আফগানিস্তানের ভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হন তিনি। এ সময় ইংরেজরা বুশেহর বন্দর ও মুহাম্মারা বন্দর দখল করে নেয়। উত্তর দিকে রুশ অভিযান বাড়তে থাকে। এদিকে দক্ষিণ দিকে বৃদ্ধি পায় ইংরেজ তৎপরতা।

শাহের বিরুদ্ধে একটি শান্তিপূর্ণ আন্দোলন সংঘটিত হয়। আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন এক শিয়া আলেম। ইংরেজদের ক্রমাগ্রসরতার ব্যাপারে সচেতনতা ও শাহের স্বেচ্ছাচার প্রতিরোধই ছিল আন্দোলনের লক্ষ্য।

নাসিরুদ্দিন শাহ আন্দোলনকারীদের মন জয় করতে ইংরেজ বণিকদের সাথে আসন্ন এক তামাক চুক্তি বর্জন করেন।

মুজাফফর উদ্দিন শাহ

১৩১৩ হিজরিতে (১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে) ক্ষমতা লাভ করেন। তিনি আইনপ্রণয়নমূলক একটি বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাকে একাধিক বিদ্রোহ ও আন্দোলনের মোকাবিলা করতে হয়। মৃত্যুবরণ করেন ১৩২৪ হিজরিতে (১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে)।

মুহাম্মাদ আলি শাহ

তার শাসনকালে রাশিয়া ও ইংরেজরা মিলে ইরানে কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। মুহাম্মাদ আলি শাহ দেশে সেনাশাসন জারি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রুশরা তাতে বাধা দেয়। তারা পার্লামেন্ট ভবনে আক্রমণ চালায়। এদিকে দেশজুড়ে সরকারের স্বেচ্ছাচার ও রাশিয়ান কতৃত্ব বিরোধী আন্দোলন চাঙা হয়। মুহাম্মাদ আলি শাহ সাংবিধানিক শাসন প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হন। কিন্তু তাতেও আন্দোলন স্তিমিত হলো না। অগত্যা তিনি দেশ ত্যাগ করে রাশিয়া চলে যেতে বাধ্য হন। তার পুত্র নিতান্ত বালক আহমাদ শাহকে ক্ষমতায় বসিয়ে তিনি নির্বাসনে যান। তার অভিভাবক নির্ধারণ করা হয় আদদুল মালিককে (عَضُدُ الْمَلِكْ)। তার মৃত্যুর পর অভিভাবক নির্বাচিত হন আবুল কাসেম খান নাসিরুল মুলক।

আহমাদ শাহ

আহমাদ শাহ ক্ষমতালাভ করেন অভিভাবকত্বের নির্বিঘ্ন ছায়ায়। তাই তিনি বিলাসী ও খেয়ালি জীবনযাত্রায় গা ভাসানোর সুযোগ পেয়ে যান। কিন্তু তার যখন রাষ্ট্রের দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার মতো বয়স হলো তখনও তার খামখেয়ালি ভাব দূর হলো না। এই সুযোগে রুশ ও ইংরেজরা কতৃত্ব প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে একাট্টা হয়ে ইরানকে তিন ভাগ করে ফেলে। প্রথম ভাগ উত্তর অংশ, এখানে চলবে রাশিয়ান কর্তৃত্ব। দ্বিতীয় ভাগ দক্ষিণ অংশ, এখানে প্রতিষ্ঠিত হবে ইংরেজ কর্তৃত্ব। তৃতীয় ভাগ মধ্যাঞ্চল, এটি থাকবে নিরপেক্ষ। এখানে চলবে তেহরানের শাসন। এই ভাগ বাটোয়ারায় উভয় পক্ষ সন্তুষ্ট হয়। চুক্তি হলো কেউ কারও সাথে রাজনৈতিক বা বাণিজ্যিক উপায়ে টক্কর দেওয়ার চেষ্টা করবে না।

এরপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ইরান ছিল একদিকে ইংরেজ-রুশ বাহিনীর চারণক্ষেত্র। আরেকদিকে ইরানে আনাগোনা করছিল উসমানি-জার্মান বাহিনীও। যুদ্ধের পর রুশবাহিনী ইরান থেকে তাদের কর্তৃত্ব গুটিয়ে নেয়। কারণ সে সময় তারা কম্যুনিজম বিপ্লবের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। ইরান যেন কমিউনিস্ট বিরোধীদের সহায়তা না করে সেজন্যও ইরানকে সন্তুষ্ট রাখা তাদের জরুরি ছিল। এই অবস্থায় ইংরেজরা হয়ে উঠল ইরানের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। ১৩৩৭ হিজরিতে (১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে) ব্রিটেন-ইরান এর মাঝে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। তাতে ইরানের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেওয়া হয়। কিন্তু ক্ষমতার বাগডোর রয়ে যায় ব্রিটেনের হাতেই। ইরানের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী এই সন্ধিচুক্তি বর্জন করে। আজারবাইজান, গিলান, খোরাসান, মাযানদারান প্রভৃতি অঞ্চলে আন্দোলন, বিদ্রোহ শুরু হয়। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রসহ বৃহৎ কয়েকটি দেশও এই চুক্তি মেনে না নেওয়ার ঘোষণা জানায়।

হুত বিপ্লব

সেনা অফিসার রেজা পাহলভি ও জিয়াউদ্দিন তাবাতাবায়ির নেতৃত্বে এই বিপ্লব সংঘটিত হয়। এটি ছিল ইংরেজ ও শাহের মধ্যকার সন্ধি বাতিল করানো এবং ইরানের নেতৃত্ব বদলের উদ্দেশ্যে এক রক্তপাতহীন বিপ্লব। ইংরেজরাও চাইছিল নিজেদের মনমতো কারও হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে। রেজা পাহলভির মধ্যেই যেন তারা সেই স্বস্তির দেখা পায়। তারা যেমন চাইত, তিনি তেমনই ছিলেন। তিনি ছিলেন কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার পাগল। ইংরেজরা তাই গোপনে পাহলভিকে সাহায্য করতে লাগল।

আন্দোলনের মুখে শাহ আহমাদ শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে বাধ্য হন। তিনি জিয়াউদ্দিন তাবাতাবায়িকে নতুন সরকার গঠনের দায়িত্ব প্রদান করেন। ক্ষমতা লাভের পর তাবাতাবায়ি ইংরেজদের সাথে কৃত চুক্তি সমাপ্ত করতে চাইলেন। অন্যথায় নতুন শাসন সফল না হওয়ার সর্তকতা জানালেন ইংরেজদের। জেনে-বুঝেই ইংল্যান্ড তাতে সম্মত হয়ে যায়। কারণ, তারা ততদিনে গোপনে ক্ষমতা বিস্তারের পথে হাঁটতে শুরু করেছে।

তাদের ঘুঁটির চাল রেজা পাহলবি ছিলেন ভীষণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও ক্ষমতার সমঝদারও বটে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে সিংহাসনটাই মূল নয়; তাই তাবাতাবায়ির উত্থান তাকে বিচলিত করেনি। নীরবতার সাথে রেজা

পাহলভি বাগিয়ে নেন সেনাবাহিনীর কাজাখ বিগ্রেডের দায়িত্ব। এরা ছিল ইরানি সেনাবাহিনীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এখানেই ছিল ক্ষমতার চাবিকাঠি। এখানে ঠিকভাবে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হলে ক্ষমতার মসনদ উল্টে দেওয়া সময়ের ব্যাপারমাত্র। আর ঠিক সেভাবেই এগুতে থাকলেন রেজা পাহলভি।

তিনি শাসনের ওপর নিজের কর্তৃত্ব প্রকাশ করতে শুরু করেন। দেশের পুলিশ বাহিনীকে তিনি কৌশলে সামরিক দপ্তরের অধীনে নিয়ে এলেন এবং এই দপ্তরের প্রধান দায়িত্বশীল হলেন তিনি নিজে, পাশাপাশি সেনাবাহিনীর গরিষ্ঠ সংখ্যাটির প্রধানের দায়িত্ব তো আছেই। এরপর মনের গোপন অভিলাষ পূর্ণ করতে দেশীয় বিভিন্ন ব্লক ও সংগঠনের সাথে যোগাযোগ শুরু করেন। এদিকে নানা উপায়ে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতে থাকেন, যেন নিজ থেকেই জনতা কোনো আন্দোলনের ডাক দেয়। তিনি শাহ আহমাদকে চাপ দিতে থাকেন এক সময়ের সহযোদ্ধা জিয়াউদ্দিনকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে। এদিকে ইংরেজরাও শাহকে আহ্বান জানায় ক্ষমতায় যেন রেজা পাহলভিকে সমর্পণ করা হয়। শাহ আহমাদ সব বুঝতে পেরে এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর একাধিক ব্যক্তি রাষ্ট্রশাসনের দায়িত্ব পালন করতে আসেন। কিন্তু সবাইকেই রেজা পাহলভির ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে ব্যর্থতা বরণ করতে হয়। ব্যর্থদের আর আগলে রাখা সম্ভব হলো না আহমাদ শাহের পক্ষে। বাধ্য হয়ে তিনি ক্ষমতায় নিয়ে আসেন রেজা পাহলভিকে। রেজার মনের আশা পূরণ হলো। নিজের অবস্থান পাকা করে তিনি এক অনুগত পার্লামেন্ট তৈরি করেন। সেই পার্লামেন্ট তাকে রাষ্ট্রের অভিভাবক নির্বাচন করে। এভাবে ১৩৪৪ হিজরিতে (১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে) ইরান থেকে কাজার শাসন বিলুপ্ত হয়ে সূচনা হলো পাহলভি শাসনের।

পাহলভি শাসন

রেজা পাহলভি

নিজেকে পারস্যের শাহ ঘোষণা করলেন রেজা পাহলভি। ক্ষমতার সমস্ত ডালপালা তার উঠানে জড়ো হয়েছে। সারা দেশে তার প্রতিপক্ষ আর কেউ নেই। তুর্কি, আরব, কুর্দি প্রভৃতি জাতির অঞ্চল থেকে পার্থক্য নির্দেশের জন্য পারস্য নামটিকে ইরান দ্বারা পরিবর্তন করা হয়। তার চেতনা ছিল পশ্চিমা ধারায় আচ্ছন্ন। তার তিন স্ত্রী পর্দাহীনভাবে ঘর থেকে বের হতো। ইরানি পোশাক ত্যাগ করে ফরাসি পোশাক পরিধানের নির্দেশ ছিল সাধারণ মানুষের ওপর। পুলিশের ওপর নির্দেশ ছিল নারীরা যেন হিজাব পরে রাস্তায় বের না হয়। এসব উদ্যোগের পেছনে তার উদ্দেশ্য ছিল কেবলই পশ্চিমা প্রভুদের খুশি করা। কোনো শিয়া নেতাও সে সময় তার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে পারেনি। একমাত্র খোমেনির পিতা কিছুটা রুখে দাঁড়িয়েছিল। কুম শহরে তার আওয়াজ ওঠে। শাহ রেজা পাহলভি নিজে সেখানে গিয়ে বিদ্রোহীদের দমন করে আসেন। শাহ রেজা তার সকল প্রতিপক্ষকে নীরব করে দিয়েছিলেন। তিনি দেশে প্রতিষ্ঠা করেন ফরাসি সংবিধান।

১৩৫৬ হিজরিতে (১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে) ইরাকের সাথে ইরানের একটি চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী ইরাক শাতিল আরবের ৭৭৫০ মিটার জায়গা ইরানের হাতে তুলে দেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইরান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে শাহ রেজা পাহলভি নিরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইউরোপ ও জার্মানদের যুদ্ধ এমন ঘোরতর অবস্থা ধারণ করে যে কারও নিরপেক্ষ থাকার সুযোগ থাকল না। অগত্যা শাহ রেজা জার্মানির পক্ষ নিলেন। বিশেষত যুদ্ধের শুরু পর্যায়ে ইরান ছিল জার্মানির যুদ্ধে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহের একমাত্র উৎস। ইরানের জার্মানির প্রতি গৃহীত ভূমিকার কারণ সম্ভবত ছিল এই যে, সে সময় জার্মানির সাথে রাশিয়ারও মৈত্রী ছিল। কিন্তু কিছুদিন না যেতেই জার্মান-রুশ মিত্রতা ভেস্তে গেল। জার্মান বাহিনী রাশিয়ায় আক্রমণ করা শুরু করে। এই পরিস্থিতিতে ইরানের শাহ আবার তার নিরপেক্ষতা ঘোষণা করেন।

প্রকাশ্যে নিরপেক্ষতার কথা বললেও শাহ মূলত জার্মানের পক্ষেই কাজ করতে থাকেন। এ সময়ে ইরানে প্রচুর পরিমাণে জার্মান কর্মকর্তা ও গোয়েন্দাদের আনাগোনা ছিল। এতে বিশ্বযুদ্ধীয় মিত্রপক্ষ ইরানকে আহ্বান জানায় জার্মান কর্মকর্তাদের ইরান থেকে বহিষ্কার করতে। শাহের ধারণা ছিল এই যুদ্ধে জার্মানিরই জয় হবে। আর জার্মানি জিতে গেলে রাশিয়ার হাত থেকে ককেশাস অঞ্চল লাভ করবে ইরান। কিন্তু যুদ্ধে আচানক জার্মানদের পরাজয় হলো। ফলে শাহ রেজা জার্মান কর্মকর্তাদের ইরান থেকে বহিষ্কারে সম্মত হন। কিন্তু মিত্রপক্ষ জার্মান কর্মকর্তাদের তাদের হাতে তুলে দিতে শাহকে বাধ্য করে।

তারা ইরান আক্রমণের জন্য কোনো একটি ইস্যু খুঁজছিল। ১৩৬০ হিজরিতে (১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে) হঠাৎ করেই মিত্রবাহিনী ইরানে প্রবেশ করে। রুশ বাহিনী আজারবাইজানে এসে তাবরিজ পর্যন্ত দখল করে নেয়। ইংরেজরা ভারত ও ইরাক থেকে এসে কিরমানশাহ প্রদেশ দখল করে নেয়। একই সময় ইংরেজ নৌবাহিনী দখল করে নেয় ইরানের মুহাম্মারা নৌবন্দর। ফলত ইরান রুশ-ইংরেজদের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। সন্ধি অনুযায়ী ইরান অধিকৃত অঞ্চলে রুশ-ইংরেজদের উপস্থিতি মেনে নেবে আর জার্মান নেতৃত্বাধীন অক্ষশক্তির সকল কূটনীতিককে নিজ দেশ থেকে বহিষ্কার করবে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ইংরেজ-রুশ মিত্রশক্তি রেজা শাহকে পুত্র মুহাম্মাদ শাহের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য করে। তারপর তাকে নির্বাসিত করে মাদাগাস্কারের নিকটবর্তী ভারত মহাসাগরের ছোট একটি দ্বীপরাষ্ট্র মরিশাসে। অবশেষে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে স্থানান্তরিত হন। এখানেই তার মৃত্যু ঘটে।

মুহাম্মাদ রেজা পাহলভি

১৩৬০ হিজরিতে (১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে) ক্ষমতার মসনদে বসেন মুহাম্মাদ রেজা পাহলভি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন তুঙ্গে। মুহাম্মাদ রেজা ইংরেজ-রুশ মিত্রপক্ষের আনুগত্য বজায় রাখেন। এ ছাড়া তার ভিন্ন কোনো উপায়ও ছিল না। কারণ, দেশের অনেকাংশ তখন মিত্রবাহিনীর অধীনে। মুহাম্মাদ রেজা পাহলভি ছিলেন আয়েশপ্রিয় শাসক। তিনি গোয়েন্দা পুলিশ বিভাগ গড়ে তোলেন। শাসনের শেষদিকে তার সদস্য সংখ্যা ছিল ৫০ হাজার। রুশ-ইংরেজ বাহিনীর সাথে তার চুক্তি হয় যে, বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার ৬ মাস পর ইরানের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং মিত্রবাহিনী ইরান

ত্যাগ করবে। ১৩৬২ হিজরিতে (১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে) শাহ মিত্রবাহিনীকে খুশি করতে তাদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

এ সময় ইরানে প্রভাব বিস্তারের দিকে মনোযাগ দেয় আমেরিকা। মার্কিন গোয়েন্দারা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ইরানে অবস্থিত জার্মান গোপন ঘাঁটিগুলো নিশ্চিহ্ন করে দেয়। ১৩৬২ হিজরিতেই (১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে) ইরানের রাজধানী তেহরানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট স্টালিন ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল। সেই মিটিংয়ে ইরানের স্বাধীনতা ঘোষণার সিদ্ধান্ত হয়। এদিকে রুশ ও ব্রিটিশ সরকার ইরানকে অবদমিত রাখতে কূটনীতি বহাল রাখে। এ উদ্দেশ্যে তারা ইরানে কাজার বংশের শাসন ফিরিয়ে আনার হুমকি দেয়। এ অবস্থায় মুহাম্মাদ রেজা আমেরিকার সাহায্য প্রার্থনা করে। তখন আমেরিকা বিবৃতিতে জানায়, ইরানে নতুন কোনো বিশৃঙ্খলা বা ভাঙন সৃষ্টির প্রচেষ্টা মার্কিনরা সহ্য করবে না।

ইরান সব সময়ই বহুজাতিক দেশ। এখানে পারসিক ছাড়াও আরব, তুর্কি, কুর্দিসহ নানা জাতি বাস করে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় সর্বত্র পারসিকদের প্রভাব অত্যন্ত বেশি ছিল। অবহেলিত সংখ্যালঘুদের মধ্যে এ নিয়ে ছিল পুরোনো ক্ষোভ। এ সময় তাদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। সুযোগসন্ধানী ইংরেজ ও রুশ সরকার এসব বিদ্রোহে ইন্ধন জোগায়। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, যেভাবেই হোক এবং যার মাধ্যমেই হোক মুসলিম দেশগুলোতে বিশৃঙ্খলা-বিচ্ছিন্নতা জিইয়ে রাখা এবং জাতীয়তাবাদের বিষাক্ত চেতনা ছড়িয়ে দেওয়া।

এই বিদ্রোহের মধ্য থেকেই ১৩৬৫ হিজরিতে (১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে) স্বাধীনতা ঘোষণা করে আজারবাইজান ও কুর্দিস্তান। ইরান সরকার এই বিদ্রোহীদের মাঝে সম্পর্ক নষ্টের প্রচেষ্টা চালায়। এরপর ইরানি বাহিনী প্রবল শক্তিতে বিদ্রোহীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আজারবাইজান তৎক্ষণাৎ ইরানের কাছে আত্মসমর্পণ করে। কুর্দিরা প্রতিরোধ চালিয়ে যায়। কিন্তু ইরানি আক্রমণের মুখে ভেঙে যায় সে প্রতিরোধ। ১৫০০ কুর্দি হত্যা করে বিদ্রোহ দমন করে ইরানি সেনাবাহিনী। স্বাধীনতাকামী নেতাদের প্রদান করা হয় মৃত্যুদণ্ড।

ইরানজুড়ে ইংরেজ প্রভাব তখনও বেশ জোরালো। এজন্য বিদ্রোহে ইংরেজদের ইন্ধনের ব্যাপারে জেনেও শাহ মুহাম্মাদ তাদের প্রতি সৌজন্য বজায় রেখে চলতেন। এমনকি ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলেও এই সৌজন্যের হেরফের হতো না। এজন্য ফিলিস্তিন প্রশ্নে ইরানের অবস্থান ছিল বেশ হতাশাজনক। যখন ফিলিস্তিনের বুকে মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোঁড়া ইসরাইলের নামে দখলদারি ঘোষণা করা হয়, তখন সমগ্র মুসলিম উম্মাহ প্রতিবাদে জ্বলে উঠলেও নীরব ছিল ইরান ও তুরস্ক। তুরস্কেও তখন ইংরেজ প্রভাব বেশ ভালোভাবেই শেকড় গেড়ে বসেছিল।

বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে আমেরিকা ইরানের সামরিক বাহিনীকে উন্নত করার সিদ্ধান্ত নিলো। এতে তাদের যে সমস্ত লক্ষ্য অর্জিত হবে তা হলো, ইরানের প্রতিবেশী সোভিয়েত রাশিয়াকে হুমকির মধ্যে রাখা যাবে। ইরানের অধিকাংশ নাগরিক শিয়া হওয়ায় অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে তাদের দূরত্বের ফলে ইরানকে এই অঞ্চলে টাইমবোমের মতো ফিট করে রাখা যাবে। আমেরিকার অবৈধ সন্তান ইসরাইলের জন্য ইরান হুমকির কারণ হবে না। ইরানের প্রতিবেশী ইংরেজ প্রভাবিত ইরাকে প্রবেশের জন্য তাকে ব্যবহার করা যাবে। এজন্য দেখা গেছে, ইরাকের বিদ্রোহী কুর্দিদের ইরান সমর্থন করত। কিন্তু ১৩৯৫ হিজরিতে (১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে) তেল রফতানিকারী রাষ্ট্রগুলোর সংগঠন ওপেকের এক সম্মেলনে দুই দেশের প্রতিনিধি আলজেরিয়ার বৈঠকে বসে ঐকমত্য পোষণ করে যে, ইরান আর ইরাকের কুর্দি বিদ্রোহীদের সমর্থন দেবে না। বিনিময়ে ইরানকে শাতিল আরবের বিতর্কিত অঞ্চল বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

ইরানের ইসলামি বিপ্লব

দেশজুড়ে শাহ মুহাম্মাদ রেজার কুকর্মের সয়লাব হতে লাগল। নারী ও কামরিপু চরিতার্থে তার জীবন ছিল উৎসর্গ। জাজিরায়ে কিশ নামের একটি দ্বীপকে পুরোপুরি পাপাচারের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করা হলো। তার বোন আমিরা আশরাফের নোংরামিরও সয়লাব হতে লাগল। সমাজের মধ্যে ভয়ংকর রকমের বিশৃঙ্খলা ও ব্যাপকভাবে মুতআ বিয়ের বিস্তার ঘটল (যা শিয়াদের নিকট বৈধ)। সেই সাথে অপচয় ও বিলাসিতার বিস্তার তো ছিলই। দেশের সম্পদ থাকা সত্ত্বেও অর্থনীতি ছিল নিম্নমুখী। এদিকে শাহের গোয়েন্দা বাহিনী যেন সাক্ষাৎ যমদূত। নির্যাতন-নিপীড়নের দমকা

হাওয়া বইতে থাকে সর্বত্র। সরকার-বিরোধীদের দমনে তাদের অপারেশন ছিল ভয়াবহ।

এ সময় শিয়াদের ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনি আত্মপ্রকাশ করেন। তার হাতে সূচিত আন্দোলন দেশের আনাচেকানাচে ছড়িয়ে পড়ে। এক বছর অবিরত আন্দোলন চলে। সময়টা ছিল ১৩৯৯ হিজরি (১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ)। আন্দোলন দমন করতে গিয়ে প্রায় ৭৬ হাজার নাগরিককে হত্যা করা হয়। একসময় দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন শাহ মুহাম্মাদ রেজা। ফ্রান্স থেকে প্রত্যাবর্তন করেন খোমেনি। ইরানকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। আবুল হাসান বনি সদরকে প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি ও মাহদি বাজেরকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করা হয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে বেশ মুখরোচক শ্লোগান ছিল ইসলামি প্রজাতন্ত্রের কর্মীদের মাঝে। ভেতর-বাহিরের মুসলিম উম্মাহকে সন্তুষ্ট করতে নানারকম প্রতিশ্রুতি ছিল। তাদের দাবি ছিল, ইসলামি স্বার্থের জন্য কাজ করাই হবে প্রজাতন্ত্রের লক্ষ্য। শিয়া মতবাদে জোর না দিয়ে বৃহত্তর উম্মাহর জন্য কাজ করা হবে। ফিলিস্তিন ইস্যুতে শক্ত অবস্থান ও ক্রুসেডারদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে। সেমতে প্রজাতন্ত্র আমেরিকার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। কিন্তু ক্ষমতা পোক্ত হওয়ার পরই তাদের আসল চেহারা বেরিয়ে পড়তে শুরু করে। সুন্নি মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের আক্রোশ জাহির হয়ে যায়। সুন্নি নাগরিকদের জন্য পরিস্থিতি দিন দিন কঠিন হতে থাকে। দেশের বাহ্যিক শাসক যে-ই থাক না কেন, দেশ চলতে থাকে মূলত খোমেনির আঙুলের ইশারায়।[১২]

ইরাক ইরান যুদ্ধ

যুক্তরাষ্ট্রের উসকানিতে ইরাকই মূলত এই যুদ্ধের সূচনা করে। ইরানের কাছে দাবি তোলে, শাতিল আরবের অধিকৃত অঞ্চল ইরাককে ফিরিয়ে দিতে হবে। সেই সাথে ১৩৯১ হিজরিতে (১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে) আরব-আমিরাত থেকে দখলকৃত গ্রেটার টুনব, লেসার টুনব ও আবু মুসা দ্বীপ থেকে ইরানকে ফিরে যেতে হবে। যুদ্ধ অনিবার্য করে তুলতে আরও কঠিন দাবি তোলা হয়। ইরানের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অঞ্চল খোজিস্তান থেকে

---

১২. শিয়া, ইরান ও তৎসংশ্লিষ্ট নানান বিষয় জানতে দেখুন মাকতাবাতুল হাসান থেকে প্রকাশিতব্য ড. রাগিব সারজানি রচিত পুস্তক *শিয়া*। -সম্পাদক

ইরানকে সরে যেতে বলা হয়। অথচ এ অঞ্চলেই ছিল ইরানের প্রধান তেলক্ষেত্রসমূহের অবস্থান। ফলে স্বাভাবিকতই ১৪০০ হিজরিতে (১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে) যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল মধ্যপ্রাচ্যের দুই রাষ্ট্রের মাঝে। ময়দানের যুদ্ধও শুরু করে ইরাক। ইরাকি বাহিনী প্রথমে ইরানের ভূমিতে প্রবেশ করে যুদ্ধ ঘোষণা করে। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলে টানা আট বছর। ১৪০৯ হিজরিতে (১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে) তা সমাপ্ত হয়। এই যুদ্ধে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়, ইরাককে উসকে দিয়ে গোপনে ইরানকেও অস্ত্র সরবরাহ করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। একইভাবে ইসরাইলও ইরানকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে। এরপর আর বোঝার বাকি থাকে না যে, এটি ছিল শত্রুদের উসকে দেওয়া মুসলিম ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ।

বিপ্লবের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত খোমেনির হাতেই ছিল ইরানের প্রকৃত নেতৃত্ব। ইরানের নেতৃত্বের অদল বদলে খোমেনির প্রভাব ছিল সর্বোচ্চ। তিনি আবুল হাসান বনি সদরকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। তার স্থলবর্তী হন মুহাম্মাদ রাজায়ি। আবুল হাসান পালিয়ে আশ্রয় নেন প্যারিসে। প্যারিসে আশ্রয় নেন বিদ্রোহী গেরিলা বাহিনী 'মুজাহিদিন খালক'-এর নেতা মাসউদ রাজাভিও। ১৪০১ হিজরিতে (১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে) রাষ্ট্রপ্রধান মুহাম্মাদ রাজায়ি ও প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মাদ জাওয়াদ বোমা হামলায় নিহত হন। এরপর রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ করেন আলি খামেনেয়ি। তিনি ১৪০৯ হিজরি (১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। এবছরই খোমেনি মৃত্যুবরণ করেন। এরপর খোমেনির দায়িত্ব লাভ করেন আলি আকবর হাশেমি রাফসানজানি, তারপর মুহাম্মাদ খাতেমি।

মুহাম্মাদ খাতেমির ক্ষমতাকাল শেষ হলে পুনরায় জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেন রাফসানজানি। কিন্তু তেহরানের জনপ্রিয় মেয়র আহমাদিনেজাদের বিপরীতে তার ভরাডুবি হয়। আহমাদিনেজাদ ইরানের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের পরিবর্তে পশ্চিমা পোশাক পরিধান করতেন। তিনি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ইরানের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার প্রতিশ্রুতি দেন। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ভাঙা সম্পর্ক মেরামতেরও অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

দ্রষ্টব্য

'ইরানে সুন্নি মুসলমানের সংখ্যা ৩৬%। শিয়াদের সংখ্যা ৬২%। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, সাফাভি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় ইরানি জনসংখ্যার মাত্র ১০%-এর মতো ছিল শিয়া। কিন্তু প্রায় দুইশ বছরের শিয়া সাফাভি শাসন ইরানি জনগোষ্ঠীর মাঝে শিয়া মতবাদ প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নির্যাতন, জবরদস্তিসহ নানা উপায়ে দীর্ঘকাল ধরে সুন্নিদেরকে শিয়া মতবাদ গ্রহণে বাধ্য করা হয়। এর ফলে একদিকে দেশে শিয়াদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে বহু সুন্নি পরিবার হিজরতের পথে হাঁটে। এরপরও যারা আজ পর্যন্ত রয়ে গেছে, তাদের বরণ করে নিতে হয় দুর্বিষহ জীবন।'



মানচিত্র নং-১৩
ইরানের মানচিত্র

চীন ও মঙ্গোলিয়ায় মোঙ্গল শাসন

এই অংশে আমরা চেঙ্গিসপুত্র ওগেদাইয়ের শাসিত অঞ্চল তথা চীন, মোঙ্গল ও পূর্ব তুর্কিস্তান (উইঘুর অঞ্চল)[১৩] নিয়ে আলোচনা করব। পাশাপাশি, আলোচনা স্পষ্ট হওয়ার জন্য ওগেদাইয়ের অপর দুই ভাই তুলুই ও চাগতাইয়ের বংশধররা কীভাবে এই অঞ্চলে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে, তাও প্রত্যক্ষ করব এখানে। সবশেষে আলোচনা করা হবে অধুনা গণচীন ও গণতান্ত্রিক মঙ্গোলিয়া সম্পর্কে।

ওগেদাই

চেঙ্গিস খানের পূর্বেই জোচি খানের মৃত্যু হলে অপর পুত্র ওগেদাইকে প্রধান খান নির্বাচিত করা হয়। ৬২৬ হিজরিতে (১২২৯ খ্রিষ্টাব্দে) চেঙ্গিসের মৃত্যুর পর ওগেদাই এ পদে অভিষিক্ত হন।

গুয়ুক খান

ওগেদাইয়ের মৃত্যুর পর তার পুত্র গুয়ুক প্রধান খানের সিংহাসন লাভ করেন। সে সময় তিনি চাচাতো ভাই বাতু বিন জোচির অধীনে ইউরোপে যুদ্ধ করছিলেন। ৬৪৪ হিজরিতে খানে-আজম পদ লাভ করেই তার এক খ্রিষ্টান অভিভাবকের ইশারায় তিনি খ্রিষ্টান হওয়ার ঘোষণা দেন। তার সময়ে মোঙ্গল অঞ্চলগুলোতে পাদরি ও ধর্মীয় যাজকদের ব্যাপক বিস্তার দেখা যায়। পাদরিরা তাকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিশেষত তার চাচাতো ভাই বাতুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। কারণ, বাতু মুসলিমদের প্রতি কিছুটা সদয় ছিল। ৬৪৭ হিজরিতে (১২৪৯ খ্রিষ্টাব্দে) গুয়ুক খান বাতু খানের বিরুদ্ধে অভিযানের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। কিন্তু সেন্যবাহিনী বাতু পৌঁছার আগেই তার মৃত্যু হয়। তাই কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি।

---

১৩. পূর্ব তুর্কিস্তান (চীনের শিনচিয়াং প্রদেশ), উইঘুর জাতি ও তাদের ওপর চীনা নিষ্পেষণ সম্পর্কে জানতে পড়ুন, মাকতাবাতুল হাসান থেকে প্রকাশিত ড. রাগিব সারজানি রচিত *তুর্কিস্তানের কান্না*। -সম্পাদক

ওগেদাই পরিবার থেকে খানে-আজম পদের ইতি

গুয়ুক খানের মৃত্যুকে সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেন বাতু খান। তিনি সাম্রাজ্যের রাজধানী কারাকোরামে একটি শক্তিশালী বাহিনী পাঠিয়ে তুলুইপুত্র মাংকো খানকে প্রধান খান নির্বাচিত করেন। এর মাধ্যমে খানে আজমের পদ ওগেদাই বংশ থেকে অপসারিত হয়ে তুলুই বংশে জায়গা করে নেয়। ওগেদাইয়ের উত্তরসূরিরা বিষয়টি মোটেও সহজভাবে নেয়নি। তখন ওগেদাইদের কর্ণধার ছিল গুয়ুকের ভাই কাশিন।

মাংকো খান খানে-আজম হওয়ার পর পূর্ব তুর্কিস্তানের বিদ্রোহ দমন করতে তার ভাই কুবলাই খানকে নিয়ে রওনা হন। তার অনুপস্থিতিতে রাজধানীর দায়িত্ব অর্পণ করে যান আরেক ভাই আরতাক বুকার কাছে। কিন্তু রাজধানী কারাকোরামে ফিরে আসার আগেই মাংকো খানের মৃত্যু হয়। এ সময় জোচির পুত্র বারকে খান ও ওগেদাইয়ের পৌত্র কেদু উভয়ে আরতাক বুকাকে খানে-আজম হতে উদ্বুদ্ধ করে। এদিকে কুবলাই খানও ছিলেন সমান প্রতিদ্বন্দ্বী। ফলে আরতাক ও কুবলাইয়ের মাঝে লড়াই বেধে যায়। অবস্থাদৃষ্টে তাদের আরেক ভাই হালাকু খান পশ্চিম সীমান্তের রণাঙ্গন ছেড়ে গৃহবিবাদ মেটাতে চলে আসেন। হালাকু খান কুবলাই খানকে সমর্থন করেন এবং তাকে খানে-আজম বানাতে সক্ষম হন। এতে বিবাদ শেষ হয়। অতঃপর কাশিনপুত্র কেদুকেও পরাস্ত করেন হালাকু।

কুবলাই খান তার শাসনকেন্দ্র কারাকোরাম থেকে বেইজিংয়ে স্থানান্তর করেন। বেইজিং হয় মোঙ্গল সাম্রাজ্যের নতুন রাজধানী। এর ফলে ওগেদাই বংশের অধীনস্থ এলাকা দুই ভাগ হয়ে যায়।

এক.

মঙ্গোলিয়া ও পূর্ব তুর্কিস্তান। এই অঞ্চলের রাজধানী কারাকোরাম। এখানে ওগেদাইদের শাসন বহাল থাকে। পরবর্তীকালে এ অঞ্চলের শাসনে চাগতাই পরিবার প্রবেশ করে।

দুই.

বিশাল চীনা অঞ্চল। এই অঞ্চলের রাজধানী বেইজিং। এখানকার শাসক তুলুইপুত্র কুবলাই খান।

পৃথকভাবে উভয় অঞ্চলের অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত পুরো বিবরণ পাঠকের সামনে তুলে ধরা হবে।

মঙ্গোলিয়া ও পূর্ব তুর্কিস্তান (উইঘুর অঞ্চল)

কুবলাই খান তার কেন্দ্র বেইজিংয়ে সরিয়ে নিলে কারাকোরাম ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ওগেদাই পরিবারের শাসন চলতে থাকে।

কেদু

ওগেদাইয়ের পৌত্র কেদু ক্ষমতা লাভ করেন তার পিতা কাশিনের মৃত্যুর পর। কেদু ছিল মুসলিমদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। এজন্য বারকে খান ও সুলতান বাইবার্সের সাথেও তার ছিল উষ্ণ সম্পর্ক। চাগতাই পরিবারের বুরাক খানের সাথে কেদুর লড়াই সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে পরাজিত হন কেদু। এই পরাজয়ের পর থেকেই কার্যত এই অঞ্চলে চাগতাইদের নিয়ন্ত্রণ চলতে থাকে। ৭০৪ হিজরিতে (১৩০৪ খ্রিষ্টাব্দে) কেদুর মৃত্যুর পর সবাই মিলে তার পুত্র শাবারকে ক্ষমতায় বসায়। এরপর ওগেদাই পরিবার ও চাগতাইদের মধ্যে নতুন করে সংঘর্ষ শুরু হয়। অবশেষে চাগতাইদের বিজয়ের মাধ্যমে সমাপ্ত হয় লড়াই। চাগতাইদের নেতা ছিলেন দোদা খান। পূর্ব পশ্চিম তথা সমগ্র তুর্কিস্তান ও ওগেদাইদের সম্পূর্ণ এলাকা তার করতলগত হয়। এরপর এই অঞ্চলে চাগতাইদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও বিভিন্ন সময়ে ওগেদাই পরিবারের লোকেরাও শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে। ৭৪১ হিজরিতে (১৩৪১ খ্রিষ্টাব্দে) শাসন করেন আলি খান নামের ওগেদাই বংশের একজন। চাগতাই শাসক তারমাশিরিন (৭২২-৭৩৫ হিজরি/১৩২২-১৩৩৫ খ্রিষ্টাব্দ)-এর আমলে এই অঞ্চলে ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করে। তারমাশিরিন নিজে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তার অনুগামী চাগতাই বংশীয় বহু মোঙ্গলও ইসলাম গ্রহণ করে।

আলি খানের পর আরেকজন ওগেদাই বংশধর এই অঞ্চল শাসন করেন, যার নাম দানিশমান্দজা। তৈমুর লং এই অঞ্চল দখলের পর দানিশমান্দজার পুত্র সিওর্গতামশারকে আঞ্চলিক শাসকের পদ দিয়েছিলেন। তারপর তার ছেলে মাহমুদও সেই পদে অধিষ্ঠিত হন। তবে ক্ষমতার চাবিকাঠি মূলত তৈমুরের হাতেই ছিল। তৈমুরের মৃত্যুর পর তার সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

চীনে মিং রাজবংশের শাসন শুরু হলে তারা কুবলাইয়ের উত্তরসূরিদের তাড়িয়ে দিতে থাকে। তাড়া খাওয়া তাতাররা কারাকোরামে আশ্রয় নেয়।

কিন্তু মিং বাহিনী এখানেও তাদের পরাস্ত করে এবং তাদের ইচ্ছেমতো অধিপতি নির্ধারণ করে দেয়। পূর্ব তুর্কিস্তান সে সময় ভেঙে যায়। বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্যের উপস্থিতিতে টিকে ছিল এ অঞ্চল; যেমন কাশগর, আকসু। মঙ্গোলিয়া, পূর্ব তুর্কিস্তান, কানসু ইত্যাদি অঞ্চল তখন মিং বংশের অধীনতা স্বীকার করে শাসিত হতে থাকে।

চীন ভূখণ্ড

কুবলাই পরিবারের শাসন

(৬৭৫-৭৬৯ হি./১২৭৬-১৩৬৮ খ্রি.)

কুবলাই খান খানে-আজম পদ লাভ করে রাজধানী স্থানান্তর করেন বেইজিংয়ে। তখন পর্যন্ত কেবল চীনের উত্তরাঞ্চলই ছিল মোঙ্গলদের শাসনাধীন। কুবলাই এসে ৬৭৯ হিজরির (১২৮০ খ্রিষ্টাব্দের) দিকে দক্ষিণ চীনকেও সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। কুবলাইয়ের হাতে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। ৭৭১ হিজরি পর্যন্ত চীনা সাম্রাজ্য কুবলাইদের দখলে ছিল। সাম্রাজ্যের শেষ পুরুষ হলেন তোগান তৈমুর। এই বংশের শাসকরা ছিল বেশ ফুর্তিবাজ ও বিলাসী।

চীনে ইসলাম আগমন করে মহান সাহাবি ও তৃতীয় খলিফা উসমান রা.-এর শাসনকালে। মুসলিম ব্যবসায়ী ও দাঈদের মাধ্যমে এ অঞ্চলে ইসলামের প্রবেশ ঘটে। উমাইয়া শাসনামলে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে চীনে দাঈদের আগমন বৃদ্ধি পায়। সে সময় আনুমানিক ১৬টি দাওয়াতি কাফেলা চীনে এসেছিল ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে। আব্বাসি আমলে আসে আনুমানিক ১২টি দল। তবে চীনে ইসলাম প্রচার-প্রসারের মূল সময়টা ছিল কুবলাই বংশের মোঙ্গলীয় শাসনামল। এ পরিবারের শাসকগণ ইসলাম গ্রহণকারী মোঙ্গলদের ওপর বেশ ভরসা করত। তাই অনেক সময় মুসলিম অঞ্চল থেকে সৈনিক ও বড় কর্মকর্তা চীনে আগমন করেছিল কুবলাইদের প্রয়োজনে। তুর্কিস্তান ও মাওয়ারাউন নাহারের বিপুল মুসলিম সৈন্য চীনে আগমন করে। কোনো সময়ে ১২টি প্রদেশে সৃষ্ট চীনা সাম্রাজ্যের ৮টি প্রদেশেরই প্রশাসক ছিল মুসলিমরা। মোঙ্গল সাম্রাজ্যে মুসলিম প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মাঝে প্রসিদ্ধ একজন হলেন শামসুদ্দিন উমর। তিনি সাধারণ একজন সেনা অফিসার হিসেবে যোগদান করে পর্যায়ক্রমে থাইউয়েন শহরের সামরিক শাসক, বিনয়াং শহরের প্রশাসক,

বেইজিংয়ের বিচারপতি ও পরবর্তীকালে তার শাসক, সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক উপদেষ্টা, একপর্যায়ে সিছুয়ান, ইউনান প্রদেশের শাসকে পরিণত হন। তিনি বিপুল পরিমাণ মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবত চীনে টিকে থাকা অধিকাংশ প্রাচীন মসজিদ মোঙ্গল আমলেরই তৈরি। চীনে সে সময় মুসলমানদের বেশ কদর ছিল। জাগতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সভ্যতা-সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রেই তাদের ছিল অনন্য ভূমিকা। ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যগুণের ফলে সর্বাবস্থায়ই তারা ছিল উচ্চ সব পদে অধিষ্ঠিত।

মিং বংশের শাসন

(৭৭০-১০৫২ হি./১৩৬৯-১৬৪২ খ্রি.)

চীনে মোঙ্গল শাসনের পতন ঘটিয়ে ক্ষমতায় আসে মিং। ৭৭০ হিজরিতে তোগান তৈমুরের আমলে বেইজিং দখলের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে মোঙ্গলরা চীনের কেন্দ্র থেকে বিতাড়িত হয়। তাড়া খেয়ে কুবলাইয়ের বংশধররা আশ্রয় নেয় কারাকোরাম ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে। এদের হাতে পরবর্তী সময়ে এই অঞ্চলে কয়েকটি রাজ্য গড়ে ওঠে। এসব রাজ্যের শাসক নির্ধারণে মিংরাই মূল ভূমিকা পালন করত। ধুঁকে ধুঁকে চলা এসব রাজ্যের ইতি ঘটিয়ে চূড়ান্ত চীনা দখলদারি প্রতিষ্ঠা হয় ১০৪৩ হিজরিতে।

পূর্ব তুর্কিস্তানে নিজেদের দুর্বলতা ও অনৈক্যের খেসারত দেয় মোঙ্গলরা। বিচ্ছিন্ন হয়ে গড়ে ওঠে কাশগর, আকসুর মতো স্বতন্ত্র রাজ্য। গড়ে ওঠা এসব রাজ্য পরিচালনা করত চাগতাইয়ের কিছু বংশধর। দুর্বলতাবশত তারা মিং রাজবংশের অধীনতা মেনে নিয়ে শাসনকার্য চালাত। একপর্যায়ে মিংরা মঙ্গোলিয়া, পূর্ব তুর্কিস্তান ও কাংসুর পূর্ণ দখল নিয়ে নেয়। তবে মিং শাসনামলেও মুসলিমরা পূর্বের মতো মর্যাদা লাভ করত। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে তাদেরকে গণ্য করা হতো।

মাঞ্চু বংশের শাসন

(১০৫৪-১৩২৯ হি./১৬৪৪-১৯১১ খ্রি.)

পূর্বের চীনা শাসকরা মুসলিমদের সাথে ভব্যতা বজায় রেখে দেশ পরিচালনা করত। এ পর্যন্ত প্রায় পুরোটা সময়জুড়েই বিভিন্ন সাম্রাজ্যকালে মুসলিমদের সম্মানের অবস্থানে তেমন হেরফের হয়নি। তাদের জন্য

নির্ধারিত থাকত সম্মানজনক সব পদ। মুসলিমরা নিজেদের সুউচ্চ ইসলামি মূল্যবোধ ও আখলাকের মাধ্যমে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর হৃদয় কেড়ে নিতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু মাঞ্চুদের রাজত্ব শুরু হতেই অবস্থা বদলে যেতে লাগল। মুসলিমদের অবস্থান ও কর্তৃত্ব তাদের রাজত্বের জন্য তারা হুমকি মনে করল। রাষ্ট্রীয় পদে মুসলিমদের উচ্চ অবস্থান, মূল্যায়ন, যোগ্যতা ও ক্ষমতার তুলনায় চীনা কর্মকর্তাদের পিছিয়ে থাকার কারণে তাদের মনে হিংসাত্মক অভিসন্ধি জেগে উঠল। মুসলমান হটানো হয়ে উঠল সেসব কর্মকর্তার অন্যতম লক্ষ্য। এসব চীনা রাজ কর্মচারী মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের আগুন ছড়াতে শুরু করল। এই আগুন আরও তেতে ওঠার কারণ হলো, দুই মুসলমান সেনাপতি শেষ মিং রাজা ইয়াংগান ওয়াংকে সমর্থন করে এবং তার পক্ষে অস্ত্র ধারণ করে। হারানো সাম্রাজ্য ফিরে পাওয়ার আশায় ১০৫৮ হিজরিতে (১৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দে) এই দুজনের সহযোগিতায় কাংসু রাজ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মিংয়ের শেষ বংশধর। কিন্তু মাঞ্চুরা এই বিদ্রোহ কঠোর হাতে দমন করে। প্রায় ৫ হাজার মুসলিমকে হত্যা করে মাঞ্চুবাহিনী। এরপর থেকেই মাঞ্চুরা মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করতে উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। মুসলিমরা কয়েকবার প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে। কিন্তু সেসব ব্যর্থ হওয়ার জন্য তাদের অভ্যন্তরীণ বিরোধই যথেষ্ট ছিল। শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যের পরিবর্তে চীনা মুসলিমরা ছিল শত দলে বিভক্ত। সামান্য বিষয় ও সাধারণ ফিকহি মাসআলাও তাদের ঐক্যে ফাটল ধরাতে যথেষ্ট ছিল। তখন গৃহবিবাদ মেটানোর নাম করে মাঞ্চুদের রাজা সৈন্য পাঠিয়ে মুসলিমদের শায়েস্তা করার সহজ সুযোগ হাতছাড়া করত না। অগণিত মুসলমান শহিদ হয়ে যেত, তবু তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিরোধ করতে পারত না। এজন্য অনেক বিদ্রোহ সংগ্রাম করেও মুসলমানরা সাফল্য ঘরে তুলতে পারেনি। বিচ্ছিন্ন ও ছড়ানো ছিটানো বিদ্রোহ দমন করতে মাঞ্চুদের তেমন বেগ পেতে হয়নি। নিহত হয় প্রচুর পরিমাণ মুসলিম। তবে তাদের এই দমননীতির একপর্যায়ে তারা কিছুটা সহনশীল মনোভাবে ফিরে আসে। পরবর্তী শাসকগোষ্ঠীও একই নীতি অবলম্বন করে। যার লক্ষণ হিসেবে ১৩২১ হিজরিতে (১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে) বেইজিং জামে মসজিদের ইমাম ইলিয়াস আবদুর রহমানকে ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অনুমতি দেওয়া হয়। এই প্রতিষ্ঠানে আরবি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হতো। এ সময়

উসমানি খলিফা দ্বিতীয় আবদুল হামিদ চীনা মুসলিমদের সাথে নতুন করে সংযোগ স্থাপন করেন। তিনি বেইজিংয়ে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। তারা সেখানে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করলে সেখানে প্রচুর সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। কিন্তু এই উদ্যোগকে চীনা সরকার নিজের জন্য হুমকি মনে করে। তারা ধারণা করে, এটি হচ্ছে ইসলামি জাগরণের সূচনা। তখন প্রতিনিধি দলকে ইস্তাম্বুল ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

গণতান্ত্রিক চীন

(১৩২৯-১৩৬৯ হি./১৯১১-১৯৫০ খ্রি.)

গণতান্ত্রিক চীনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতেও মুসলমানদের বেশ ভূমিকা ছিল। কারণ, এর মাধ্যমে তারা মাঞ্চুদের শাসন থেকে মুক্তি পাবে বলে ধারণা করে। গণতান্ত্রিক সরকার মুসলিমদেরকে চীনের মূল কাঠামোর অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। চীনের অধিবাসীদের ৫টি জাতিতে বিভক্ত করা হয়। যথা :

১. চীনা ২. মাঞ্চু ৩. মোঙ্গল ৪. মুসলিম (হুই বংশীয়) ও ৫. তিব্বতি।

তৎকালীন নতুন চীনা পতাকায় ৫টি রং ছিল। লাল, নীল, হলুদ, সাদা ও কালো। সাদা রং হলো মুসলমানদের প্রতীক। চীনের মূল ভূখণ্ডে মুসলমানদের আন্দোলন সংগ্রাম থেমে যায়। পরিস্থিতি তাদের অনুকূলে ফিরে আসে। অনেক ইসলামি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। মুসলমানদের শিক্ষাদীক্ষা, সেবা-সাহায্যসহ বিশ্বের অন্যান্য মুসলিমদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনেও এসব প্রতিষ্ঠান বেশ ভূমিকা রেখেছিল। তবে চীনের দখলকৃত পূর্ব তুর্কিস্তানের পরিস্থিতি তখনও সম্পূর্ণ ভিন্নরকম।

পূর্ব তুর্কিস্তানে মুসলমানদের টিকে থাকার সংগ্রাম

বীর সেনাপতি কুতাইবা বিন মুসলিম এই অঞ্চল জয় করেন। ৯৬ হিজরিতে (৭১৫ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি ইসলামি সেনাদল নিয়ে আঞ্চলিক বৃহত্তম শহর কাশগরে প্রবেশ করেন। তারপর দীর্ঘকাল এই অঞ্চলে ইসলামি শাসন টিকে ছিল। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর তারাই দাওয়াতের মাধ্যমে অন্যান্য চীনা জাতির মাঝে ইসলাম ছড়িয়ে দিতে তৎপর থাকে। একসময় মোঙ্গলরা এখানে জয়ী হয়ে সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। তারপর তাদের দুর্বলতার দরুন এ অঞ্চলে ভাঙনের সৃষ্টি হয়। বিচ্ছিন্নতার সুযোগে

সাম্রাজ্য বিস্তার করে বসে মাঞ্চুরা। ১১৪৯-১১৯৯ হিজরি (১৭৩৬-১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত সময়ের মাঝে বিস্তৃত অঞ্চল মাঞ্চুদের পদানত হয়। তারা এর নামকরণ করে শিনচিয়াং অর্থাৎ 'নতুন অঞ্চল'। (বস্তুত, এই নামই দখলদারির প্রমাণ বহন করে।)

পূর্ব তুর্কিস্তান ও কাংসুতে একের পর এক বিদ্রোহ ঘটতে থাকে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহ সংঘটিত হয় ইয়াকুব বেগের নেতৃত্বে ১২৭১ হিজরিতে (১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে)। বিদ্রোহ করে সফল হয় ইয়াকুব বেগের বিপ্লবী সেনারা। চীন থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে নতুন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে গণতান্ত্রিক পূর্ব তুর্কিস্তান। তবে এই স্বাধীনতা টিকে ছিল মাত্র ১৩ বছর। ঠিক সে সময় কাংসুতে বিপ্লবীরা চীনের মোকাবিলা করছিল। নিজেদের বিপ্লবের স্থায়িত্বের জন্যই তুর্কিস্তানিদের ওপর কর্তব্য ছিল কাংসুদের সহায়তা করা। কিন্তু তারা এ ক্ষেত্রে এগিয়ে আসেনি। ফলে চীনারা কাংসুদের বিপ্লব দমন করতে সক্ষম হয়। এরপর তারা পূর্ণ মনোযোগ ফেরায় পূর্ব তুর্কিস্তানের দিকে। ১২৯১ হিজরিতে (১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে) পূর্ব তুর্কিস্তানের পতন হয়। হত্যা করা হয় ইয়াকুব বেগকে।

চীনে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার পর সরকারের কিছু পদক্ষেপ তুর্কিস্তানি অধিবাসীদের উত্তেজিত করে তোলে। তার মধ্যে একটি হলো, চীনের প্রতি নতজানু মাসউদ বেগকে গভর্নর বানানো। মাসউদ ছিল মারাত্মক জালেম শাসক। বিরোধীদের হত্যা করা ছিল তার স্বভাবজাত বিষয়। একপর্যায়ে সমাজে তার জুলুমের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে চীন সরকারের কাছে এই নীপিড়কের ব্যাপারে অভিযোগ জানায়। সরকার তাকে কঠোরতা কমিয়ে আনতে উপদেশ দেয়। সেও উপদেশের সামনে বিনয়ী ভাব দেখায়। কিন্তু আড়ালে এই নির্যাতন-নিপীড়ন অব্যাহতই থাকে। অবস্থা যেই সেই রয়ে যায়। এ অবস্থায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। উন্মত্ত জনতা সরকার নিযুক্ত কমিশনারকে হত্যা করে। জনগণ তৈমুর নামের একজনকে এ বিদ্রোহের নেতা নির্বাচিত করে। বিদ্রোহ দমন করতে চীনও সৈন্য প্রেরণ করে। চীনা বাহিনীর প্রধান রক্তপাতহীন বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করে। শান্তিচুক্তি হয় এবং সবার জন্য ঘোষণা করা হয় সাধারণ ক্ষমা। তবে বিপ্লবী নেতা তৈমুরকে নির্বাসিত করা হয় দেশ থেকে। এভাবে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

১৩৪৯ হিজরিতে (১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে) আবার জ্বলে ওঠে বিদ্রোহের আগুন। এবারের প্রেক্ষাপট ছিল, প্রদেশের পুলিশপ্রধান কর্তৃক এক মুসলিম নারীর শ্লীলতাহানী। এতে জনতা চরম উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পুলিশপ্রধানকে এক অনুষ্ঠানে দাওয়াত করে এনে হত্যা করে ফেলা হয়। শুরু হয় তুমুল বিদ্রোহ। পূর্ব তুর্কিস্তানের মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করতে শুরু করে। রুশ সহযোগিতা সত্ত্বেও চীনা-রুশ বাহিনীকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ১৩৫২ হিজরিতে নতুনভাবে গণতান্ত্রিক পূর্ব তুর্কিস্তান রাষ্ট্র ঘোষিত হয়। কাশগরকে করা হয় এর রাজধানী। খোজা নিয়াজ রাষ্ট্রপতি এবং তার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন দামেল। কিন্তু বিপ্লবী রাষ্ট্রটি এক বছরের বেশি স্থায়ী হয়নি। ১৩৫৩ হিজরিতে রুশ-চীন সম্মিলিত বাহিনীর জোর আক্রমণে রাষ্ট্রের কাঠামো ভেঙে পড়ে। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীসহ প্রায় দশ হাজার মুসলিম নাগরিককে হত্যা করে বিপ্লবী রাষ্ট্রের মৃত্যু ঘটানো হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন আন্দোলন-সংগ্রাম

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান চীন আক্রমণ করে উত্তরাংশ কবজা করে নেয়। তুমুল আক্রমণ চালিয়ে ১৩৫২-১৩৫৭ হিজরির (১৯৩৩-১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দের) মধ্যবর্তী সময়ে চীনের রাজধানী বেইজিং দখল করে রাখে। রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে চীনকে পূর্ণমাত্রায় সহযোগিতা করছিল। লড়াইয়ে নিজের পাল্লা ভারী করতে জাপান চীনের মুসলিমদের সাথে হাত মেলাতে আগ্রহী হয়। এজন্য দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, পত্রপত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদিতে তারা কোনোপ্রকার বাধা দেয়নি। এই সুযোগে মুসলিমরা নিজেদেরকে সুসংগঠিত করে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, প্রকাশনা, একাডেমি ও পত্রিকা গড়ে ওঠে। চীনাদেরকে ইসলাম গ্রহণের স্বাধীনতা দেয় জাপান সরকার। মুসলিমদের তাৎপর্যপূর্ণ ইবাদত হজ পালনে আগ্রহীদের জন্য যাতায়াতব্যবস্থা উন্নত করার চেষ্টা করে তারা।

এই অবস্থায় মুসলিমরা বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক ভাগ জাপানের পক্ষাবলম্বন করে। আরেক ভাগ চলে যায় রাশিয়াপন্থি কম্যুনিস্টদের পক্ষে। কম্যুনিস্টরা মুসলমানদের বিভিন্ন ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের পক্ষে ভিড়িয়ে নেয়। বিশ্বযুদ্ধে জাপান পরাজিত হয়। লাল বাহিনী জাপানিদের তাড়িয়ে চীনের প্রায় সর্বত্র নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তাইওয়ান প্রদেশ তখনও এসব থেকে মুক্ত ছিল। সে অঞ্চলে শাসন প্রতিষ্ঠা করে চীনের পূর্ব শাসকগোষ্ঠী। এদিকে কম্যুনিস্টপন্থি রাশিয়া চীনে তার

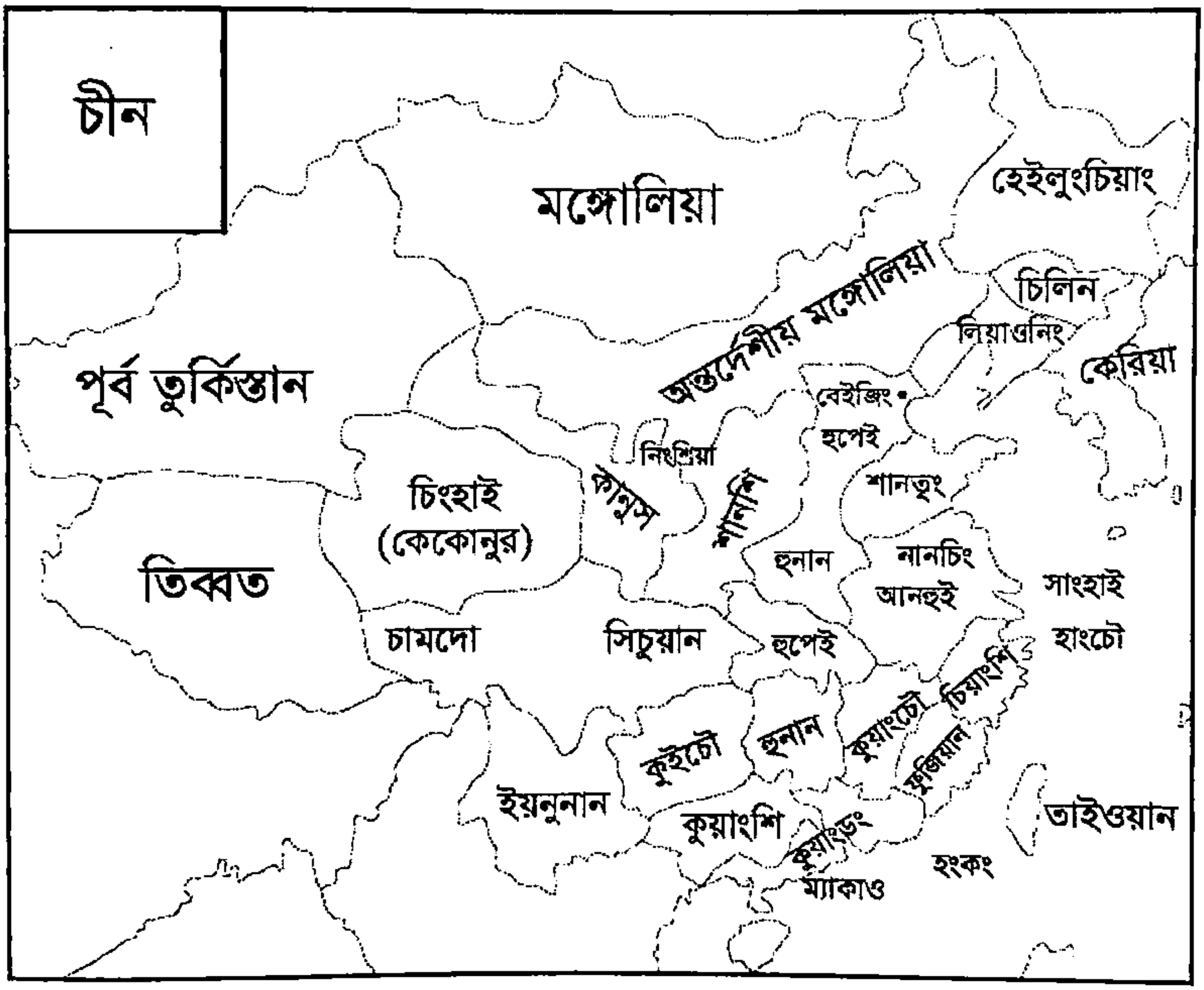
সম্প্রসারণবাদি নীতি ফলাতে শুরু করে। মুসলিমরা কাংসু প্রদেশে স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু লানচৌ যুদ্ধে কম্যুনিস্টদের কাছে তাদের পরাজয় ঘটে। সে যুদ্ধে মুসলিমদের সেনাপতি ছিলেন হুসাইন মাপুফাং। এরপর কম্যুনিস্ট বাহিনী পূর্ব তুর্কিস্তানে তাদের দখলদারি প্রতিষ্ঠা অব্যাহত রাখে। আলি খানের নেতৃত্বে ও রাশিয়ার সহযোগিতায় স্থানীয় মুসলিমরা প্রদেশের উত্তরাঞ্চলে স্বাধীন এলাকা প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু চীনা কম্যুনিস্ট বাহিনী সমগ্র প্রদেশে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। বিপ্লবের নেতারা আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়।

দ্রষ্টব্য

'তুর্কিস্তানের স্বাধীনচেতা জনগণ এখনো স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু চীনের কঠিন দমননীতির ফলে স্বাধীনতার স্বপ্ন যেন ডানাভাঙা কোনো পাখি। যেকোনো আন্দোলন সেখানে কঠোর উপায়ে দমন করা হয়। সেখানকার মুসলমানদের জীবন কীভাবে কাটে, সে সম্পর্কেও বিশ্বমিডিয়া প্রায় অন্ধকারে থাকে।

বর্তমানে পূর্ব তুর্কিস্তানসহ সমস্ত চীনা অঞ্চল চলমান শাসনের আওতাভুক্ত। কেবল পশ্চিমা সহায়তায় স্বাধীনতা ধরে রাখতে পেরেছে তাইওয়ান। অবশ্য রুশ সহায়তায় মঙ্গোলিয়াও বিশাল ভূখণ্ড নিয়ে চীন থেকে পৃথক রাষ্ট্র গঠন করতে সক্ষম হয়েছে। তার রাজধানী উলানবাটোর, যার পূর্ব নাম ছিল কারাকোরাম। চীনের উত্তর পশ্চিম দিকে মুসলমানের সংখ্যা বেশি। পূর্ব দিকে ধীরে ধীরে মুসলমানের সংখ্যা কমে এসেছে। চীনে মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ১০%। কিন্তু প্রকৃত সংখ্যা প্রকাশ না করে মুসলিমদের কম সংখ্যক বুঝিয়ে হীনম্মন্যতা তৈরি করা সাম্রাজ্যবাদীদের পুরোনো কৌশল। তাই চীনও কখনো মুসলিমদের প্রকৃত সংখ্যা প্রকাশ করে না। শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে সাম্রাজ্যবাদের আরেকটি কৌশল হলো ঐতিহাসিক নামগুলো মুছে ফেলা। এই প্রক্রিয়ায় বদলে ফেলা হয়েছে বহু

প্রাচীন নাম। যেমন : উরমুজি, তিহো ইয়ারকন্দ, সুজি, কাশগর, শুফু প্রভৃতি।'



মানচিত্র নং-১৪

চীন ও মঙ্গোলিয়া প্রজাতন্ত্র

পশ্চিম তুর্কিস্তানে মোঙ্গল শাসন

চেঙ্গিস খানের প্রথম স্ত্রীর এক সন্তান হলেন চাগতাই। মোঙ্গলদের দখলকৃত বিশাল সাম্রাজ্যের চার ভাগের একাংশজুড়ে তার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তার ভাগের অঞ্চলগুলো হলো পুরো তুর্কিস্তান, উইঘুরদের রাজ্য কাংসু এবং মাওয়ারাউন নাহার (ট্রান্সঅক্সিয়ানা)। পূর্ব পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে যে কীভাবে পূর্ব তুর্কিস্তান ও কাংসু চীনাদের অধিকৃত হয়। বর্তমানেও অঞ্চল দুটি চীনা প্রদেশ হিসেবে পরাধীন। এই পরিচ্ছেদে তুর্কিস্তানের বাকি অঞ্চল নিয়ে আলোচনা হবে।

চাগতাইয়ের পর তার উত্তরসূরিরা একের পর এক এই অঞ্চল শাসন করে। তাদের মধ্যে প্রথম মুসলিম শাসক হলেন মোবারক শাহ। ৬৬৪ হিজরিতে (১২৬৬ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি ক্ষমতায় আরোহণ করেন। তার ইসলাম গ্রহণের কারণ হলো, তার মা আরগানা ছিলেন একজন মুসলিম নারী। তিনি ছিলেন চাগতাইয়ের নাতি কারা হালাকুর স্ত্রী। তবে মোবারকের রাজত্ব স্থায়ী হতে পারেনি। তার ভাতিজা বুরাক খান এক বছরের মাথাতেই তাকে অপসারণ করে নিজে সিংহাসনে উপবিষ্ট হন।

বুরাক খানের উল্লেখযোগ্য কর্ম ছিল ওগেদাইদের সাথে যুদ্ধ করে জয়ী হওয়া। জানা যায় যে, শেষ জীবনে তিনি মুসলমান হয়েছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করে নিজের নাম রেখেছিলেন গিয়াসুদ্দিন।

তারপর কয়েকজন শাসক আসে; যথা দোদা খান—তিনি ওগেদাইদের সম্পূর্ণ পরাস্ত করেন। কাজাক খান—তার সময়ে চাগতাই ও ইলখানিয়াদের মাঝে বারবার যুদ্ধ হয়। এসব যুদ্ধে চাগতাইরা পরাজিত হয়। এরপর প্রতিনিয়ত তারা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সাম্রাজ্যের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে যায়। পরবর্তীকালে আগত দুর্বল শাসকদের জন্য বিশাল সাম্রাজ্যের ওপর কর্তৃত্ব ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৭২২ হিজরিতে (১৩২২ খ্রিষ্টাব্দে) ক্ষমতায় বসেন তারমাশিরিন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তার সাথে ইসলাম গ্রহণ করে চাগতাই বংশের

অগণিত মোঙ্গল। কিন্তু তিনি দেশকে এক সুতোয় গেঁথে রাখতে ব্যর্থ হন। তার অধীনস্থ শাসকেরা অনেকে ইসলাম গ্রহণ করে, অনেকে পূর্বের প্রতিমা পূজায় রয়ে যায়। বুজুন খান নামের এক অমুসলিম শাসক তারমাশিরিনকে ক্ষমতাচ্যুত করে সিংহাসনে বসেন। তিনি মুসলিমদের প্রতি নানা অত্যাচার আরম্ভ করেন। মুসলমানরা তাকে সরিয়ে একজন মুসলিম শাসককে ক্ষমতায় আনতে সক্ষম হয়। তিনি হচ্ছেন ওগেদাই বংশের আলি খান।

তারপর ৭৪৩-৭৪৪ হিজরির (১৩৪২-১৩৪৩ খ্রিষ্টাব্দের) সময় আরেকজন মুসলিম শাসক আসেন, যার নাম মুহাম্মাদ খান। এরপর শাসন করেন কাজান। ৭৪৭ হিজরিতে (১৩৪৬ খ্রিষ্টাব্দে) কাজানের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য ভেঙে কয়েক টুকরো হয়ে যায়। তুর্কিরা মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। নানা অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এ সময়ই আত্মপ্রকাশ করেন তুঘলক খান, যিনি ৭৪৮ হিজরিতে (১৩৪৭ খ্রিষ্টাব্দে) পূর্ব তুর্কিস্তানের কাশগরে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তার রাজ্যের সীমানা ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত হতে থাকে। করায়ত্বে আসে মাওয়ারাউন নাহার। তার শাসনকালে ১ লক্ষ ৬০ হাজারের বেশি মোঙ্গল ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

তৈমুর লং

তৈমুর লং মোঙ্গল পরিবেশে লালিত হলেও মূলত তিনি তুর্কি বার্লাস গোত্রের সন্তান। তার এক পূর্বপুরুষ চেঙ্গিস খানের সহযোগী ছিলেন। চেঙ্গিস খান তাকে খুব ভালোবাসতেন। একপর্যায়ে নিজের পুত্র চাগতাইয়ের দেখাশোনার দায়িত্ব অর্পণ করেন তৈমুরের উক্ত পূর্বপুরুষের কাঁধে। সেই থেকেই তারা মোঙ্গল শাসক পরিবারের অংশ। তৈমুরের জন্ম ৭৩৬ হিজরিতে (১৩৩৬ খ্রিষ্টাব্দে) শহরিসবজ অঞ্চলে।

কাশগরের মোঙ্গল শাসক তুঘলক খান সমরকন্দ জয়ের উদ্দেশ্যে একটি বাহিনী পাঠান। তারা সমরকন্দ পৌঁছলে তৈমুর লং বাহিনীপ্রধানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সে সময় বার্লাস গোত্রটি সমরকন্দের নিকটেই বসবাস করত। তৈমুর খান সাক্ষাৎ করে কাশগরের সেনাপতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। সেনাপতি তখন নির্দেশ দেন, বার্লাস গোত্রের এলাকায় যেন প্রবেশ করা না হয়। তৈমুর খানকে সম্রাটের সাথে মোলাকাত করতে

আহ্বান জানান সেনাপ্রধান। সম্রাট তৈমুর খানকে তার জন্মস্থান শহরিসবজ শহরের গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত করেন।

তৈমুরের রাজ্য সম্প্রসারণ

কিছুদিন পর তৈমুরকে সমরকন্দের আমির বানানো হয়। আর মাওয়ারাউন নাহারের শাসক হিসেবে আসেন তুঘলক খানের পুত্র ইলিয়াস। শাসক হিসেবে তৈমুর ছিলেন অত্যাচারী। এ কারণে ইলিয়াসের সাথে তার বেশ রেশারেশি শুরু হয়। ইলিয়াস পিতাকে পত্র লিখে সব খুলে বলেন। সব শুনে তুঘলক খান নির্দেশ দেন তৈমুরকে হত্যা করতে। এই সংবাদ জানতে পেরে তৈমুর সমরকন্দ থেকে পালিয়ে যান। জোট বাঁধেন আরেক পলাতক আমিরের সাথে। যে ছিল মূলত তৈমুরের ভগ্নিপতি। দুজন মিলে পর্যাপ্ত সৈন্য সমাবেশ করতে সক্ষম হয়। তারপর তারা মোঙ্গলদের সাথে লড়াই করে এবং জয়ী হয়। এরপর মৃত্যুবরণ করেন সাম্রাজ্যের সম্রাট তুঘলক খান। পুত্র ইলিয়াস তখন পিতার সিংহাসনে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে কাশগরে পাড়ি জমান। তৈমুরের সামনে তখন সমরকন্দসহ গোটা মাওয়ারাউন নাহার দখল করার সুবর্ণ সুযোগ। সুযোগ লুফে নেন তিনি। সূচনা হয় তৈমুরীয় সাম্রাজ্যের, যার রাজধানী হয় সমরকন্দ।

ইলিয়াস বিন তুঘলক সৈন্যসামন্ত নিয়ে তৈমুরের মোকাবিলা করতে বের হন। তার শক্তিশালী বাহিনীর সামনে তৈমুর লং পরাজয় বরণ করেন। কিন্তু জয়ী হয়েও সমরকন্দ দখল করতে ব্যর্থ হন ইলিয়াস। সংকটের মুহূর্তে তৈমুর খানের ভগ্নিপতি নিজেকে সমরকন্দের অধিপতি ঘোষণা করেন। মোঙ্গলদের প্রতিরোধ করতে ঐক্য টিকিয়ে রাখতে তৎপর তৈমুর লং তৎক্ষণাৎ এর প্রতিবাদ করেননি। তবে পরিস্থিতি অনুকূল হতেই ভগ্নিপতির সাথে যুদ্ধ করে শাসনক্ষমতা পুনর্দখল করেন তিনি। সমগ্র মাওয়ারাউন নাহার দখল করে নেন তৈমুর লং। এভাবে তিনি তাতার গোষ্ঠীর নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। এমতাবস্থায় চাগতাই পরিবারের পক্ষ হতে নিযুক্ত শাসক কমরুদ্দিন নির্বাসন বরণ করে নিতে বাধ্য হন। ৭৭১ হিজরিতে তৈমুর লং মাওয়ারাউন নাহারের খান হিসেবে ক্ষমতায় বসান ওগেদাই বংশের দানিশমান্দজার পুত্র সিওর্গতামশারকে। তাকে ক্ষমতায় আরোহণ করানো হয় মূলত পুতুল শাসক হিসেবে। তৈমুর নিজে গ্রহণ করেন উজিরের পদ। শাসন ও ক্ষমতার প্রকৃত চাবিকাঠি তার হাতেই থাকে। তৈমুর হেরাত ও খোয়ারিজম রাজ্যদ্বয় নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত

করতে সক্ষম হন। তবে সে সময় পূর্ব তুর্কিস্তান চাগতাইদের অধীনে ছিল। ফলে অঞ্চলটি বিচ্ছিন্নই রয়ে যায়। চীনের দখলে যাওয়া পর্যন্ত তা চাগতাইদের শাসনাধীনই থাকে।

এদিকে ক্রিমিয়ার সম্রাট মামাই উত্তর মোঙ্গল সাম্রাজ্যের রাজধানী সারাইয়ে প্রবেশ করেন। সারাইয়ের সুলতান তোকতামিশ তখন তৈমুর লংয়ের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তৈমুর সারাইয়ে পৌঁছে মামাইকে বিতাড়িত করেন। এ সময় তিনি রুশদের আক্রমণ করে ৭৮৩ হিজরিতে (১৩৮১ খ্রিষ্টাব্দ) দখল করে নেন রাজধানী মস্কো। ৭৮২-৭৮৬ হিজরির (১৩৮০-১৩৮৪ খ্রিষ্টাব্দের) মধ্যকার সময়ে ইলখানিয়া সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চল তৈমুরীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

সারাইয়ের সুলতান তোকতামিশের সাথে মতবিরোধ দেখা দিলে তৈমুর তার রাজ্য আক্রমণ করেন এবং উত্তর মোঙ্গল সাম্রাজ্য দখল করে নেন। সারাইয়ে নিজের পক্ষ থেকে একজনকে গভর্নর নিয়োগ দিয়ে রাজধানীতে ফিরে আসেন তৈমুর।

৮০০ হিজরিতে (১৩৯৭ খ্রিষ্টাব্দে) তৈমুর লং অভিযান চালান ভারতে। কাশ্মীর, দিল্লিসহ ভারতবর্ষের বেশকিছু অঞ্চল তৈমুরের পদানত হয়। দিল্লির তৎকালীন সুলতান মাহমুদকে পরাস্ত করেন তিনি। দিল্লিতে নিজের গভর্নর নিয়োগ দিয়ে ফিরে আসেন।

তারপর তৈমুর উসমানি সুলতান প্রথম বায়েজিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে আনাতোলিয়া আক্রমণের মনস্থ করেন। এর কারণ ছিল, তৈমুর আলেপ্পো, দামেশক ও বাগদাদ দখল করার পথে তার আনুগত্য মেনে নেওয়া দুই আমির আহমাদ বিন ওয়াইস ও কারা ইউসুফ বাধা প্রদান করেন। এরপর তাদেরকে আশ্রয় দেন বায়েজিদ। অন্যদিকে মামলুক সুলতান তৈমুরের ভয়ে তার আনুগত্য ঘোষণা করেন এবং তার নামে খুতবা পাঠ ও তাকে কর দিতে রাজি হয়ে যান। কিন্তু বায়েজিদ কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে তৈমুর খানের শত্রুদের আশ্রয় দেন। অতএব তৈমুর উসমানি সাম্রাজ্যে আক্রমণের পথে হাঁটেন। ৮০৫ হিজরিতে (১৪০২ খ্রিষ্টাব্দে) আঙ্কারায় উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয়। সে যুদ্ধে উসমানিদের পরাজয় ঘটে।

তৈমুর খান ৮০৮ হিজরিতে (১৪০৫ খ্রিষ্টাব্দে) চীন অভিমুখে রওনা হন। কিন্তু এটাই ছিল তার শেষ যাত্রা। চীনে পৌঁছার আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন ইতিহাসবিখ্যাত শাসক তৈমুর লং।

তৈমুরের নামের সাথে সংযুক্ত 'লং' শব্দটির অর্থ পঙ্গু। তার পঙ্গুত্বের দিকে ইঙ্গিতস্বরূপ তার সাথে এই বিশেষণটি যুক্ত হয়। জানা যায়, তৈমুর ছিলেন শিয়া মতাবলম্বী। তার উত্তরপুরুষদের মধ্যেও এই ধারা দেখতে পাওয়া যায়। তৈমুরের ভূমিকার কারণে অনেক অঞ্চলে শিয়াবাদ বিস্তার লাভ করে; বিশেষত ইরানে। বস্তুত, শিয়ারা যেখানেই ক্ষমতায় বসে সেখানেই জোরপূর্বক শিয়াবাদের বিস্তার ঘটিয়ে যায়।

দুঃখের বিষয় হলো, তৈমুর খানের দিগ্বিজয়ী অভিযান ও সুবিশাল সাম্রাজ্যের কোনো উপকার বিশ্ব লাভ করেনি; বরং বিজিত অঞ্চলসমূহে বিশৃঙ্খলা ও ভাঙনের পরিমাণ কেবল বৃদ্ধিই পেয়েছে। উত্তর মোঙ্গল সাম্রাজ্যে তৈমুরের অভিযানের পর সেখানকার ঐক্য ভেঙে খানখান হয়ে যায়। আগের চেয়ে আরও বেশি ও বড় বড় খণ্ডিত রাষ্ট্রের জন্ম হয়। বিশেষত উসমানি সাম্রাজ্যে তৈমুরের পরিচালিত অভিযানের ক্ষয়ক্ষতি ছিল সীমাহীন। উসমানিদের রক্তে গড়া আনাতোলিয়ার ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য ভেঙে তার জায়গায় ফিরে আসে পূর্বের খণ্ড খণ্ড রাজ্যব্যবস্থা। নিজেদের মধ্যে হানাহানি ও গৃহযুদ্ধ ছাড়া যে ব্যবস্থার আর কোনো ভূমিকা নেই। সেই সাথে ইউরোপে উসমানিদের একের পর এক বিজয়াভিযান চলছিল সুলতান বায়েজিদের নেতৃত্বে। বায়েজিদ হয়ে উঠেছিলেন ইউরোপের দুঃস্বপ্ন। কিন্তু তৈমুর খানের হস্তক্ষেপে ইউরোপ জয়ের প্রচেষ্টা তো বাধাগ্রস্ত হলোই, সাথে প্রায় বিলুপ্তির কাছে গিয়ে পৌঁছেছিল উসমানিদের অস্তিত্ব। (আল্লাহর ইচ্ছায় বায়েজিদপুত্র সুলতান প্রথম মুহাম্মাদের নেতৃত্বে উসমানিরা আবার সংঘবদ্ধ হতে সক্ষম হয়।)

তৈমুরের ধারালো তরবারি সবসময় মুসলিমদের রক্ত ঝরাতেই ব্যবহৃত হয়েছে। তৈমুর খান মুসলিম বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, মুসলিম উম্মাহ যুগ যুগ ধরে ইসলামের অনুসারীদের হাতেই অধিক নিপীড়নের শিকার হয়েছে। তৈমুরের শখ অনুযায়ী কোনো যুদ্ধ জয় করার পর তার সামনে যুদ্ধবন্দিদের সমবেত করা হতো। এরপর তাদের মাথার খুলির স্তূপ দিয়ে পিরামিড তৈরি করা হতো। সেসব দেখে বিকৃত আনন্দ অনুভব করতেন তৈমুর। কখনো বা গর্ত খুঁড়ে পুঁতে ফেলা হতো জ্যান্ত

মানুষ। পরাজিত শাসক ও আমির-উমারাকে অপদস্থ করে তৃপ্তি লাভ হতো তার। এতসব কারণে তৈমুর নামসর্বস্ব মুসলিম হিসেবেই পরিচিত। ইতিহাস তো কেবল তার কুকীর্তির কথাই আমাদের স্মরণ করায়। তার কুকীর্তির ফলে বহু মানুষের চোখে তাতার ও মোঙ্গলরা ধিকৃত। ইসলাম গ্রহণের পরও তাদের ব্যাপারে মানুষের মনে ভয়ানক চিত্র অঙ্কিত হয়ে আছে। ইসলামের শত্রুরা তৈমুর খানের কীর্তিকলাপ দেখিয়ে ইসলামকে বিদূষিত করার চেষ্টা করে থাকে। অথচ তার এসব কর্মকাণ্ডের সাথে ইসলামের ন্যূনতম কোনো সম্পর্ক নেই; বরং বিপরীতে আছে প্রচণ্ড বিরোধ।

তৈমুরের মৃত্যুতে সাম্রাজ্যের ভাঙন

তৈমুর লংয়ের মৃত্যুর পর ঠিক সেই পরিস্থিতিতেই পড়ে তার সাম্রাজ্য, অন্যান্য সাম্রাজ্যে তার কারণে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। তৈমুরের পরিবারে ক্ষমতার কোন্দল শুরু হয়। প্রভাবশালী বিভিন্ন আমির যার যার অঞ্চল নিয়ে স্বাধীন রাজ্যের ঘোষণা দেয়। তবু কোনোরকমে ৯০০ হিজরি (১৪৯৪ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত তৈমুর বংশীয় কেউ কেউ ক্ষমতায় টিকে থাকে। সর্বশেষ সুলতান মাহমুদ ৯০০ হিজরিতে মারা গেলে অবশিষ্ট সাম্রাজ্য নিয়ে তার সন্তানদের গৃহযুদ্ধের সুযোগে উজবেক, সাফাভি ও অন্যান্য গোষ্ঠী মাওয়ারাউন নাহার দখল করে নেয়। তবে হিন্দুস্তানে তৈমুর বংশীয় একটি শাখা আরও কয়েক শতাব্দী রাজত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল, ইতিহাসে যারা মোঘল নামে পরিচিত। সামনে সে সংক্রান্ত আলোচনা আসছে।

এখন আমরা তৈমুর বংশের পতনের পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত পশ্চিম তুর্কিস্তানের উত্থান-পতনের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করব।

শাইবানি শাসন

একটি মোঙ্গল গোত্র। চেঙ্গিস খানের বড় পুত্র জোচি খানের এক সন্তান শুবানের বংশধর। উত্তর মোঙ্গল সাম্রাজ্যের অধিপতি বাতু খান তার ভাই শুবানকে উরাল পর্বতমালার পূর্বাঞ্চল ও সাইবেরিয়ার বিস্তৃত অঞ্চল শাসনের দায়িত্ব দেন। তবে শুবান স্বাধীন শাসক ছিলেন না; বরং উত্তর মোঙ্গল সাম্রাজ্যের রাজধানী সারাইয়ের অনুগত ছিলেন।

দশম হিজরি শতকে মাওয়ারাউন নাহারে তৈমুর বংশের শেষ সুলতান মাহমুদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বলছিল। যে আগুন তৈমুরীয় সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছিল। সে সময় শুবানের বংশধর মুহাম্মাদ শাইবানি নামক ব্যক্তি তৈমুরীয় সাম্রাজ্যের গৃহযুদ্ধকে সুযোগ বিবেচনা করে সাইবেরিয়া থেকে বেরিয়ে পড়েন। তিনি যে বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তার অনেক সদস্য উজবেক জাতির হওয়ায় এটি উজবেক বাহিনী হিসেবে পরিচিতি পায়। তিনি এসে তৈমুরীয়দের ক্ষমতাদ্বন্দ্বের ইতি ঘটিয়ে সমরকন্দ দখল করেন। মুহাম্মাদের সাথে সে সময় সাইবেরিয়া থেকে অনেক গোষ্ঠী তুর্কিস্তান আগমন করে। যারা তখনও রাশিয়ায় রয়ে যায়, তারা তিওমেনের (একটি রাশিয়ান অঞ্চল) বাদশাহ হিসেবে পরিচিতি পায়।

মুহাম্মাদ শাইবানি ৯০৬ হিজরিতে (১৫০০ খ্রিষ্টাব্দে) মাওয়ারাউন নাহারে তার শাসনকার্য সূচনা করেন। সমরকন্দ জয় করে সেটাকে নতুন সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে নির্ধারণ করেন। সে সময় সমরকন্দের পরাজিত শাসক হিন্দুস্তানি শাসক জহিরুদ্দিন বাবরের সহায়তা কামনা করেন। বাবরও ছিলেন তৈমুরের উত্তরসূরি। বাবর সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন এবং মুহাম্মাদ শাইবানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। বাবরকে সহায়তা করে সাফাভিরা। ততদিনে ইলখানিয়া সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে সাফাভিরা পারস্যে সিংহাসন স্থাপন করেছে। কিন্তু এরপরও শাইবানিকে পরাজিত করা সম্ভব হয়নি। বাবরের প্রতিরোধ সত্ত্বেও মুহাম্মাদ শাইবানি সমগ্র মাওয়ারাউন নাহারে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

৯১৬ হিজরির (১৫১০ খ্রিষ্টাব্দের) এক যুদ্ধে মুহাম্মাদ শাইবানি নিহত হন। তারপর ১০০৭ হিজরি (১৫৯৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত প্রায় এক শতাব্দী ধরে শাইবানি বংশের বিভিন্ন নেতা এই অঞ্চল শাসন করে। শেষদিকে এসে শাইবানি শাসকরা দুর্বল হয়ে পড়ে। ৯৯১ হিজরিতে (১৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে) দ্বিতীয় আবদুল্লাহ ক্ষমতায় আরোহণ করার পর তার পুত্র আবদুল মুমিন সাফাভিদের সহায়তায় পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। আবদুল্লাহ তার পুত্রের কাছে পরাজয় বরণ করেন। রাজ্যের সিংহভাগ হাতছাড়া হয়। ১০০৬ হিজরিতে (১৫৯৭ খ্রিষ্টাব্দে) আবদুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন। এক বছর যেতে না যেতেই ১০০৭ হিজরিতে (১৫৯৮ খ্রিষ্টাব্দে) তার পুত্র আবদুল মুমিন নিহত হন। এরপর দেশ থেকে শাইবানি (তথা উজবেক)

প্রতিপত্তি ধুলোয় মিশে যায়। ক্ষমতায় আসে তাদেরই স্বজাতি নতুন এক গোত্র, যারা জানিয়িন নামে প্রসিদ্ধ।

জানিয়া বংশের শাসন

এই শাসকবর্গ শাইবানিদের সমগোত্রীয়। এদের আবাস ছিল আস্ত্রাক্যান রাজ্যে। রুশ দখলদারির পর সেখানকার অনেক আমির হিজরত করে বুখারায় আশ্রয় নেয়। উজবেক শাইবানিদের আমলে তারা পুষ্ট হয়। অবশেষে এই অঞ্চলের ক্ষমতা হস্তগত করতে সক্ষম হয়। ১২০০ হিজরি (১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত প্রায় দুইশ বছর তারা শাসনকার্য পরিচালনা করে। তাদের দীর্ঘ শাসনকালে সমগ্র দেশ কয়েকটি রাজ্যে ভাগ হয়ে যায়। এর মধ্যে বুখারা, ফারগানা, সমরকন্দ, খোয়ারিজম ও তুর্কিস্তানের অন্যান্য রুশ দখলকৃত ভূমি উল্লেখযোগ্য। আমু দরিয়ার পূর্ব তীরে অবস্থিত বলখ, বাদাখশান প্রভৃতি অঞ্চল পরবর্তীকালে আফগানিস্তানের অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়। প্রথমত আমরা রুশ অধিকৃত অঞ্চলগুলোর আলোচনা করব, তারপর আফগান সংক্রান্ত আলোচনায় প্রবেশ করব।

রুশ অধিকৃত তুর্কি অঞ্চলসমূহ

পশ্চিম তুর্কিস্তানে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি রাজ্য গড়ে উঠেছিল। যথা :

খানিয়াতে বুখারা

মাঙ্গিত গোষ্ঠী বুখারা শাসন করে। এই গোষ্ঠীর আবদুর রহিম নামক ব্যক্তি জানিয়িনদের সময়ে বুখারার শাসকপদ লাভ করেন। এরপর তার বংশের মির মাসুম শাহ বিয়ে করেন জানিয়া বংশের শেষ সুলতান আবুল গাজির কন্যাকে। এরপর ১২০০ হিজরিতে (১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দে) বুখারার শাসনক্ষমতা তার অধিকারে আসে। মির মাসুম আফগান অঞ্চলে জানিয়িনদের হারানো অঞ্চলসমূহ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হন। চতুর্দশ হিজরি শতাব্দীর প্রারম্ভকালে বুখারা রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। ১২৮২-১২৮৯ হিজরি (১৮৬৫-১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত সময়ের মাঝে রুশরা বারবার বুখারায় অভিযান চালায়। ১৩২৮ হিজরিতে (১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে) বুখারায় সাইয়িদ মিরের শাসনকালে রুশ বাহিনী তাতে আগ্রাসন চালায়। এরপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। রুশ বাহিনী যুদ্ধে ব্যস্ত হয়ে গেলে বুখারায় তাদের সৈন্যবল কমে যায়। সে সুযোগে সাইয়িদ মির বুখারা রাজ্য স্বাধীন করতে সক্ষম হন। কিন্তু কম্যুনিস্ট বিপ্লবের পর ১৩৩৮ হিজরিতে (১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে) বুখারার পতন হয়। ইসলামের প্রাচীনতম শহরটিতে কম্যুনিস্ট লাল পতাকা উড্ডীন হয়।

খানিয়াতে খোয়ারিজম

ইতিপূর্বে গত হয়েছে, খোয়ারিজম ছিল উত্তর মোঙ্গল সাম্রাজ্য তথা গোল্ডেন হোর্ডের অনুগত একটি প্রদেশ। তৈমুর লং এটি জয় করেন। তার মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য ভেঙে গেলে খোয়ারিজমে শাইবানিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ৯২১ হিজরি (১৫১৫ খ্রিষ্টাব্দ) থেকে সেখানে শাইবানিদের শাসন চলে। একাধিকবার বুখারার শাসকদের সাথে তাদের লড়াই হয়। ১২১৯ হিজরি (১৮০৪ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত এখানে তাদের শাসন টিকে ছিল। মাঝে ১১৫৩ হিজরিতে (১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে) নাদির খানের হাতে রাজ্যের পতন হয়। তবে কিছুদিন পরই আবার রাজত্ব ফিরে পায় তারা। তখন থেকে ১২১৯ হিজরি (১৮০৪ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত টানা শাসন করে। এরপর

দীর্ঘদিন নানা প্রশাসকের হাতে দেশের শাসনভার ছিল। ১২৯০ হিজরিতে (১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে) তৎকালীন আমির মুহাম্মাদ সাইয়িদ আহমাদ খান রুশদের আনুগত্য ঘোষণা করেন। কিন্তু তাদের দাবি অনুযায়ী তখনও তারা স্বাধীন ছিল। যাই হোক, ১৩৩৬ হিজরিতে (১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে) সোভিয়েত বিপ্লবের সময় রুশ কর্তৃত্বে সাময়িক ভাটা পড়ে। কিন্তু এক বছরের মাথায়ই ১৩৩৭ হিজরিতে (১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে) কম্যুনিস্টরা খোয়ারিজম দখল করে নেয়।

খানিয়াতে খোকান্দ (ফারগানা)

১১১২ হিজরিতে (১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে) ফারগানা রাজ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ভারতে মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের উত্তরসূরিদের একটি ধারা এই রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করে। ১২১৫ হিজরিতে (১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে) ফারগানার শাসক আলম খান তাসখন্দকে স্বীয় অঞ্চলের অধীনে আনতে সক্ষম হন। বুখারা ও ফারগানার মাঝে বেশ কয়েকবার যুদ্ধ হয়। ১২৫৫-১২৫৬ হিজরির (১৮৩৯-১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দের) দিকে বুখারার সৈন্যরা ফারগানা দখল করে নেয়। কিন্তু এই দখলদারি স্থায়ী হয়নি। এরপর ১২৯৩ হিজরিতে (১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে) রুশদের হাতে পতনের আগ পর্যন্ত এটি স্বাধীন রাজ্য হিসেবে টিকে থাকে।

তুর্কিস্তানে রুশ আগ্রাসন

মধ্য এশিয়ায় রুশ আগ্রাসনের শিকার হয় প্রায় সমগ্র তুর্কিস্তান। পূর্ব তুর্কিস্তানে চীনা দখলদারির কারণে এই অংশ রুশদের হাতছাড়া হয়। আর আফগানিস্তানে ব্রিটিশ দখলদারির কারণে এখানেও রুশদের বিরত থাকতে হয়। নয়তো মধ্য এশিয়ার মুসলিম অধ্যুষিত প্রায় পুরো অঞ্চলটাই পাচার হয়ে যেত রুশ ভালুকের পেটে।

উত্তর মোঙ্গল সাম্রাজ্যের আলোচনাকালে রাশিয়ান তাতারদের সাথে রুশ সরকারের আচরণ কেমন ছিল, তা উল্লেখ করা হয়েছে। তুর্কিস্তান দখল করেও সেই একই আচরণ করা হয় এ অঞ্চলের মুসলিমদের সাথে। তবে সেই আগ্রাসন তুলনামূলক কম ছিল। কারণ, একে তো খুব কম সময়েই বিশাল অঞ্চল তাদের দখলে চলে আসে। তা ছাড়, রাশিয়ান রাজধানী মস্কো থেকে তুর্কিস্তানের ভৌগোলিক দূরত্বও ছিল অনেক বেশি। অন্যদিকে তাতারদের বসবাস ছিল রাশিয়ার প্রাণ ভলগা নদীর উপকূলে এবং

ককেশাস পর্বতমালার উত্তরে। এজন্য রুশ নির্যাতনের মাত্রা তাদের ওপর ছিল অন্যদের তুলনায় সীমাহীন।

দুঃখজনক ব্যাপার হলো, তুর্কি, তাতার, ককেশাসিয়ানসহ রাশিয়ান মুসলিমরা নিজেদের করণীয় সম্পর্কে ঐক্যবদ্ধভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। কেউ চেয়েছে পূর্ণ স্বাধীনতা, আবার কেউ চেয়েছে স্বায়ত্তশাসন। কারও চাওয়া ছিল সমাজতন্ত্র, কারও চাওয়া সাম্যবাদ। প্রত্যেকেই ছিল ভিন্ন ভিন্ন পথের অনুসারী। অন্যদিকে ক্ষমতায় পৌঁছার জন্য বিভিন্ন সময় রুশ নেতারা মুসলমানদের দেখাতো হাজারো স্বপ্ন। আকাশ কুসুম স্বপ্নে বিভোর মুসলিম নেতারা তাদের মিথ্যা আশ্বাসেই আশ্বস্ত বোধ করত। কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে আশ্বাস দানকারীরা মুসলিমদের শুধু নির্যাতনের নিত্যনতুন প্রকারভেদই দেখিয়েছে।

এই মুসলমানরা অতীত থেকে শিক্ষা নিতে যেন ব্যর্থ হয়েছিল। তিক্ত অভিজ্ঞতার পরও বারবার কেউ সরকারবিরোধী স্লোগান তুললেই তার পেছনে ছুটত। অথচ পরখ করে দেখত না এসব আন্দোলন সঠিক ইসলামি পন্থায় পরিচালিত কি না। মুক্তির জন্য অনেকে দ্বীনি বিষয়ে শিথিলতা অবলম্বন করতে দ্বিধাবোধ করত না। এজন্য দেখা গেছে, যাদের প্রতি অগাধ বিশ্বাস নিয়ে তারা দ্বীনকে অমান্য করেছিল, ক্ষমতা পেয়েই এরা তাদের ভুলে যায়। উল্টো নিজেরাই হয়ে ওঠে নির্যাতক। এ ছাড়াও রুশ মুসলিমদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল অজ্ঞতা, তাদের মধ্যে বিরাজ করছিল ইসলামি জ্ঞানের ভয়াবহ শূন্যতা। এ ক্ষেত্রে রাশিয়ান কুটপ্রচেষ্টাগুলো সফলতার মুখ দেখেছিল। সরকারের তরফ থেকে অনবরত ইসলামের বিকৃত রূপ প্রচার করা হতো। পত্রপত্রিকা, রেডিও, মিডিয়া, নাটক-সিনেমা, সভা-সমাবেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইসলামের কটাক্ষ, নিন্দা, সমালোচনা ব্যাপকহারে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের মগজধোলাই চলতে থাকে। সামরিক আগ্রাসনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আগ্রাসনও ভয়াবহ আকার ধারণ করে।

বহুমুখী আগ্রাসনের মুখেও মুসলিমদের প্রতিরোধ-সংগ্রাম অব্যাহত ছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ১৩২২ হিজরি সনে রুশ সরকারের বিরুদ্ধে উজবেকদের বিদ্রোহ ও জিহাদ ঘোষণা। কিন্তু এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৩৩৬ হিজরিতে (১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে) কম্যুনিস্ট বিপ্লবের পর উজবেকরা আবার স্বাধীনতা ঘোষণা করে। খোকজু শহরকে রাজধানী করে তুর্কিস্তানে

স্বাধীন সরকার গঠন করা হয়। কিন্তু রুশ সৈন্যরা তাদের নির্মমভাবে প্রতিহত করে। স্বাধীনতার স্বপ্ন মাটিতে মিশিয়ে দিতে নির্যাতনের স্টিম রোলার চালায়।

তুর্কিস্তানের রাজনৈতিক বিভক্তি

সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল অনেক স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের সমষ্টি। তুর্কিস্তানি মুসলিমদের ঐক্য ভেঙে দিতে ও নিজেদের দখলদারি পোক্ত করতে সোভিয়েত সরকার এখানে পাঁচটি প্রজাতন্ত্র গঠন করে। এসব প্রজাতন্ত্রের সীমানার মধ্যেও আবার কিছু অঞ্চলকে প্রদেশ হিসেবে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করার সুযোগ করে দেয়। যথা:

কাজাখস্তান প্রজাতন্ত্র

এটি প্রাচীন মাওয়ারাউন নাহার তথা ট্রান্সঅক্সিয়ানার অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং তুর্কিস্তানের অংশ। এটি তথাকার বৃহত্তম অঞ্চল। এর আয়তন প্রায় ২৭ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। তৎকালীন রাজধানী ছিল আলমাটি। এই প্রজাতন্ত্রে খ্রিষ্টান জাতিগোষ্ঠীর পাল্লা ভারী করতে রাশিয়া ও ইউক্রেন থেকে বিপুল পরিমাণ মানুষকে এখানে অভিবাসী করা হয়। সেই প্রচেষ্টার ফল হিসেবে একসময় মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৪ ভাগ মানুষ খ্রিষ্টানে গিয়ে পৌঁছে। এটি ছিল রাশিয়ার বুকে একমাত্র মুসলিম প্রজাতন্ত্র, যেখানে পারমাণবিক পরীক্ষাগার ছিল।

উজবেকিস্তান প্রজাতন্ত্র

তুর্কিস্তানের বৃহত্তম বিভিন্ন শহর এখানেই অবস্থিত। যেমন, সমরকন্দ, প্রজাতন্ত্রের রাজধানী তাসখন্দ, বুখারা, ফারগানা ইত্যাদি। এই প্রজাতন্ত্রের সীমানায় কয়েকটি স্বশাসিত প্রদেশও ছিল। যেমন কারা কালপাক প্রদেশ, যার রাজধানী ছিল নুকুস শহর। খোয়ারিজম শহরটিও এই প্রদেশেই অবস্থিত।

তুর্কমেনিস্তান প্রজাতন্ত্র

তুর্কমেনিস্তানের রাজধানী আশকাবাদ। ঐতিহাসিক মার্ভ নগরী এখানেই অবস্থিত। ১২৯৭-১২৯৮ হিজরির (১৮৭৯-১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ) তুর্কমেন যুদ্ধের পর এই অঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা রুশদের দখলে চলে যায়।

কিরগিজস্তান প্রজাতন্ত্র

বিজেতা রুশ সেনাপতির নামে রুশ আমলে এর রাজধানীর নাম ছিল ফ্রুঞ্জ। স্বাধীনতার পর রাজধানী হয় বিশকেক। ফারগানার কতকাংশ এ অঞ্চলেও অবস্থিত। আগ্রাসনের সময় এই অঞ্চলের এক তৃতীয়াংশের বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। উল্লিখিত চার প্রজাতন্ত্রের সিংহভাগ জনগণ তুর্কি জনগোষ্ঠীর।

তাজিকিস্তান প্রজাতন্ত্র

এই প্রজাতন্ত্রের অধিকাংশ মানুষ পারসিক বংশোদ্ভূত। এর রাজধানী দুশনাবে। তাজিকিস্তানের সীমানায় ছিল স্বায়ত্তশাসিত গোর্নো বাদাখশান প্রদেশ।

রাশিয়া থেকে স্বাধীনতা লাভ

তুর্কিস্তানে প্রবলভাবে রুশ আগ্রাসনের বিরোধিতা অব্যাহত ছিল। কিন্তু সোভিয়েত সরকার সেখানে মিডিয়া ব্ল্যাকআউট চাপিয়ে দেওয়ায় সেসব খবর বাইরে প্রকাশ পেত না। ১৪০৯ হিজরিতে (১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে) কম্যুনিস্টদের পতন হলো। ১৪১১ হিজরিতে (১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে) ভেঙে গেল তৎকালীন সুপার পাওয়ার দেশটি। সেই সাথে স্বাধীনতা লাভ করে এ পাঁচটি মুসলিম প্রজাতন্ত্র। তারপর থেকে তুর্কিস্তান মুসলিম বিশ্বের সাথে সেতুবন্ধন করতে সক্ষম হয়। তারা অন্যান্য মুসলিম দেশের সাথে সুসম্পর্ক তৈরির কাজ শুরু করে। বিশেষত তুরস্কের সাথে তাদের মিত্রতা গড়ে ওঠে। পারস্পরিক ভাষা ও বংশীয় সাদৃশ্য ছিল এ ক্ষেত্রে বিশেষ কারণ। পাশাপাশি কমনওয়েলথের সূত্রে রাশিয়ার সাথেও তাদের স্বাভাবিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এভাবে তুর্কি দেশগুলোর পরিস্থিতি অনেকাংশে স্বাভাবিক হয়ে আসে। কিন্তু তাজিকিস্তানে শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। তাজিক প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতা থেকে হটাতে বিরোধীরা অস্ত্র ধারণ করে। রুশপন্থী এই প্রেসিডেন্টের পক্ষে ছিল রাশিয়ার সমর্থন।

স্বাধীন দেশ হিসেবে অভিবাসীদের নিয়ে বেশ সমস্যায় পড়ে কাজাখস্তান। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশটিতে ততদিনে মুসলমানদের সংখ্যা নেমে আসে ৪৫%। রুশ-ইউক্রেনীয় অভিবাসীদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৪%। স্বাধীনতার পরপরই আমেরিকা কাজাখস্তানকে সমস্ত পারমাণবিক কার্যক্রম বন্ধ করে

দিতে বাধ্য করে। সেই সাথে রাশিয়ার ফেলে যাওয়া পারমাণবিক অস্ত্রগুলোও ফেরত দিতে বাধ্য করা হয়।

স্বাধীনতা লাভের পরও তুর্কিস্তানে রাশিয়া কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চেষ্টা করে। তাজিক গৃহযুদ্ধে জনগণের অপছন্দের প্রেসিডেন্টকে রুশদের সমর্থন দেওয়াটা তার অন্যতম প্রমাণ।

আফগানিস্তান

আফগানিস্তানের বর্তমান মানচিত্র খুব পুরোনো নয়। দীর্ঘকাল থেকে আফগানিস্তানের প্রদেশগুলো পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। কিছু অংশ ছিল ইলখানিয়া সাম্রাজ্যের নিকট, কিছু হিন্দুস্তানের নিকট, কিছু উজবেকদের নিকট।

তৈমুর সাম্রাজ্য আফগানের ওপর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। কিন্তু খুব দ্রুতই তাদের হাতছাড়া হয়ে যায় আফগানিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল। বিভক্ত রাজ্যগুলোর একটি ছিল হেরাত। যা খোরাসানের অধীনতায় প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই রাজ্য শাসন করত তৈমুরের উত্তরসূরিদের একটি অংশ। আরও দুটি রাজ্য হলো কাবুল ও গজনি। ৯৩২ হিজরির দিকে এগুলো শাসন করত হিন্দুস্তানের মোঘল বাদশাহ বাবর। আরেকটি রাজ্য হলো কান্দাহার। এখানে সাফাভিদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সাফাভিদের হাত থেকে চলে যায় উজবেকদের হাতে। এরপর মোঘলরা ১০২১ হিজরিতে (১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে) কান্দাহার দখল করে। তারপর ১০৩৮ হিজরিতে (১৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে) সাফাভিদের হাতে তুলে দেয় এর শাসনক্ষমতা।

আফগানিস্তানে সাফাভি শাসন

আফগানিস্তানের অধিকাংশ অঞ্চল সাফাভিরা দখল করতে সক্ষম হয়। তবে স্থির হয়ে আফগানদের শাসন করার সুযোগ তাদের তেমন একটা হয়নি। বিভিন্ন স্থানে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়। এর মধ্যে কান্দাহার ও হেরাতের বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য। ১১২০ হিজরিতে (১৭০৮ খ্রিষ্টাব্দে) কান্দাহারে মির ওয়াইস নামক বিদ্রোহী নেতা সাফাভি গভর্নরকে অপসারণ করে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তার মৃত্যুর পর ক্ষমতার উত্তরাধিকার লাভ করেন তার পুত্র মাহমুদ। কিন্তু মাহমুদের বয়স কম হওয়ায় তার চাচা তাকে হটিয়ে ক্ষমতায় আসেন। তাকে সমর্থন করে সাফাভিরা। কিন্তু মাহমুদ কিছুটা বড় হয়েই চাচাকে পরাজিত করে কান্দাহারের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেন।

এদিকে হেরাতের ঘটনা আরও বড়। কান্দাহারের বিদ্রোহ হেরাতের জনগণের মনে সাহস সঞ্চার করে। তারা সাফাভিদের ওপর চড়াও হওয়ার

আয়োজন করে। দুররানি (আবদালি) গোত্রের আসাদুল্লাহ সাফাভিদের হাত থেকে হেরাত দখল করে নেন। এরপর ক্ষমতায় আসেন মির মাহমুদ দুররানি। তিনি সাফাভি সাম্রাজ্যে প্রবেশ করেন এবং তাদের পরাজিত করতে সক্ষম হন। সাফাভিদের অধিকাংশ অঞ্চলই দুররানিদের করায়ত্ত হয়।

১১৩৫ হিজরিতে (১৭২২ খ্রিষ্টাব্দে) সাফাভি রাজধানী ইস্পাহানে প্রবেশ করে আফগানিরা। উত্তরের কিছু অঞ্চল ছাড়া সমগ্র রাজ্য হাতছাড়া হয় সাফাভিদের। সাফাভিরা আফগানদের বিরুদ্ধে রুশ সাহায্য কামনা করে। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ছাড়ে না রাশিয়া। সাহায্যের নাম করে সাফাভিদের উত্তর অঞ্চল দখল করে নিতে শুরু করে তারা। এবার দৃশ্যপটে হাজির হয় উসমানিরা। মুসলিম ভূখণ্ডে রাশিয়ার অগ্রযাত্রা রোধ করে তারা। বাধ্য হয়ে উসমানিদের সাথে সন্ধি করে রাশিয়া। উত্তরাঞ্চল নিয়ে হয় ত্রিপক্ষীয় বোঝাপড়া।

এ সময় আফগান নেতা মির মাহমুদের মস্তিষ্কে দুর্বলতা দেখা দেয়। তাকে অব্যাহতি দিয়ে ক্ষমতায় বসানো হয় তার চাচাতো ভাই আশরাফ বিন আবদুল আজিজকে। আশরাফ উসমানিদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার মনস্থ করেন। কারণ, সাফাভি উত্তরাঞ্চল নিয়ে উসমানি সালিস তার মনঃপূত ছিল না। কিন্তু এ সময় ময়দানে অবতীর্ণ হন সাফাভি সমর্থক ডাকাত সর্দার থেকে পারস্যের অধিপতিতে পরিণত হওয়া নাদির খান। তিনি আফগানদের সাফাভি সীমানা থেকে তাড়িয়ে দেন। পর্যায়ক্রমে আফগানিদের সমগ্র রাজ্য হস্তগত হয় তার।

আফগানিস্তান রাষ্ট্রের উৎপত্তি

১১৬০ হিজরিতে নাদির খানের মৃত্যুর পর আফগানিরা কান্দাহার দখল করে নেয়। দুররানি গোত্রভুক্ত আহমাদ শাহ আবদালি তখন তেজস্বী আফগান নেতা। তিনি আফগানিদের একত্র করে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তার রাজত্বই আফগান রাজ্য নামে পরিচিতি লাভ করে।

দুররানি শাসন

দুররানিরা দুই শতাব্দীর বেশি সময় আফগান শাসন করে। দুররানি শাসক তালিকার মধ্যে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন :

আহমাদ শাহ

তিনি এই শাসক পরিবারের প্রথম পুরুষ এবং আফগানিস্তান রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। আহমাদ শাহ আবদালি আফগানিস্তান ছাড়াও মুলতান, লাহোর ও কাশ্মীর জয় করেন। শিখদের বিরুদ্ধেও তিনি যুদ্ধ করেন। তার সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল কান্দাহার। ১১৮৭ হিজরিতে (১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে) তার ইনতেকাল হয়। ক্ষমতায় বসেন তার পুত্র তৈমুর শাহ।

তৈমুর শাহ

তৈমুর শাহ ও তার ভাই সুলাইমানের মাঝে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। তৈমুর রাজধানী কান্দাহার দখল করতে সক্ষম হন। সুলাইমানকে হত্যা করেন এবং নিজের রাজধানী হিসেবে কাবুলকে নির্বাচন করেন। শিখরা মুলতান দখল করে নিয়েছিল। তৈমুর তাদের দমন করে ১১৯৬ হিজরিতে (১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে) মুলতান পুনরুদ্ধার করেন। তার সময়ে সিন্ধের শাসকরা স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে। তিনি বুখারার শাসক মাসুমের সাথে লড়াই করে তাকে পরাস্ত করেন। কাশ্মীরে বিদ্রোহ দেখা দিলে সেটা দমন করতে সক্ষম হন। এদিকে ইংরেজরা প্রতিনিয়ত হিন্দুস্তানে শিখদেরকে তৈমুরের সাথে বিদ্রোহ করতে উদ্বুদ্ধ করে, আর ইরানে উদ্বুদ্ধ করে কাজারদের। ১২০৭ হিজরিতে (১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দে) তার ইনতেকাল হয়। সিংহাসনে বসেন তার পুত্র জামান শাহ।

তৈমুরপুত্রদের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব

জামান শাহ তৈমুরের মৃত্যুর পর থেকে ১২১৫ হিজরি (১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ১২১৫ হিজরিতে তার ভাই মাহমুদ তাকে কারাবন্দি করে ক্ষমতা দখল করে নেন। কিন্তু অপর ভাই শুজাউল মুলক পেশোয়ার থেকে নিজেকে আফগানের শাসক ঘোষণা করেন। তারপর এসে কাবুল জয় করেন। মাহমুদকে হটিয়ে রাজধানী দখল করে নেন এবং কারাগার থেকে জামান শাহকে উদ্ধার করেন। জামান শাহ ততদিনে দৃষ্টিহীন হয়ে গেছেন। ১২২৪ হিজরিতে (১৮০৯ খ্রিষ্টাব্দে) মাহমুদ ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হন। মাহমুদ হত্যা করেন ফাতাহ খান নামের তার এক ভাইকে। মাহমুদের বিরুদ্ধে তখন যুদ্ধ ঘোষণা করেন দোস্ত মুহাম্মাদ নামে তাদের আরেক ভাই। দোস্ত মুহাম্মাদ কাবুল জয় করে নেন। আফগান গৃহযুদ্ধের সুযোগে শত্রুরা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ইরানিরা হেরাত দখল করে নেয় এবং শিখরা হিন্দুস্তানের অঞ্চলগুলো দখল করে নেয়। শুজাউল মুলক ইংরেজদের সাহায্য কামনা করেন। ইংরেজরা প্রবল শক্তিতে কাবুলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১২৫৫ হিজরিতে (১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে) কাবুল দখল করে শুজাউল মুলককে ক্ষমতায় বসায় ইংরেজরা। দোস্ত মুহাম্মাদ ইংরেজের কাছে আত্মসমর্পণ করে। তাকে বাংলা অঞ্চলে নির্বাসিত করা হয়।

ইংরেজরা আফগান ত্যাগ করার মুহূর্তে মুহাম্মাদ জাই ও আকবর খান বিন দোস্ত মুহাম্মাদের নেতৃত্বে আফগানিরা তাদের ওপর আক্রমণ করে। ইংরেজ বাহিনীর যারা ছিল প্রায় সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যুদ্ধে শুজাউল মুলক নিহত হয়। ইংরেজরা বাধ্য হয় দোস্ত মুহাম্মাদকে রাজত্ব ফিরিয়ে দিতে।

দোস্ত মুহাম্মাদ খান

দীর্ঘ সময় ধরে ছড়িয়ে পড়া বিশৃঙ্খলা দমন করে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই ছিল দোস্ত মুহাম্মাদের প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে তিনি তার ভ্রাতৃবর্গ ও সন্তানদের রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আসীন করেন। বহিঃরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে ইংরেজ ও রুশদের দিকে সন্ধির হাত বাড়িয়ে দেন। তবে ইংরেজরা তার ওপর ক্ষিপ্ত ছিল। হিন্দুস্তানে ইংরেজবিরোধী বিভিন্ন তৎপরতা দমনে আফগানদের কোনো সহায়তা না

পাওয়াই ছিল মূল কারণ। তাই ইংরেজরা আফগানে আগ্রাসনের প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু তারা তীব্র প্রতিরোধের মুখে পড়ে এবং আফগানিরা ইংরেজদের স্বপ্ন ধূলিসাৎ করে দেয়। তারা আফগানে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়। দোস্ত মুহাম্মাদ ১২৮০ হিজরিতে (১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে) ইনতেকাল করেন। তার উত্তরাধিকার লাভ করেন তার পুত্র শের আলি।

শের আলি ও ইংরেজদের আফগানিস্তান দখল

বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে ইংরেজরা বারবার আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাচ্ছিল। যেমন হিন্দুস্তানে আক্রমণকারী আফগান গোত্রগুলোকে দমন করতে গিয়ে কিংবা আফগানে রুশ আগ্রাসন ঠেকাতে গিয়ে ইংরেজরা বারবার আফগানে প্রবেশ করছিল। এজন্য শের আলি মনে করলেন ইংরেজ ঠেকাতে রুশদের সাথে মিত্রতা করা উচিত। তাই তিনি রুশদের স্বাগত জানান, আর বিতাড়িত করেন ইংরেজদের। ফলত ইংরেজরাও চূড়ান্ত আক্রমণে যায়। ১২৯৫ হিজরিতে (১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে) তারা আফগানিস্তান দখল করে নেয়। এর পরের বছর শের আলি মৃত্যুবরণ করেন।

ইয়াকুব বিন শের আলি

পিতার মৃত্যুর পর ক্ষমতায় আরোহণ করেন ইয়াকুব। সে সময় দেশে মূলত ইংরেজ শাসন চলছিল। তাই ইয়াকুবের ইচ্ছা ছিল ইংরেজদের সাথে তাল দিয়ে চলার। কিন্তু আফগান জনগণ তার মনোভাব প্রত্যাখ্যান করে। তিন বছর ক্ষমতায় থাকার পর ইয়াকুব পদত্যাগে বাধ্য হন। কারণ, সে সময় আফগান-ইংরেজ বিরোধ তুঙ্গে। আফগানিরা কাবুলে এক ইংরেজ পদস্থ অফিসারের ওপর হামলা করে এবং তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলে। সারা দেশেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে। ফলে ইংরেজরা আফগান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। আফগানদের সাথে সন্ধিতে আবদ্ধ হয় ইংরেজ শাসকরা। চুক্তি অনুযায়ী আফগানের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তবে পররাষ্ট্র বিষয়ক সিদ্ধান্ত ইংরেজদের হাতে থাকে।

আবদুর রহমান

ইংরেজদের দেশত্যাগের পর তিনি ক্ষমতায় বসেন। আবদুর রহমান হলেন দোস্ত মুহাম্মাদের এক পুত্র আফজালের সন্তান। তার শাসনকালে তথা ১৩০২ হিজরিতে (১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে) রাশিয়া হেরাত দখল করার চেষ্টা করে। তখন ইংরেজরা দ্রুত তাদের গতিরোধ করে। ইংরেজ-রুশ সন্ধি হয়, যেটা পিটার্সবার্গ চুক্তি নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। চুক্তি অনুযায়ী ঠিক হয়, রাশিয়া খোরাসানের সীমানায় দখলি অঞ্চল তুর্কমেনিস্তান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে এবং তা অতিক্রম করে আফগানের দিকে অগ্রসর হবে না। কিন্তু তারা কিছুদিন পরই চুক্তি ভঙ্গ করে ১৩১৩ হিজরিতে (১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে) বাদাখশানে অভিযান চালায়। আবার ইংরেজদের সাথে সন্ধি হয়। তখন বাদাখশানকে আফগানের অংশ হিসেবে মেনে নেয় রাশিয়া। সে সময় আফগান ও রাশিয়ার সীমান্ত চিহ্নিত করে দেওয়া হয়।

শের আলির চাচাতো ভাই আইয়ুব, যিনি ইরানে পালিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি সৈন্যসামন্ত জোগাড় করে আফগান আক্রমণের আয়োজন করেন। প্রাথমিক সফলতা হিসেবে তিনি কান্দাহারে প্রবেশ করেন। কিন্তু আবদুর রহমান তাকে পরাজিত করে পুনরায় ইরান থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হন। একইভাবে আবদুর রহমানের চাচাতো ভাই ইসহাক খান, যিনি আফগানের উত্তরাঞ্চলীয় অধিপতি ছিলেন, তিনিও কাবুল দখল করার চেষ্টা করেন। কিন্তু আবদুর রহমান তাকেও পরাস্ত করেন। ইসহাক রুশ সহায়তায় পালিয়ে সমরকন্দ গিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন। আবদুর রহমান ১৩১৯ হিজরিতে (১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে) ইনতেকাল করেন।

হাবিবুল্লাহ খান

আবদুর রহমানের মৃত্যুর পর তার পুত্র হাবিবুল্লাহ খান ক্ষমতা লাভ করেন। তার সময়ে ইংরেজদের তৎপরতা অনেক বৃদ্ধি পায়। তবে রাশিয়া ও ইংরেজ যৌথভাবে আফগানের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। কিছুদিন পর বেজে ওঠে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ডঙ্কা। উসমানিরা যুদ্ধে আফগানিদের পাশে পাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু হাবিবুল্লাহ খান উসমানিদের পাশে না দাঁড়িয়ে ইংরেজদের সহায়তা করেন। আফগান জনগণ এর প্রতিশোধ নিতে ১৩৩৮ হিজরিতে (১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে) হাবিবুল্লাহ খানকে হত্যা করে।

আমানুল্লাহ খান

হাবিবুল্লাহ খানের পুত্র আমানুল্লাহ খান। পিতার মৃত্যুর পর ক্ষমতায় আরোহণ করেন তিনি। ক্ষমতায় বসে বাদশা উপাধি ধারণ করেন। তার সময়ে অকুতোভয় সেনাপতি মুহাম্মাদ নাদির খানের[১৪] নেতৃত্বে আফগানিরা ইংরেজদের চরমভাবে পরাজিত করে। সমগ্র আফগান থেকে ইংরেজদের তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয় তারা। পরাজিত হয়ে ইংরেজরা আফগানদের কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়। কিন্তু শত্রুমুক্ত হয়ে আমানুল্লাহ ভোগবিলাসিতার প্রতি ঝুঁকে পড়েন। ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রতি তার মুগ্ধতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পুরোদমে ইউরোপীয় সংস্কৃতি অনুসরণ করতে থাকেন। ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক এমন জিনিসও বাদ যায় না তার থেকে। ইউরোপ ভ্রমণে গিয়ে তিনি দীর্ঘদিন কাটাতে শুরু করেন। অন্যদিকে বিপদমুক্ত থাকতে মুহাম্মাদ নাদির খানকে প্যারিসে রাষ্ট্রদূত করে পাঠিয়ে দেশ থেকে দূরে সরিয়ে দেন।

পাশ্চাত্যের খোলামেলা জীবন তাকে আকৃষ্ট করে। নিজের পরিবারে তিনি বেপর্দাময় জীবনের প্রয়োগ ঘটান। কিন্তু তার পরিবারের মহিলারা পর্দা ছেড়ে খোলামেলা চলাচল শুরু করলে আফগানি জনগণ তার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এতে আমানুল্লাহ আরও বেপরোয়া হয়ে যান। তিনি আফগানি পোশাক বর্জন করে ইউরোপীয় পোশাক পরিধানের আদেশ জারি করেন। তার এই পদক্ষেপে তেতে ওঠে আফগানি জনগণ। সেই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে সুযোগসন্ধানী এক লোক দৃশ্যপটে হাজির হয়। বাজি সাকা নামের এই ব্যক্তি কিছু স্বার্থান্বেষী লোক ও কিছু ডাকাতকে সমবেত করে একটি বাহিনী দাঁড় করায়। এই বাহিনীর সাহায্যে সে কাবুল জয় করে নেয়। আমানুল্লাহকে ক্ষমতা ত্যাগ করে তার ভাই ইনায়াতুল্লাহর হাতে তুলে দিতে বাধ্য করে। আমানুল্লাহ তখন দেশ ছেড়ে ব্রিটেন চলে যান, ভোগবিলাসে বাকি জীবন কাটিয়ে দেওয়ার আশায়।

---

[১৪]. তিনি আফশারি শাসনের প্রধান পুরুষ নাদির খান নন। তার জীবনকাল ১৬৯৮-১৭৪৭ খ্রিষ্টাব্দ। পক্ষান্তরে বর্তমানে আলোচিত নাদির খানের জীবনকাল ১৮৮৩-১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দ। -সম্পাদক

ইনায়াতুল্লাহ

তার সময়ে দেশে বাজি সাকা ও তার ডাকাত বাহিনীর উপদ্রব খুব বেড়ে যায়। বাজি নিজেকে আফগানদের বাদশাহ দাবি করতে শুরু করে এবং নাম ধারণ করে হাবিবুল্লাহ গাজি। সারাদেশে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। ইনায়াতুল্লাহ এসব নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হন। এ সময় আফগান পরিস্থিতিতে প্রবেশ করেন মুহাম্মাদ নাদির খান। ইংরেজদের সাথে তার বীরত্বগাথা সবার জানা ছিল। বিশেষত তিনি শাসক পরিবারেরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সব মিলিয়ে জনগণ তাকে পেয়ে খুশি মনে গ্রহণ করে। ১৩৪৮ হিজরিতে (১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি আফগানের ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

মুহাম্মাদ নাদির খান

ক্ষমতায় বসেই তিনি প্রথমে বাজি সাকাকে বন্দি করে ফাঁসিতে ঝুলান। দেশজুড়ে সংস্কার অভিযান চালান। অত্যাচার, অন্যায়, ঘুষ-দুর্নীতি দমন করেন। অসাধু কর্মে জড়িত কর্মকর্তাদের বরখাস্ত করেন। অবশেষে বরখাস্ত এক কর্মকর্তার সন্তানের হাতে তাকে জীবন দিতে হয়। তিনি ইনতেকাল করেন ১৩৫২ হিজরিতে (১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে)। এরপর ক্ষমতা লাভ করেন তার পুত্র মুহাম্মাদ জহির শাহ।

মুহাম্মাদ জহির শাহ

মাত্র ১৯ বছর বয়সে ক্ষমতা লাভ করেন। গোলযোগপূর্ণ সময়ে তার পক্ষে আফগান শাসন করা সম্ভব হতো না, যদি না মরহুম পিতার সহযোগীরা তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত। পিতার বন্ধুদের সহযোগিতায় ১৫ বছর নির্বিঘ্নে কেটে যায়। কিন্তু এরপর ঘটে বিপত্তি। জহির শাহ ততদিনে পোক্ত হন এবং ক্ষমতার মোহে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েন। তিনি তার উপদেষ্টা ও সহযোগীদের বিতাড়িত করেন। ধীরে ধীরে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হতে থাকেন। ১৩৭৯ হিজরিতে (১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে) এক রাজকীয় ফরমান জারি করেন, যেখানে নারীদের খোলামেলা চলাফেরার অনুমতি প্রদান করা হয়। পশ্চিমা চালচলনের অন্ধ ভক্ত অনেক পরিবার তার ডাকে সাড়া দেয়। সেসব ঘরের নারীরা হিজাবমুক্ত হয়ে চলাফেরা শুরু করে।

খ্রিষ্টান রাষ্ট্রসমূহের জন্য আফগানিস্তানের দুয়ার খুলে যায়। রাশিয়াকে আফগানে তৎপরতা বৃদ্ধি করার সুযোগ দেওয়া হয়। রুশরা আফগানে

নিজেদের সহযোগী ও বন্ধুর খোঁজে নামে। অবশেষে প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মাদ দাউদের মধ্যেই বন্ধুত্ব করার উপযুক্ত গুণাবলি খুঁজে পায়। সে সময় দাউদ জহির শাহের বোনকে বিয়ে করে। জহির শাহ অনুভব করে যে দাউদ তার ক্ষমতার জন্য হুমকি হতে যাচ্ছে। তাই তিনি দাউদকে অব্যাহতি দিয়ে দেন। তখন দাউদ গোপনে ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। এদিকে কম্যুনিস্টরা দেশজুড়ে তাদের শৌর্য প্রদর্শন শুরু করে। মূলত বিশ্ব তখন দুটি ব্লকে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। দুই পরাশক্তির খেলা চলছিল তখন। পশ্চিমা ব্লকের নেতৃত্বে মার্কিনিরা। আর প্রাচ্য ব্লকের নেতৃত্বে রুশরা। আফগানিস্তান পড়ে যায় রুশ ব্লকে। তাই রুশরা আফগানে পূর্ণ ক্ষমতা খাটাতে উঠে পড়ে লাগে। ঠিক সে সময় আফগানের মুসলিম সমাজ রাশিয়া থেকে আসন্ন বিপর্যয় সম্পর্কে সতর্ক হয়ে ওঠে। দেশে রুশ গোয়েন্দা তৎপরতা আফগানিদের ষষ্ঠেন্দ্রিয়তে অশুভ সংকেত পাঠাতে শুরু করে।

মুসলিম ও কম্যুনিস্টদের মাঝে বেশ কয়েকবার সংঘর্ষ বেধে যায়। কম্যুনিস্টরা রাশিয়া ও চীনের প্রকাশ্য সমর্থন এবং লড়াইয়ে অধিক সক্ষমতা নিয়েও অধিকাংশবার মুসলিমদের হাতে পরাজিত হয়।

কম্যুনিস্ট শাসন

মুহাম্মাদ দাউদ

১৩৯৩ হিজরি (১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দ)। জহির শাহ তখন ইতালিতে। মুহাম্মাদ দাউদ কম্যুনিস্ট আন্দোলনকারী ও রুশ সরকারের সমন্বিত প্রচেষ্টায় একটি সামরিক বিপ্লব সংঘটিত করেন। দেশের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব নিয়ে নেন দাউদ। রাজতন্ত্র বিলুপ্ত করে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন আফগানিস্তানে। নিজে হন প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট। মসনদে বসেই দাউদ প্রথমে ইসলামি আন্দোলনসমূহের কণ্ঠরোধ করতে শুরু করেন।

কিছুদিন যেতেই দাউদ-রুশ সম্পর্কে চিড় ধরে। দাউদের ধারণা ছিল ক্ষমতায় যাওয়ামাত্রই দেশের একমাত্র হর্তাকর্তা হবেন তিনি। কিন্তু রুশদের পরিকল্পনা আরও গভীর। তারা দাউদের মাধ্যমে আফগানকে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র বানানোর পথে একটি সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করে মাত্র। সারা দেশে গুপ্তহত্যা বেড়ে যায়। গোলযোগ সৃষ্টি করে বার্তা দেওয়া হতে থাকে যে, আফগানিস্তান নিজের স্বাধীন ইচ্ছামতো চলবে না। দাউদ বুঝতে পারে, তার দিন ফুরিয়ে আসছে। তাই দ্রুত পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে কম্যুনিস্ট নেতাদের কারাবন্দি করতে আরম্ভ করেন। নুর মুহাম্মাদ তারাকি, হাফিজুল্লাহ আমিন, বাবরাক কারমাল এরা সবাই বন্দি হয়। কিন্তু আশঙ্কাজনক সবাইকে গ্রেপ্তার করার আগেই তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। ১৩৯৮ হিজরিতে (১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে) কম্যুনিস্ট পার্টির এক নেতা মুহাম্মাদ গোলাপ ও দাউদের বিপ্লবের একসময়ের অন্যতম সহযোগী গুরুত্বপূর্ণ কম্যুনিস্ট নেতা আবদুল কাদিরের নেতৃত্বে বিপ্লব সংঘটিত হয়। এটি এপ্রিল বিপ্লব নামে পরিচিত। কারাগার থেকে কম্যুনিস্ট নেতাদের মুক্ত করা হয়। কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা নুর মুহাম্মাদ তারাকিকে দেশের প্রেসিডেন্ট বানানো হয়।

নুর মুহাম্মাদ তারাকি

নুর মুহাম্মাদ ক্ষমতায় আরোহণ করেই ভয়াবহ অরাজকতা শুরু করেন। রক্তপাত, জীবনহানি হয়ে ওঠে নিত্যদিনের ঘটনা। কম্যুনিজম কী জিনিস, তা হাড়ে হাড়ে টের পেতে শুরু করে জনগণ। একদিনে ১৫ হাজার লোক হত্যা করেন নুর। দাউদের সামনে তার ২৯ জন বংশধরকে

হত্যা করা হয়। এরপর তাকে ও পরিবারের অন্য সদস্যদের হত্যা করা হয়। মুসলিম সমাজের নেতা ও জনসাধারণকে নির্বিচারে খুন করা হয়। কম্যুনিস্ট পার্টির হিজবে পারচাম ছিল নুর মুহাম্মাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। এই পার্টির নেতাদের রাষ্ট্রদূত বানিয়ে বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যেমন গুরুত্বপূর্ণ নেতা বাবরাক কারমালকে পাঠানো হয় চেকোস্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রদূত হিসেবে।

দেশের বাহিরে অবস্থানরত এসব কম্যুনিস্ট নেতার পক্ষ থেকে ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছিল। হিজবে পারচামের নেতারা চাইত বৈশ্বিক সাম্যবাদের সাথে বৃহৎ ঐক্য। আফগানিস্তানে কামনা করত সরাসরি মস্কোর নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু ক্ষমতাসীন হিজবে খলক চাইত সাম্যবাদের আঞ্চলিক রূপায়ণ। নুর মুহাম্মাদ বিপদাশঙ্কা করে রাষ্ট্রদূতদের প্রত্যাহার করেন। কিন্তু দেশে ফেরার পরিণতি আন্দাজ করে নেতারা কেউ আর দেশে ফিরে আসে না। এরপর নুর মুহাম্মাদ মস্কো গিয়ে রাশিয়ার সাথে সামরিক সাহায্যের চুক্তি করেন। চুক্তি অনুযায়ী বর্তমান সাম্যবাদপন্থি শাসনব্যবস্থা রক্ষা এবং বিদ্রোহ দমন করার জন্য রুশ বাহিনী যেকোনো সময় আফগানে প্রবেশ করতে পারবে।

এ সময়ই ১৩৯৯ হিজরিতে (১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে) গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে 'আল-হিজবুল ইসলামি' আন্দোলন। হেরাত সেনানিবাসে এক অভ্যুত্থান ঘটে। সেনারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তৎক্ষণাৎ রাশিয়া আফগানিস্তানে তার প্রথম সৈন্যদল পাঠায়। ১৩৯৯ হিজরির রমজানে আফগান আক্রমণ করে রুশ সেনারা। এ সময় প্রেসিডেন্ট নুর মুহাম্মাদ ও প্রধানমন্ত্রী হাফিজুল্লাহ আমিনের মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয়। রাশিয়া নুর মুহাম্মাদকে আহ্বান করে হিজবে পারচামের নেতা বাবরাক কারমালের সহায়তা গ্রহণ করতে। কিন্তু নুর মুহাম্মাদ আপত্তি জানায় এই বলে যে, প্রধানমন্ত্রী তাতে সম্মত নন। রাশিয়া পরিকল্পনা করে প্রেসিডেন্টের সহায়তায় প্রধানমন্ত্রী হাফিজুল্লাহ আমিনকে হত্যা করা হবে, কিন্তু পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। আমিন দেশের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন। অতঃপর নুর মুহাম্মাদকে গ্রেফতার করে নিজেকে আফগানের প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন।

হাফিজুল্লাহ আমিন

হাফিজুল্লাহ আমিন দেশের পরিস্থিতি শান্ত করার প্রচেষ্টা চালান। প্রতিবেশী দেশের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু আমিন ঠিক রাশিয়ার চাহিদামতো নেতা ছিলেন না। রাশিয়ার চাহিদা হলো আংশিক নয়; বরং সর্বতোভাবেই রাশিয়াকে মান্য করবে এমন একজন মেরুদণ্ডহীন নেতা। তাই তারা দেশে আগের চেয়ে বেশি গোলযোগ সৃষ্টি করতে লাগল। আফগানে অবস্থানকারী রুশবাহিনী ও আফগানবাহিনী বেশ কয়েকবার মুখোমুখি লড়াইয়ে জড়াল। এমতাবস্থায় রুশরা সমর্থন দিলো চেকোস্লোভাকিয়ায় অবস্থানরত হিজবে পারচামের নেতা রুশ অনুগত বাবরাক কারমালকে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী মুহাম্মাদ আসলামকে রুশরা পক্ষে টানে। এই মন্ত্রী ১৪০০ হিজরিতে (১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে) প্রেসিডেন্ট ভবনে আক্রমণ চালিয়ে হাফিজুল্লাহ আমিনকে গ্রেফতার করেন। একদিন পরই তাকে হত্যাও করে ফেলেন। বাবরাক কারমালকে আফগান প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করা হয়, যিনি তখনও দেশের বাইরে।

বাবরাক কারমাল

বাবরাক যখন কাবুলে পৌঁছেন, ততক্ষণে সারা দেশে রুশবাহিনীর সয়লাব হয়ে গেছে। কাবুল তখন রুশদের নিয়ন্ত্রণে। অন্যান্য অঞ্চল নিয়ন্ত্রণে নিতে দ্রুত সেনা পাঠানো হচ্ছিল। জাতিসংঘ নিন্দা জানায় এবং রুশদের আফগান ছেড়ে যাওয়ার আহ্বান করে। ইসলামাবাদে মুসলিম দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে অভিযোগ তোলা হয় যে, রাশিয়া আন্তর্জাতিক আইন চূড়ান্ত পর্যায়ে লঙ্ঘন করেছে। কিন্তু এ সমস্ত প্রস্তাব বা আহ্বানের কোনো প্রায়োগিক দিক এবং রাশিয়ার ওপর তার কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া ছিল না। জাতিসংঘ তো হলো বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থ রক্ষাকারী এক সংগঠন, যার মাধ্যমে তারা বিশ্বকে শাসন করে। ১৪০০ হিজরিতে, মাত্র এক বছরে রুশবাহিনীর হাতে শাহাদাত বরণ করে প্রায় দশ লাখ আফগান।

ইসলামি প্রতিরোধ যুদ্ধ

সোভিয়েত রাশিয়া ও আফগান কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে আফগান মুজাহিদদের প্রতিরোধ যুদ্ধ কঠিন আকার ধারণ করে। আফগান জনগণ বহু যুগ ধরেই ইসলামি চেতনা ও তেজস্বী ঈমানি জোরের অধিকারী

হিসেবে পরিচিত। ইসলামের প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করার জন্য মরণপণ লড়াই শুরু করেন আফগান মুজাহিদ বাহিনী। রুশদের উন্নত অস্ত্রশস্ত্রের মোকাবিলায় অতি সাধারণ গোলা বারুদ দিয়েই তাদের পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ আস্বাদন করাতে থাকে মুজাহিদরা। কিন্তু মুজাহিদদের দুর্বলতার জায়গা ছিল নিজেদের মধ্যকার বিভেদ। তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করছিল না। ফলে নানা কারণে নিজেদের মধ্যে রক্তপাতের ঘটনা এড়ানো যাচ্ছিল না।

সবচেয়ে বড় যে দুটি দলের মাঝে সংঘর্ষ হতো, সেগুলো হলো বুরহানুদ্দিন রাব্বানির নেতৃত্বাধীন জমিয়তে ইসলাম ও হেকমতিয়ারের নেতৃত্বাধীন হিজবে ইসলামি। কিন্তু এরপরও আফগান মুজাহিদরা রুশ ও কম্যুনিস্টদের যুদ্ধের ময়দানে এমন শিক্ষা দিয়েছে যে, জীবনেও তারা এই স্মৃতি ভুলতে পারবে না। যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে রাশিয়া আবিষ্কার করল, যেন সে ভয়ংকর এক জলায় আটকা পড়ে গেছে, যেখান থেকে বের হওয়ার কোনো উপায় নেই। প্রতিদিন রাশিয়ার হৃদয় ভেঙে খান খান করে দিচ্ছে মুজাহিদ বাহিনী। নষ্ট হচ্ছে বিলিয়ন বিলিয়ন অর্থ। রাশিয়ার স্বপ্ন ছিল কয়েকদিনেই আফগানের আনাড়ি মুজাহিদদের ধ্বংস করে ফেলা যাবে। কিন্তু এই অল্পকিছু অকুতোভয় মুজাহিদ তৎকালীন পরাশক্তি রাশিয়ার জানমাল উভয়টা ধ্বংস করে কোমর ভেঙে দেয়। বিশেষত মুজাহিদরা ছিলেন আফগানিস্তানের দীর্ঘকালের অধিবাসী। যুদ্ধের ক্ষেত্রে এর আঞ্চলিক নাড়িনক্ষত্র ছিল তাদের নখদর্পণে।

প্রচণ্ড মার খেয়ে অবশিষ্ট সম্পদ ও সৈন্য রক্ষা করতে কোনোমতে পালিয়ে যাওয়ার রাস্তা খুঁজতে শুরু করে রাশিয়া। ১৪০৮ হিজরিতে (১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে) আফগান ত্যাগ করে রুশবাহিনী। কিন্তু এই দীর্ঘ ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে আফগান জনগণের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা বর্ণনার ভাষা পৃথিবীতে নেই। লাশের পর লাশ, উদ্বাস্তু ও শরণার্থী ছাড়া আর কিছু যেন অবশিষ্ট ছিল না। পাকিস্তান ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে আফগান শরণার্থীর সংখ্যা ছিল অগণিত। রাশিয়া তার কম্যুনিস্ট সহযোগীদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে আফগানিস্তান ত্যাগ করে। শেষ কম্যুনিস্ট এই শাসকের নাম নজিবুল্লাহ মুহাম্মাদ। বিধায়, রাশিয়া দেশ ত্যাগ করলেও মুজাহিদদের প্রত্যাশা তখনও পূরণ হয়নি। কম্যুনিস্ট শাসক বিতাড়িত করার লক্ষ্য নিয়ে তারা নতুন উদ্যমে লড়াই শুরু করে। রাশিয়া তখনও কম্যুনিস্ট

আফগান সরকারকে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছিল। মুজহিদরাও তাদের জিহাদ অব্যাহত রাখে। তারা দুইবার অস্থায়ী সরকার গড়ে তুলেছিল, কিন্তু নিজেদের মধ্যকার বিভেদে সেসব ভঞ্জুল হয়ে যায়।

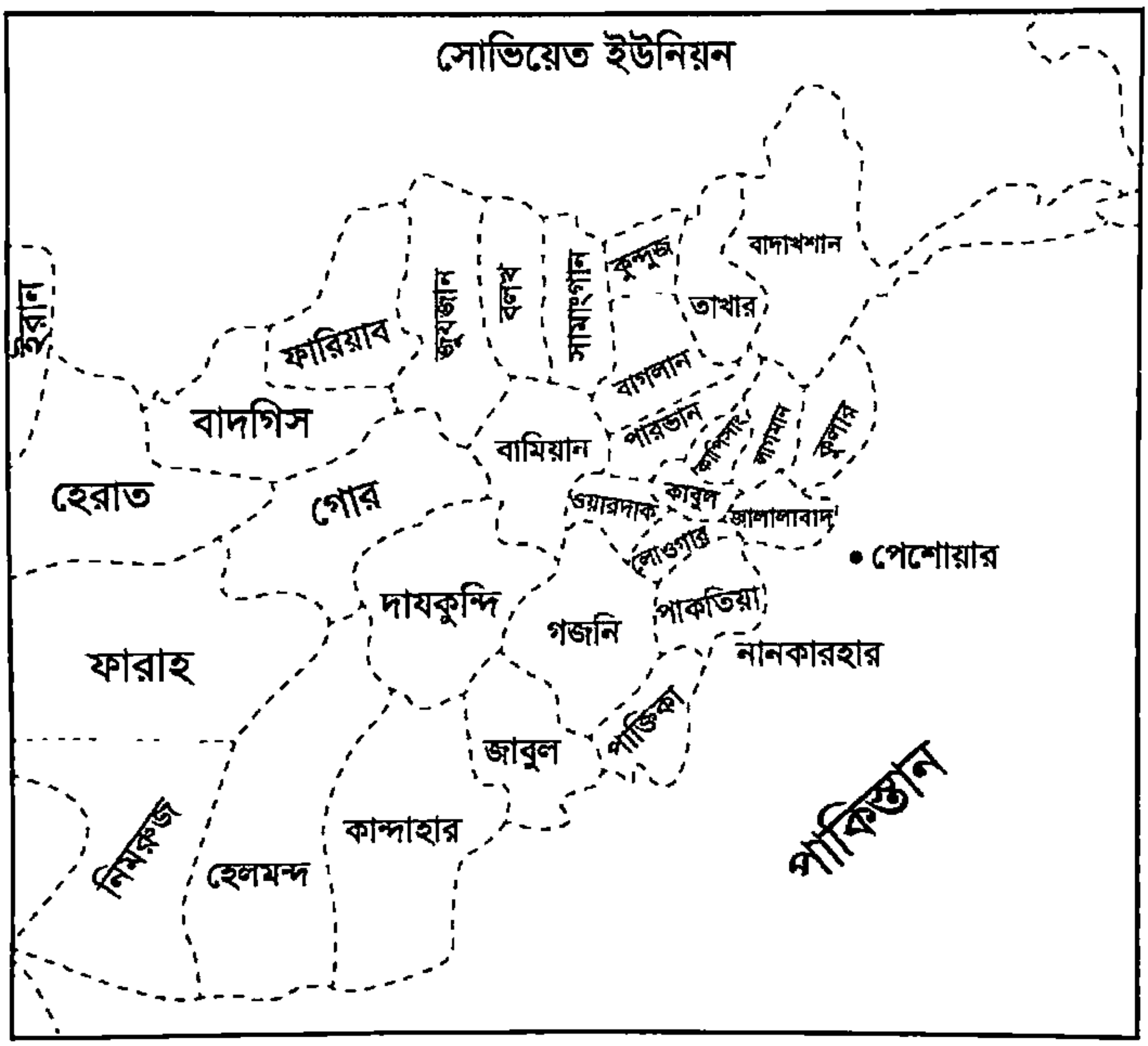
কম্যুনিস্ট সরকার বুঝতে পারে, এই বিপ্লবী আফগান যোদ্ধাদের সামাল দেওয়া তার কাজ নয়। তাই ১৪১২ হিজরিতে (১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে) নজিবুল্লাহ মুহাম্মাদ পদত্যাগ করেন। এবার মুজাহিদদের ক্ষমতায় আরোহণ করা ছিল সময়ের ব্যাপার। কিন্তু নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করে। কয়দিন আগেও যারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইসলামের শত্রুদের প্রতিহত করছিল, তারা এবার নিজেদের রক্ত ঝরাতে লাগল। আফগানিস্তান বিভিন্ন সশস্ত্র সংগঠনের হাতে বিভক্ত হয়ে গেল। এদিকে প্রকৃত শত্রুরা সুযোগ পেয়ে এসব দলের জন্য অস্ত্র সরবরাহ বাড়িয়ে দিলো, যেন নিজেরা মারামারি করে ধ্বংস হওয়া আরও ত্বরান্বিত হয়।

তালেবান আন্দোলন

১৪১৫ হিজরিতে (১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে) তালেবান আন্দোলন শুরু হয়। পাকিস্তান তাদের সমর্থন করছিল। খুব দ্রুত তারা দেশের প্রায় ৭৫% এলাকার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। ১৪১৫ হিজরিতেই কাবুল জয় করে তালেবান। রাশিয়া, ইরান ও অন্যান্য প্রতিবেশী দেশ তালেবানের বিরুদ্ধে একাট্টা হয়। এসব দেশ এই আন্দোলন নিজেদের দেশে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করছিল। এসব দেশের সহযোগিতায় স্বদেশীয় বিরোধী শিবির তাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখে। তবে পাকিস্তান তাদের সমর্থন থেকে পিছু হটেনি।

বিরোধী ও কলহে লিপ্ত প্রতিপক্ষগুলোকে চূড়ান্ত শিক্ষা দেয় তালেবান। তবে বহিঃরাষ্ট্রের ষড়যন্ত্রের কারণে শতভাগ সফলতা তারা পায়নি। তালেবানবিরোধীদের দখলে থাকা বড় শহর ছিল মাজার শরিফ। তালেবান এটি দখলে নিলেও আহমাদ শাহ মাসউদ তা পুনর্দখল করে নেন। প্রতিপক্ষরা নিশ্চিহ্ন হয়নি। কখনো তাদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেত, কখনো স্তিমিত হয়ে যেত—এভাবেই চলছিল। মোল্লা মুহাম্মাদ উমরের নেতৃত্বে তালেবান সরকার গঠন করে। এ সময় বহির্বিশ্বের সাথে আফগানিস্তানের কূটনৈতিক সম্পর্ক একদম ছিন্ন হয়ে যায়।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা, যা এখন ৯/১১ (নাইন ইলেভেন) নামে পরিচিত, পাল্টে দেয় পুরো দৃশ্যপট। এই ঘটনার জন্য দায়ী করা হয় উসামা বিন লাদেনের জিহাদি সংগঠন তানজিম আল-কায়েদাকে। আর বিন লাদেন তখন আফগানিস্তানেই ঘাঁটি গেড়ে ছিলেন। স্বভাবতই আমেরিকা তখন আফগান আক্রমণের সুযোগ পেয়ে যায়। বিন লাদেন ও মোল্লা মুহাম্মাদ উমর অজ্ঞাত স্থানে আত্মগোপন করেন। আমেরিকা তালেবান সরকারের ইসলামি শাসনের পতন ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে। নতুন আফগান প্রেসিডেন্ট হন আমেরিকাপন্থী হামিদ কারজাই।[১৫]



মানচিত্র নং-১৫

আফগানিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের মানচিত্র

১৫. কিন্তু তালেবানরা একদিনের জন্যও প্রতিরোধযুদ্ধ থেকে সরে আসেনি মার্কিন ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে তারা লড়াই অব্যাহত রাখে। প্রায় দুই দশক লড়াইয়ের পর ২০২০ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি তালেবানদের সাথে আমেরিকার শান্তিচুক্তি সম্পন্ন হয়। বর্তমানে আফগানিস্তানের সিংহভাগ এলাকা তালেবানের নিয়ন্ত্রণে। -সম্পাদক

হিন্দুস্তানে মুসলিম শাসন[১৬]

> এই অংশে আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো ভারত উপমহাদেশ। দক্ষিণ এশিয়ার এই অঞ্চল বর্তমানে বেশকিছু দেশে বিভক্ত। যথা ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ।

ভারতবর্ষে ইসলামের আগমন হয় বণিক, দ্বীনের দাঈ ও সৈনিকদের হাত ধরে। উমর রা.-এর সময় ভারত অভিমুখী কিছু প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। তবে ব্যাপক পরিসরে এ অঞ্চলের প্রতি মনোযোগ লক্ষ করা যায় উমাইয়া শাসনামলে। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ভারত অভিযানের উদ্দেশ্যে একাধিক সৈন্যদল প্রেরণ করেন। তার প্রেরিত সেনাপতিদের মধ্যে সফলতা লাভ করেন মুহাম্মাদ বিন কাসিম। তিনি ৯২ হিজরিতে (৭১১ খ্রিষ্টাব্দে) হিন্দুস্তানের সিন্ধু অঞ্চল জয় করতে সক্ষম হন। সে সময় মুসলিম বাহিনী ও হিন্দু রাজা-ব্রাহ্মণদের মাঝে তুমুল যুদ্ধ চলতে থাকে। (ব্রাহ্মণরা হিন্দু সমাজে অতি উচ্চ একশ্রেণি। হিন্দুদের ধারণামতে, ব্রাহ্মণরা হলো ভগবানের সবচেয়ে প্রিয় ও কাছের মানুষ। এ কারণে হিন্দু সমাজে তাদের বৈশিষ্ট্য ও কর্তৃত্ব অতি উচ্চ পর্যায়ে।) তো ব্রাহ্মণরা নিম্নগোত্রীয় হিন্দুদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করত। তাদের ভয় ছিল, মুসলিমরা রাজ্য জয় করে নিলে তাদের প্রায় ঈশ্বরসম ক্ষমতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাই মুসলিমদের দমন করা জরুরি।

আব্বাসীয় আমলে সিন্ধের গভর্নর হিশাম বিন আমর তাগলিবি মুলতান ও কাশ্মীর জয় করতে সক্ষম হন। এরপর আব্বাসিরা দুর্বল হতে শুরু করে। হিন্দুস্তানেও তাদের রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে যায়। সিন্ধু প্রদেশ ভেঙে ইমারাতুল মানসুরা, ইমারাতুল মুলতান, ইমারাতুল ইসমাইলিয়া প্রভৃতি

---

১৬. এই পরিচ্ছেদটি যদিও মোঙ্গল সাম্রাজ্যের অধ্যায়ে আলোচিত হচ্ছে, তবে এখানে ভারতীয় মোঙ্গল সাম্রাজ্য ছাড়াও পুরো মুসলিম শাসনের ইতিহাস সন্নিবেশিত হয়েছে। এ ছাড়া, পরিচ্ছেদটির বেশকিছু আলোচনা সম্পাদক কর্তৃক বর্ধিত। -সম্পাদক

নামে একাধিক ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠে। গজনবিদের আগমন পর্যন্ত এ অবস্থা বহাল থাকে।

গজনবি শাসন

ইরানের সামানি রাজ্য বিলুপ্ত হয়ে গজনবি সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। গজনবি কোনো বংশের নাম নয়। আফগানিস্তানের যে শহরকে তারা সাম্রাজ্যের রাজধানী করেছিল তার নাম ছিল গজনি। এই শহরের প্রতি সম্বন্ধিত হয়ে এই সাম্রাজ্যের নাম হয় গজনবি। সুবুক্তগিন এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি হিন্দুস্তানের পাঞ্জাব পর্যন্ত অভিযান চালান এবং বিজয়ও লাভ করেন।

তার পুত্র সুলতান মাহমুদ গজনবি এই বংশের কীর্তিমান ও তেজস্বী এক শাসক। জিহাদের জন্য ছিলেন উন্মুখ। তিনি সতেরোবার ভারতে অভিযান পরিচালনা করেন এবং সিন্ধু অঞ্চলের এলাকাগুলো তার সাম্রাজ্যভুক্ত করতে সক্ষম হন। জয় করেন কান্নুজ ও গুজরাট। গুজরাটের সুপ্রাচীন সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করেন। হিন্দুদের ধারণা ছিল, এই মন্দিরে পুনর্জন্মের আগে সকল আত্মা বাস করে। সুলতান মাহমুদের বিজিত এলাকায় দ্রুত ইসলাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সুলতান মাহমুদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল বর্তমান আফগানিস্তান, পূর্ব ইরান ও পাকিস্তানের কিছু এলাকাজুড়ে।

সুলতান মাহমুদ ইনতেকাল করেন ৪২১ হিজরিতে। সুলতান মাহমুদ গজনবি ছিলেন বুদ্ধিমান, ধর্মভীরু, শিল্প-সাহিত্যে অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক। একজন সাহসী সেনাপতি হিসেবে তার সুনাম ছিল। ডক্টর ঈশ্বরী টোপা তাকে বলেছেন, গজনির নেপোলিয়ন[১৭]। সুলতান মাহমুদের রাজসভা ছিল জ্ঞানী-গুণীদের দ্বারা পরিপূর্ণ। তার রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন *শাহনামার* লেখক ফেরদৌসি, ঐতিহাসিক উতবি, আখ্যানলেখক বাইহাকি, কবি আনসারি প্রমুখ মেধাবী ব্যক্তি। সুলতান মাহমুদ ৪১০ হিজরিতে গজনিতে একটি মাদরাসা নির্মাণ করেছিলেন[১৮]। এই মাদরাসার প্রতিষ্ঠা বাগদাদের জামেয়া নিজামিয়ারও আগে। সুলতান মাহমুদের পরবর্তী শাসকরা তার মতো এতটা যোগ্য ছিলেন না। ফলে

---

১৭. *পলিটিক্স ইন প্রি মোগল টাইম:* পৃষ্ঠা-৩০, ঈশ্বরী টোপা। -সম্পাদক

১৮. *তারিখে ফেরেশতা:* ১/২৫, আবুল কাসেম ফেরেশতা। -সম্পাদক

তার মৃত্যুর পর গজনি সাম্রাজ্য দুর্বল হতে থাকে। তার পুত্র মাসউদ সিংহাসনে বসে জয় করেন গঙ্গা তীরবর্তী প্রাচীন শহর বানারস। ৫৫৫ হিজরি পর্যন্ত গজনবিদের শাসন টিকে ছিল। তারপর তাদের পতন ঘটিয়ে সেখানে গড়ে ওঠে ঘুরি বংশের শাসন।

ঘুরি শাসন

গজনবিদের পতন হয়েছিল ঘুরিদের হাতে। ঘুরিদের অবস্থান ছিল গজনি ও হেরাতের মাঝামাঝি পার্বত্য এলাকায়। ১০১০ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ ঘুরি রাজ্য দখল করলে ঘুরিরা তার আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পর গজনি সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সুযোগে ঘুরিরা আবার শক্তি সঞ্চয় করে। ১১৭০ খ্রিষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দিন ঘুরি গজনিরাজ্য নিজের দখলে নিয়ে আসেন। তার ভাই শিহাবুদ্দিন ঘুরি গজনি প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনিই ভারতের ইতিহাসে মুহাম্মদ ঘুরি নামে বিশেষভাবে পরিচিত। মুহাম্মদ ঘুরি খুবই উৎসাহী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী শাসক ছিলেন। গজনির শাসনকর্তা নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি নজর দেন হিন্দুস্তানের দিকে। সেখানে সামরিক বিজয়লাভ করা তার ধ্যানজ্ঞান হয়ে ওঠে। মুহাম্মদ ঘুরির ভারত আক্রমণের সময় ভারতের রাজনৈতিক শক্তি নানাভাগে বিভক্ত ছিল। বিহার ও বাংলা অঞ্চল ছিল বৌদ্ধ, পাল ও সেন বংশের অধীনে। দিল্লি ও আজমির শাসন করত চৌহান বংশের শাসকরা। আজমিরের শাসনকর্তা ছিলেন পৃথ্বীরাজ। ১১৯০ সালে মুহাম্মদ ঘুরি তার বাহিনী নিয়ে আজমিরের দিকে এগিয়ে আসেন। তাকে মোকাবিলা করার জন্য পৃথ্বীরাজ ও অন্য রাজারা এগিয়ে আসেন। থানেশ্বরের কাছে দুই বাহিনীর মাঝে তীব্র যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মুহাম্মদ ঘুরি পরাজিত হন। ইতিহাসে এটি তরাইনের[১৯] প্রথম যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই পরাজয়ে মুহাম্মদ ঘুরি বিচলিত হলেন না। ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আবারও তার বাহিনী নিয়ে এগিয়ে এলেন আজমিরের দিকে। এ সময় তার সেনাসংখ্যা ছিল এক লক্ষ ২০ হাজার। এই যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ পরাজিত ও নিহত হন। এই পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে শক্তির একটা পরিবর্তন ঘটে। এর আগেও মাহমুদ গজনবি এখানে আক্রমণ করেছিলেন, স্থানীয় রাজাদের পরাজিত করেছিলেন, কিন্তু তিনি এখানে নিজের শাসন প্রতিষ্ঠিত

---

১৯. যুদ্ধক্ষেত্রটি ছিল থানেশ্বর থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে তরাইন নামক গ্রামে। -সম্পাদক

করেননি। কিন্তু মুহাম্মদ ঘুরি নিজের বিশ্বস্ত সেনাপতি কুতুবুদ্দিন আইবেককে ভারতবর্ষের বিজিত বিভিন্ন এলাকার শাসক নিযুক্ত করে নিজে আফগানিস্তানে ফিরে যান। এভাবে কুতুবুদ্দিন আইবেকের হাত ধরে ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের সূচনা ঘটে।

ভারতবর্ষে মামলুক শাসন

মুহাম্মদ ঘুরি আফগানিস্তান ফিরে যাওয়ার আগে কুতুবুদ্দিন আইবেককে উত্তর ভারতের দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন। কুতুবুদ্দিন আইবেক একজন যোগ্য সেনাপতি ও প্রশাসক ছিলেন। ১১৯৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দিল্লি, গোয়ালিয়র, কান্নুজ ইত্যাদি এলাকা জয় করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে তার একজন সেনাপতি ইখতিয়ারুদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি উত্তর-পূর্ব ভারতে শক্তি বিস্তারের দিকে দৃষ্টি দেন। ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নদীয়া অঞ্চল আক্রমণ করলে তার হাতে সেন শাসনের অবসান ঘটে। বাংলা ও বিহারের বিস্তৃর্ণ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় তুর্কি শাসন। ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ ঘুরি আততায়ীর হাতে নিহত হন। এরপর কুতুবুদ্দিন আইবেক নিজেকে স্বাধীন শাসক হিসেবে ঘোষণা দেন এবং সুলতান উপাধি নিয়ে দিল্লি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১২১০ খ্রিষ্টাব্দে কুতুবুদ্দিন আইবেক মারা যান। দিল্লির কুতুব মিনার ও কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ নির্মাণ তার অমর কীর্তি। কুতুবুদ্দিন একজন জনদরদি শাসক ছিলেন, প্রজাদের শান্তি সমৃদ্ধি সাধনে তিনি চেষ্টা করতেন।[২০] কুতুবুদ্দিনের পরের শাসকদের মধ্যে শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ বেশ বিখ্যাত। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন কুতুবুদ্দিনের ক্রীতদাস। পরে নিজের যোগ্যতার মাধ্যমে তিনি কুতুবুদ্দিনের একান্ত আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন। এমনকি কুতুবুদ্দিন তার কাছে নিজের মেয়ে বিয়ে দেন। ১২২৮ খ্রিষ্টাব্দে ইলতুতমিশ মুলতান ও সিন্ধু জয় করেন। ১২২৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বাগদাদের আব্বাসি খলিফা মুসতানসির বিল্লাহর সাথে পত্র যোগাযোগ করেন। খলিফা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে সুলতান-ই-আজম উপাধি দেন। এই উপাধি পাওয়ার কারণে ভারতবর্ষে তার সম্মান বেড়ে যায়। আব্বাসি খলিফার এই উপাধি ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনকে একপ্রকার নৈতিক ভিত্তি দিয়েছিল। ইলতুতমিশের শাসনামলে ভারতবর্ষে সর্ব প্রথম আরবি মুদ্রার প্রবর্তন হয়।

---

২০. *তাজুল মাআসির*-২৮, হাসান নিজামি। -সম্পাদক

ইলতুতমিশ একজন যোগ্য প্রশাসক ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত নেককার। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারনি তার রাজত্বকালকে অভিহিত করেছেন সমৃদ্ধ ও গৌরবময় বলে।[২১]

ইলতুতমিশের পরবর্তী শাসকদের মধ্যে সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবনের নাম উল্লেখযোগ্য। তার শাসনামলে ১২৭৯ খ্রিষ্টাব্দে মোঙ্গলরা ভারত আক্রমণ করেছিল। কিন্তু সুলতান গিয়াসুদ্দিনের দুই পুত্র তাতারবাহিনীকে পরাজিত করে। ভারতবর্ষ নিরাপদ হয় তাতারদের হাত থেকে। মামলুক শাসকদের মধ্যে সর্বশেষ শাসক ছিলেন সুলতান কায়কোবাদ। ১২৯০ সালে তাকে হত্যা করে সুলতান জালালুদ্দিন ফিরোজ খলজি ক্ষমতায় বসেন এবং খলজি শাসনের সূচনা করেন।

৬৯৬ হিজরিতে (১২৯৭ খ্রিষ্টাব্দে) জালালুদ্দিন খলজির ভাতিজা আলাউদ্দিন খলজি নিজস্ব বাহিনী নিয়ে চাচাকে পরাস্ত করে সিংহাসন দখল করেন। আলাউদ্দিন তাতারদের পরাজিত করে দিল্লিকে নিরাপদ রাখতে সক্ষম হন। গুজরাট জয় করেন আলাউদ্দিন। ৭০৩ হিজরিতে (১৩০৪ খ্রিষ্টাব্দে) তার বাহিনী দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করে এবং ভারতের সর্ব দক্ষিণের রাজ্য কেরালা জয় করতে সক্ষম হয়। আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর তার শিশুপুত্র শিহাবুদ্দিনকে সুলতান বানানো হয়। মূলত ক্ষমতার কলকাঠি ছিল শিশু সুলতানের অভিভাবকের হাতে। এই অভিভাবক ক্ষমতা নিষ্কণ্টক করতে আলাউদ্দিনের অন্য তিন পুত্রকে কারাবন্দি করে এবং তাদের চোখ উপড়ে ফেলে। আরেক পুত্র কুতুবুদ্দিন মোবারককে শুধু কারাবন্দি করে রাখে। এসব কারণে সুলতান-পুত্রদের মাতা ক্ষুব্ধ ও বেদনাহত হয়ে কৌশলে শিহাবুদ্দিনের অভিভাবককে হত্যা করান। তারপর কারাবন্দি পুত্র মোবারক ক্ষমতায় বসেন। মোবারক তার ভাই শিহাবুদ্দিনকেও তার অন্য ভাইদের সাথে কারাবন্দি করেন। এরপর দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন দিকে বাহিনী প্রেরণ করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেন।

মোবারকের কর্মকাণ্ডে অসন্তুষ্ট হয়ে প্রভাবশালী আমির-উমারা তাকে সিংহাসনচ্যুত করে তার ভাতিজা খিজিরকে ক্ষমতায় বসাতে আগ্রহী হয়। খিজির তখনও নাবালক। মোবারক এই উদ্দেশ্য জানতে পেরে তার

---

২১. *তারিখে ফিরোজ শাহি*: ৮৮, জিয়াউদ্দিন বারনি। -সম্পাদক

ক্ষমতা নিষ্কণ্টক করতে উঠেপড়ে লাগেন। হত্যা করে ফেলেন তার কারাবন্দি চার ভাই ও বালক খিজিরকে। সুলতানের এসব কর্মকাণ্ডের ভবিষ্যৎ ঝুঁকি আঁচ করে উঁচুস্তরের এক আমির নাসিরুদ্দিন খসরু সুলতানকে হত্যা করে ক্ষমতায় বসেন। কিন্তু নাসিরুদ্দিন খসরু হিন্দুঘেঁষা ছিলেন বলে লোকে তার শাসন মেনে নিতে পারেনি। দেশজুড়ে এসব বিশৃঙ্খলা চলতেই থাকে। তখন সিন্ধু থেকে ছুটে আসেন গিয়াসুদ্দিন। শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে এসে অনায়াসে দিল্লি দখল করে নেন সিন্ধুর আমির। নাসিরুদ্দিন খসরু পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন।

তুঘলক শাসন

সিন্ধুর আমির গিয়াসুদ্দিন তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তার সাম্রাজ্য ৭২০ হিজরি থেকে প্রায় একশ বছর দিল্লি শাসন করেছিল। তার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসে পুত্র জুনা ওরফে মুহাম্মাদ তুঘলক। তার উপাধি ছিল আবুল মুজাহিদ। নামাজের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। নামাজ ত্যাগকারীকে মৃত্যুদণ্ড দিতেন। তার হাতে কেরালা জয় হয়। চীন অভিমুখেও তিনি সেনা প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু হিমালয়ের বৈরী পরিবেশে সৈন্যরা ধ্বংসের মুখে পড়ে।

তার মৃত্যুর পর ক্ষমতায় বসেন তার চাচাতো ভাই ফিরোজ শাহ তুঘলক। তিনি ছিলেন একজন বুজুর্গ শাসক। তিনি অনেক মসজিদ-মাদরাসা ও চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বহু কেল্লা নির্মাণ করেন। তার মৃত্যুর পর দেশে বিশৃঙ্খলা সীমা ছাড়িয়ে যায়। আমিরদের মাঝে ক্ষমতার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এরপর বেশ কয়েকজন শাসক ক্ষমতায় আসেন। কিন্তু তুঘলকদের সময় ফুরিয়ে আসছিল। ৮০১ হিজরিতে (১৩৯৮ খ্রিষ্টাব্দে) তৈমুর লং দিল্লি আক্রমণ করেন। তবে দিল্লি শাসন করার ইচ্ছা তৈমুরের আদৌ ছিল কি না তাতে সন্দেহ আছে। যতদূর বোঝা যায়, ভারতের মুসলিম রাজাদের ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত করে দুর্বল করে দেওয়াই ছিল তৈমুরের ভারত আক্রমণের প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাই অল্প সময় পরই তৈমুর ভারত ত্যাগ করেন। তার প্রস্থানের পর তুঘলক বংশের শেষ সুলতান মাহমুদ শাহ পুনরায় দিল্লির সিংহাসন দখল করেন। মাহমুদের মৃত্যু হয় ৮১৫ হিজরিতে (১৪১৩ খ্রিষ্টাব্দে)।

খিজির (সৈয়দ) বংশের শাসন

খিজির ছিলেন তৈমুরের লোক। তৈমুরের প্রস্থানের পর তিনি দিল্লিতেই রয়ে যান। মাহমুদ শাহের মৃত্যুর পর খিজির তার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তার বংশ ৮৫৫ হি. পর্যন্ত দিল্লি শাসন করে। এই বংশের শেষ সুলতান আলাউদ্দিনের শাসনকালে জনৈক বাহলুল লোদী নামক ব্যক্তি বিদ্রোহ করে ক্ষমতা দখল করে নেন। তিনিই লোদী বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম শাসক।

লোদি শাসন

এই বংশ ৮৫৫ হিজরি থেকে ৯৩২ হিজরি পর্যন্ত শাসন করে। লোদি বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান বাহলুল লোদি ছিলেন আফগান বংশোদ্ভূত। তার সময়ে হিন্দুস্তানে বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্য বিদ্যমান ছিল। সেগুলোর মধ্যে অধিকাংশের ছিল মুসলিম শাসন এবং অতি অল্পকিছুর ছিল হিন্দু শাসন। তিনি বিভিন্ন মুসলিম অঞ্চলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। বাহলুল লোদির পুত্র সিকান্দার লোদি ত্রিহুত ও বিহার জয় করে সুলতানি শাসনের সীমানা বৃদ্ধি করেন। সর্বশেষ লোদি শাসক ছিলেন ইবরাহিম লোদি। তার সময়ে মোঘল সম্রাট বাবর ভারতবর্ষে আক্রমণ করেন। ১৫২৬ সালে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে তিনি ইবরাহিম লোদিকে পরাজিত করেন। ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয় মোঘল শাসন। তৈমুরীয় মোঘল সাম্রাজ্য।

মোঘল[২২] শাসন

সম্রাট বাবর

লোদি বংশের শেষ শাসক দ্বিতীয় ইবরাহিম লোদি দিল্লির শাসনে বসার পর অন্য মুসলিম শাসকরা তাকে পরাস্ত করতে গজনবির শাসক জহির উদ্দিন বাবরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাদের আহ্বানে বাবর হিন্দুস্তানে আগমন করেন। ৯৩২ হিজরিতে (১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে) পানিপথের যুদ্ধে বাবর ইবরাহিম লোদিকে পরাজিত করেন। এরপর তিনি আগ্রাকে তার আবাসস্থল হিসেবে গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর লোদি বংশের আমির-উমারা বিভিন্ন রাজপুতদের সাহায্য নিয়ে পুনরায় বাবরের মোকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। রাজপুতরা মধ্যভারতের বড় শক্তি হিসেবে গণ্য হতো। লোদি ও রাজপুতরা বাবরের বিরুদ্ধে ঐক্য গড়ে তুলল। এই অবস্থায় বাবর কাফের শক্তি ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে জিহাদের ডাক দেন। ৯৩৩ হিজরিতে (১৫২৭ খ্রিষ্টাব্দে) খানওয়ার যুদ্ধে দুই শিবির মুখোমুখি হয়। এবারও বাবর বিজয় লাভ করেন। সিংহাসনে বসেই বাবর ধর্মীয় সহনশীলতার ঘোষণা দেন। এভাবে তিনি ক্ষমতা পাকাপোক্ত করেন। ৯৩৭ হিজরিতে (১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দে) বাবরের ইনতেকাল হয়। তার স্থলবর্তী হন পুত্র হুমায়ুন।

হুমায়ুন

হুমায়ুনের শাসনামলে মোঘল সাম্রাজ্য ভেঙে গিয়েছিল। অনেক রাজ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এদিকে খ্রিষ্টানদের তৎপরতাও বৃদ্ধি পায়। পর্তুগিজরা ততদিনে হিন্দুস্তানের উপকূলে ছড়িয়ে পড়েছিল। ৯১৪ হিজরি থেকেই তারা বাণিজ্যিক কুঠির নামে দুর্গ গড়ে তুলছিল। সে সময় গুজরাটের শাসক পর্তুগিজদের উপকূল থেকে তাড়াতে উসমানি খলিফা সুলাইমান কানুনির সহায়তা কামনা করেন। খলিফা তখন বিশাল নৌবহর

---

২২. ভারতীয় মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের পূর্বপুরুষ তৈমুর লং। তৈমুর মোঙ্গল সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তার সূত্র ধরেই ভারতীয় এই রাজবংশকে মোঘল বংশ বলা হয়। মোঙ্গল ও মোঘল শব্দটি মূলত একই শব্দ থেকে উৎসারিত। আরবি ব্যবহারে মোঙ্গল (منغول) ও মোঘল (مغول) উভয়টিরই ব্যবহার লক্ষ করা যায়। অতএব, মোঙ্গল ও মোঘল শব্দদুটো বিপরীতার্থক বা ভিন্ন ভিন্ন কোনো রাজবংশ নয়। -সম্পাদক

পাঠিয়ে দেন এবং তারা পর্তুগিজদের চরমভাবে পরাজিত করে। এরপর ৯৪২ হিজরিতে গুজরাটের শাসক পর্তুগিজদের সাথে সন্ধিচুক্তি করেন এবং তাদেরকে দেও নামক জায়গায় কেল্লা নির্মাণ করার অনুমতি দেন। কিন্তু পর্তুগিজরা চুক্তি ভঙ্গ করে। তারা গুজরাটের শাসকের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং ৯৪৩ হিজরিতে দেও নগর দখল করে নেয়। সংবাদ পেয়ে খলিফা সুলাইমান পুনরায় নৌবহর পাঠিয়ে দেন। তারা দেও অবরোধ করে। কিন্তু গুজরাটের শাসক ধারণা করে, খলিফা গুজরাটকে তার অধীনস্থ প্রদেশে পরিণত করবেন। তাই তিনি নৌবহরকে সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকেন। ফলে উসমানি নৌবাহিনী গুজরাট ত্যাগ করে চলে যায়। এদিকে হুমায়ুন কাবুলসহ আফগানের অধিকাংশ অঞ্চল তার অধীনে আনতে সক্ষম হন।

মাহমুদ জালালুদ্দিন (সম্রাট আকবর)

আকবরের আমলেই মোঘল সাম্রাজ্য সবচেয়ে বিস্তৃতি লাভ করে। আকবর হিন্দুস্তানের অধিকাংশ অঞ্চল ও আফগানিস্তানে রাজত্ব বিস্তার করেন। ৯৮৬ হিজরিতে তিনি এক নতুন মতাদর্শ ধারণ করেন। যার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুস্তানে নিজের অবস্থান আরও শক্তিশালী করা। সেই মতাদর্শ হচ্ছে, ইসলাম, সনাতন, বৌদ্ধ, জরথুস্ত্রবাদসহ বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়ে নতুন এক ধর্মের প্রবর্তন। তিনি গরু জবাই নিষিদ্ধ করেন। মুসলিম নারী-পুরুষের সাথে মুশরিক নারী-পুরুষদের বিয়ে বৈধ করেন। ফতেহপুর নগরকে তার নতুন ধর্মপ্রচারের কেন্দ্র করা হয়।

তার সময়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে শিখ নামক বিচিত্র চিন্তাধারার নতুন এক ধর্মগোষ্ঠী। গুরু নানক নামের একজনকে তার প্রতিষ্ঠাতা ধরা হয়। তার অনুসারীদের দাবিমতে, তিনি মক্কায় গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি হজ সম্পন্ন করেন, কুরআন তিলাওয়াতে লিপ্ত থাকেন। এরপর জানেন যে, তিনিই হচ্ছেন প্রভু। সম্রাট আকবর তাকে ভূমি দান করেন। যে জায়গায় অমৃতসর নগরটি গড়ে ওঠে। ভারতে এখন (রচনা গ্রন্থবদ্ধকালে) শিখদের সংখ্যা দশ মিলিয়ন ছাড়িয়েছে। তাদের কেন্দ্র পাঞ্জাব।

আকবরের পরের শাসকগণ হলেন জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান। তারা দুজনেই বেশ শক্তিশালী শাসক ছিলেন। তারা প্রায় পুরো ভারতবর্ষ শাসন করেছিলেন। জাহাঙ্গীরের শাসনামলে বাংলা মোঘলদের হাতে আসে। এখানে তাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা শহর প্রতিষ্ঠা

করা হয়, যা এখন বাংলাদেশের রাজধানী। সম্রাট শাহজাহানের সময় ভারতবর্ষে ইউরোপিয়ানদের ব্যাপক আগমন ঘটে। বাহ্যিকভাবে তারা বাণিজ্যের কাজ করত। তবে আড়ালে তারা শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে এবং ধর্মান্তরের কাজ চালাতে থাকে।[২৩] মোঘল সম্রাটরা তাদের বিরুদ্ধে শক্ত কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেননি। এ সময় ডাচ, ওলন্দাজ, পর্তুগিজ, আর্মেনিয়ান, ইংরেজ ও ফরাসিরা ভারতবর্ষে আগমন করে। ১৪৯৮ সালে ভাস্কো দা গামা কর্তৃক উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কারের ফলে উপমহাদেশে ইউরোপিয়ানদের আগমন সহজ হয়ে যায়। সম্রাট আকবরের সময় থেকে ইউরোপিয়ানরা ভারতবর্ষের নানাস্থানে বাণিজ্যিক কুঠি স্থাপন করতে থাকে। ১৫৭৯ সালে পর্তুগিজরা বাংলার সাতগাঁ নামক স্থানে বাণিজ্যিক কুঠি স্থাপন করে। তারা সেখানে অস্ত্রশস্ত্র জমা করে এবং আশপাশের এলাকায় হামলা করে। সম্রাট শাহজাহান এ সংবাদ জেনে তাদেরকে দমন করার জন্য একটি বাহিনী পাঠান। এই বাহিনী ১৬৩২ সালে পর্তুগিজদের পরাজিত করে। তাদের প্রায় ১০ হাজার লোক নিহত হয়।[২৪] ১৬৩৬ সালে মোঘল বাহিনী বিজাপুর ও গোলকুন্ডা দখল করে। এভাবে দক্ষিণ ভারতেও মোঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

শাহজাহানের পর তার পুত্র আওরঙ্গজেব আলমগীর মোঘলদের মসনদে বসেন। তিনি প্রায় ৫০ বছর শাসন করেন। তিনি ক্ষমতায় বসে ব্যাপক সংস্কার এনেছিলেন। তিনি মদপান, জুয়াখেলা ও নওরোজ উৎসব পালন নিষিদ্ধ করেন। মুহতাসিব নামে এক ধরনের কর্মচারী নিয়োগ দেন, যাদের কাজ ছিল জনগণের নৈতিক চরিত্রের দিকে লক্ষ করা। জনসাধারণের সুবিধার জন্য তিনি প্রায় আশি প্রকার কর মাফ করে দেন।[২৫] সাম্রাজ্য বিস্তারের দিকেও তিনি মনোযোগী ছিলেন। বিহারের শাসনকর্তা দাউদ খান ১৬৬১ সালে পালামৌ জয় করেন। এ সময় মুসলিমবিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের শাসকদের সাথে আলমগীরের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। পারস্য, বসরা, মক্কা, বুখারা, আবিসিনিয়া ইত্যাদি এলাকা থেকে মুসলিম শাসকদের দূতরা ভারতে এসেছিলেন। সমকালীন

---

২৩. উপমহাদেশে ইউরোপিয়ানদের মিশনারি তৎপরতা সম্পর্কে জানতে দেখুন, *ফিরিঙ্গিয়ো কা জাল*, ইমদাদ সাবরি। -সম্পাদক

২৪. *বাদশাহ নামা*: ৬৮, আবদুল হামিদ লাহোরি। -সম্পাদক

২৫. *হিস্ট্রি অব আওরঙ্গজেব*: ৩/১১৫, স্যার যদুনাথ সরকার। -সম্পাদক

ঐতিহাসিক ও পর্যটকদের[২৬] বিবরণে এই দূতদের সম্পর্কে জানা যায়। আলমগীর ব্যক্তিজীবনে অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন। সর্বশক্তি দিয়ে ধর্মীয় বিধিবিধান মেনে চলতেন। তিনি *ফতোয়ায়ে আলমগিরি* সংকলন করান। তার শাসনামলেই মধ্য এশিয়া, খাওয়ারেজম, বিজয়পুর এসব এলাকা মোঘল সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। হিন্দু ঐতিহাসিকদের অনেকে তার চরিত্রের ওপর নানা কালিমা লেপন করার চেষ্টা চালিয়েছে। তার দিকে অভিযোগের তির ছুড়েছে। বস্তুনিষ্ঠ গবেষকরা এসব অভিযোগের জবাব দিয়েছেন।[২৭] আলমগীর ছিলেন সর্বশেষ শক্তিশালী মোঘল শাসক। ১৬০৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মারা যান। তার মৃত্যুর পর থেকে মোঘলদের পতনের যুগ শুরু হয়। আলমগীরের বংশধররা নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন।

আলমগীরের পর ক্ষমতায় আরোহণ করেন তার পুত্র কুতুবুদ্দিন মুহাম্মাদ মুআজ্জম বাহাদুর। তিনি শিয়া মতবাদ গ্রহণ করেন। তার সময়ে রাজ্যে দুর্বলতা প্রবেশ করে। শিখ ও মারাঠা সম্প্রদায় শক্তি সঞ্চয় শুরু করে। তারপর বিভিন্ন দুর্বল শাসকের ধারা অব্যাহত থাকে। এ সময় হিন্দুস্তানের বিভিন্ন প্রদেশ স্বাধীন হতে শুরু করে। পাঞ্জাবে শিখরা এবং গুজরাটে মারাঠারা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। দাক্ষিণাত্যের রাজারাও স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এদিকে ইংরেজদের ভারত দখলের পায়তারা চলতে থাকে। একপর্যায়ে ইংরেজের হাতে মোঘলদের পতন হয়। শেষ মোঘল সুলতান বাহাদুর শাহকে ১২৭৩ হিজরিতে (১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে) দেশ থেকে বিতাড়িত করার মাধ্যমে ইংরেজ শাসন পোক্ত হয়।

---

২৬. বার্নিয়ে, মানুচি প্রমুখ। -সম্পাদক

২৭. আল্লামা শিবলি নোমানি এ বিষয়ে একটি বই লিখেছেন, যার নাম *আওরঙ্গজেব আলমগির পর এক নজর*। -সম্পাদক

ভারতবর্ষে ইউরোপীয় উপনিবেশ

পর্তুগিজ

পর্তুগিজরাই প্রথম ইউরোপীয় বণিক হিসেবে ভারতে আগমন করেছিল। ৯০৪ হিজরিতে পর্তুগিজ ভাস্কো দা গামা ভারতে পৌঁছার সহজ পথ আবিষ্কার করেন। ভারতের প্রতি তার মনে গোপন অভিলাষ জাগ্রত হয়। দেশে ফিরে গিয়ে তিনি ভারতে অভিযান চালানোর অনুমতি প্রার্থনা করেন। এ প্রেক্ষিতে তাকে একটি নৌবাহিনীসহ ভারত অভিযানে প্রেরণ করা হয়। পর্তুগিজরা কেবল উপকূলের কিছু অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল। তাদের সংখ্যা খুব কম হওয়ায় ঘনবসতিপূর্ণ ভারতের অভ্যন্তরে তারা সুবিধা করতে পারেনি।

সে সময় হিন্দুস্তানি মুসলিম শাসকরা প্রথমে মামলুকদের সহায়তা প্রার্থনা করে। কিন্তু পর্তুগিজরা তাদের ওপর বিজয়ী হলে এবার সাহায্য চাওয়া হয় উসমানিদের। পর্তুগিজরা পরাজয় বরণ করে। কিন্তু এরপর হিন্দুস্তানি কিছু শাসক উসমানিদেরই স্বীয় অঞ্চল গ্রাসের আশঙ্কা নিয়ে দেখা শুরু করে। ফলে তারা উসমানি বাহিনীর প্রতি রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। উসমানিরাও এ অঞ্চল ত্যাগ করে। পর্তুগিজরা তখন হিন্দুস্তানের উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে শাসন অব্যাহত রাখে। মুম্বাইয়ের উত্তরে অবস্থিত দামান, দেউ দ্বীপ, গোয়া, মালদ্বীপের বিভিন্ন দ্বীপ, শ্রীলঙ্কা প্রমুখ এলাকায় তাদের দখল প্রতিষ্ঠিত থাকে। তারা সর্বত্র আতঙ্কের শাসন জারি রাখে। ১০৫৩ হিজরিতে শ্রীলঙ্কায় চলে নির্মম গণহত্যা। পর্তুগিজ নাবিকরা শত বছরের বেশি সময় ভারত মহাসাগরের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করেছিল।

ওলন্দাজ/ডাচ

৯৯৮ হিজরিতে ইংরেজদের হাতে স্পেনিশ নৌবাহিনী পরাজিত হয়। সে সময় নেদারল্যান্ড (যাদের ডাচ বা ওলন্দাজ বলা হয়) স্পেন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা পেয়ে ডাচরা ঘরে বসে থাকেনি। উপনিবেশ গড়ার আশায় অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলোর মতো জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সমুদ্র অভিযানে। ডাচরা এসে ভিড় করে শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ অঞ্চলে। এ ছাড়াও প্রশান্ত মহাসাগরের আরও কিছু দ্বীপে তারা উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক বাণিজ্য

পথ ডাচদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এই সুবিধাবলে তারা মশলার দাম বাড়িয়ে দেয়। ফলে ইংরেজরাও এই অঞ্চলের বাণিজ্যে প্রভাব বিস্তার করতে ডাচদের সাথে পাল্লা দিতে শুরু করে।

ইংরেজ

ডাচরা প্রয়োজনীয় মশলার দাম বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে ইংরেজরা সরাসরি প্রাচ্যের সাথে বাণিজ্য করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। প্রাচ্যে বাণিজ্যের জন্য তারা কয়েকটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে। কিছুদিন পর সব কোম্পানি মিশে গিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামে একটি কোম্পানি গড়ে তোলে। প্রথমদিকে ইংরেজদের কেন্দ্র ছিল হিন্দুস্তানের পূর্ব দিকের বিভিন্ন দ্বীপ তথা ইন্দোনেশিয়া-মালয়েশিয়া ইত্যাদি অঞ্চল। কারণ, পর্তুগিজ ও ডাচরা ইংরেজদের ভারতে ভিড়তে দিচ্ছিল না। ফলে একসময় তারা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। সে যুদ্ধে জয় লাভ করে ইংরেজরা ভারতের মাটিতে পা রাখার সুযোগ পায়। ইংরেজরা প্রথম অবতরণ করে মাদ্রাজে। এরপর একে একে সমগ্র ভারতবর্ষই তাদের করতলে চলে আসে। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা পর্যন্ত প্রায় দুইশ বছর এই শাসন অব্যাহত ছিল।

ফরাসি

ফরাসিদের প্রাচ্যনীতি ছিল হুবহু ইংরেজদের মতো। তারাও ইংরেজদের আদলে কোম্পানি গঠন করে ভারতে প্রবেশ করে। প্রত্যেক ঔপনিবেশিক কোম্পানি স্থায়ী ঘাঁটির জন্য জমি কিনে তাতে দুর্গ নির্মাণে আগ্রহী ছিল, যা ছিল ঔপনিবেশিক শাসন কায়েমের প্রথম ধাপ। ফরাসিদেরও বেশকিছু ঘাঁটি ছিল। যেমন, মুনদেশওয়ারি, ইন্দার, নায়াওয়ান, করিকাল ইত্যাদি।

উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের সূচনা

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি উপমহাদেশজুড়ে জমি কিনে দুর্গ নির্মাণ করতে লাগল। ইংরেজরা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। শুরুতে তারা এখানকার বিভিন্ন কাঁচামাল ইউরোপে রপ্তানি করত। এরপর ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পর সেখান থেকে বিভিন্ন তৈজসপত্র এ অঞ্চলে আমদানি করতে লাগল। ব্যবসায়িক কাজ পরিচালনার জন্য কোম্পানির ছিল নৌবহর। যা তাদের বাণিজ্যিক জাহাজগুলোর নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত থাকত। কিছুদিন পর কোম্পানিটি ব্যক্তি মালিকানা থেকে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে নিয়ে নেওয়া হয়। ব্রিটিশ সরকার কোম্পানির কর্তৃত্ব পাওয়ার পর থেকে খুব জোরদারভাবে ভারতে শাসন বিস্তারের চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। একের পর এক রাজ্য হস্তগত হতে থাকে ইংরেজদের। ব্রিটিশরা দেখল মুসলিমরাই এখানে তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। তাই তারা হিন্দুদের প্রতি ঝুঁকে পড়ল। বিশেষত হিন্দুদের অন্তরে পূর্ব থেকেই মুসলিম বিদ্বেষ কাজ করছিল। কারণ, তাদের ওপর ছিল মুসলিম শাসনের ছড়ি। ইংরেজরা এ সুযোগটিকে ভালোভাবে কাজে লাগিয়েছিল। পাশাপাশি খ্রিষ্টধর্মী ব্রিটিশদের অন্তরে থাকা ক্রুসেডীয় মুসলিম বিদ্বেষও তাদেরকে ভারতীয় মুসলিমদের বিরুদ্ধে হীন উপায় গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করছিল। ফলাফল যা হওয়ার তাই হলো। মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দু, শিখ, মারাঠাদের শক্তিশালী করে তুলল ইংরেজশক্তি। পরিশেষে তাদের হাতে উঠে এলো হিন্দুস্তান শাসনের ছড়ি।

ভারতবর্ষে মোঘল সাম্রাজ্যের পতন

ইংরেজরা রাজ্য দখল করে হিন্দুদের সাথে মিত্রতা করত, আর নির্যাতন চালাতো মুসলিমদের ওপর। তবে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর হিন্দু মুসলিম সবাই বেনিয়াদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়ে। কারণ, দেশের অর্থব্যবস্থা তখন তারাই নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। পুরো অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে যাওয়ার পর দেশজুড়ে দারিদ্র্যের বিস্তার ঘটে।

অনেক ধরনের অবিচারের মধ্যে একটি ছিল, সৈনিকদের মধ্যে শূকরের চর্বি দিয়ে তৈরি টোটা বন্দুকে ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা। এই ঘটনার পর মুসলিম সৈনিকদের মাঝে প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা এ কাজ

বর্জন করে। কারণ, ইসলামে শূকর বা শূকরজাত যেকোনো বস্তু ব্যবহার হারাম। সরাসরি বিশ্বাসের ওপর আঘাত মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না কেউ। ইংরেজরা কঠিন হাতে মুসলিম প্রতিবাদীদের দমন করে। এই নিপীড়নের ফলে অন্যান্য মুসলিম সৈনিকের মনে বিদ্রোহ দানা বাঁধে। তারা কতিপয় ইংরেজ অফিসারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাদের একজনকে হত্যা করে। তারপর সবাই পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয় শেষ মোঘল সুলতান বাহাদুরের কাছে। দেশের প্রায় সর্বত্র বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু অতি দ্রুততার সাথে ইংরেজরা বিশাল বাহিনী নিয়ে দিল্লি অবরোধ করে। এরপর উন্নত অস্ত্রের বলে অল্প সময়ের মধ্যেই দিল্লি দখল করে নেয়। সম্রাট বাহাদুরকে গ্রেফতার করে তার সামনেই তার সন্তানদের হত্যা করা হয়। এমনকি তার সন্তানের গোশত রান্না করে তার সামনে পেশ করার মতো নৃশংসতাও দেখিয়েছিল ব্রিটিশ বাহিনী। সম্রাটকে তৎকালীন বার্মার রাজধানী রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়।

এভাবে ব্রিটিশ সরকার কাগজে-কলমে টিকে থাকা মোঘল রাজত্বেরও ইতি টেনে দেয়। পুরো ভারতে ব্রিটিশ শাসনের আনুষ্ঠানিক পর্ব শুরু হয়। তারা কঠিনতর নির্যাতন চালায় মুসলিমদের ওপর। অসংখ্য মসজিদ বিনাশ করে। সহায়সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। অনেক মসজিদকে সেনাছাউনিতে রূপান্তর করে। হিন্দু সম্প্রদায় এসব কাজকে স্বাগত জানায়। কখনো নিজেরাও এসব পাশবিক কাজে ইংরেজদের সাথে অংশগ্রহণ করত।

ব্রিটিশ শাসনযন্ত্র মুসলিম সমাজের ওপর নির্যাতন করেই ক্ষান্ত ছিল না। তারা হিন্দুদের জন্য আধুনিক বিদ্যালয় চালু করে এবং তাদেরকে পশ্চিমা সভ্যতার সাথে পরিচিত করে তোলে। কিন্তু একই সময়ে মুসলিমরা ঘৃণাভরে ইংরেজদের শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করেছিল। কারণ, এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষা ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষমূলক ছিল। পাশাপাশি খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের কাজ করত। ফলে গতকালের রাজা আজ রাজ্য হারিয়ে অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের ফাঁদে আটকা পড়ে। এরপরও কোথাও কোথাও কয়েকটি স্বাধীন ও ইংরেজ নিযুক্ত মুসলিম শাসকের মুসলিম রাজ্য টিকে ছিল। মুসলিমরা সংখ্যালঘু হলেও তাদের শাসনে সংখ্যাগুরু হিন্দুরা অভ্যস্ত ছিল। সবাই স্বাভাবিক জীবনযাপন করত।

মুসলিমদের সর্বশান্ত করতে এবং ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে চেষ্টার কমতি ছিল না ব্রিটিশদের। তার অংশ হিসেবে একদিকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ

জাগ্রত করা, অন্যদিকে মুসলিমদের বিচ্ছিন্ন করতে তাদের মাঝে নব্য বিভিন্ন ফেরকা সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা চলতে থাকে। এর অংশ হিসেবে সম্রাট আকবরের রেখে যাওয়া মিশ্রধর্মীয় চিন্তাধারার পুনর্জাগরণ করা হয়। জন্ম দেওয়া হয় মির্জা কাদিয়ানী নামের এক ভণ্ড নবি দাবিদারকে। তার ভ্রান্ত দলটিও দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটির নাম 'লাহোরি' (আহমাদ আলি লাহোরির নেতৃত্বাধীন গ্রুপ) আরেকটি আরেকটির নাম 'কাদিয়ানি'। জন্মলগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত ব্রিটিশরা কাদিয়ানিদের সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর প্রতিটি ভূখণ্ডে ইসলামের বিরোধিতা করতে তাদের সহযোগিতা দিয়েছে।

এতৎসত্ত্বেও উপনিবেশক শক্তির বিরুদ্ধে সবসময় সোচ্চার ছিল মুসলিম সমাজ। তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দল ও প্লাটফর্ম তৈরি করা হয়। আর ইংরেজ ও হিন্দুরা একযোগে সর্বদা মুসলিমদের প্রতিকূলে অবস্থান করতে থাকে।

হিন্দুস্তানের মুসলিমদের মধ্যে বিশ্ব রাজনীতির প্রভাব

বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের ওপর সে সময় যা কিছু ঘটছিল, ভারতের মুসলিমরা তার প্রভাবমুক্ত ছিল না। ১৩৩৭ হিজরিতে (১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে) খিলাফতের ওপর আঘাতের পর ভারতজুড়ে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় বইতে থাকে। কারণ, খিলাফত পতনের পেছনে ইংরেজরা কলকাঠি নাড়ছিল। ওদিকে ইতালির সেনারা লিবিয়া দখল করে নেয়। এ ঘটনাতেও তীব্র অসন্তোষ ছিল জনমনে। পাশাপাশি আরবের ওহাবি আন্দোলনের তীব্রতাও ভারতে অনুভূত হচ্ছিল। ইন্দোনেশিয়ার মুসলিমদের ওপর ডাচদের অত্যাচারের ঘটনাও এখানে তুমুল দ্রোহে সমালোচিত হচ্ছিল। অন্যদিকে ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমিতে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা চরমভাবে প্রত্যাখ্যান করে হিন্দুস্তানের মুসলিমরা। মোটকথা, বিশ্বের যেখানেই মুসলিমরা নির্যাতিত, লাঞ্ছিত বা বঞ্চিত হচ্ছিল, সেসব ব্যাপারে হিন্দুস্তানের মুসলিমরা ছিল সচেতন এবং তাদের বেদনায় তারাও ছিল ব্যথিত।

এতৎসত্ত্বেও তারা চিন্তাচেতনায় শতধাবিভক্ত ছিল। যেভাবে ছিল আহলুস সুন্নাহর অনুসারী, তেমনই ছিল ভ্রান্ত শিয়াবাদের অনুসারী, ছিল ইসমাইলি, কাদিয়ানি ইত্যাদি। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেও তারা ঐক্যবদ্ধ ছিল না। কেউ চাইত ইংরেজ থেকে স্বাধীনতার পর হিন্দু মুসলিম এক দেশে বসবাস

করুক। তাদের আশা ছিল, এমন হলে তারা নির্বিঘ্নে দাওয়াতের কাজ করতে পারবে। আবার কেউ চাইত, উপনিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে হিন্দুদের থেকে পৃথক খাঁটি এক ইসলামি রাষ্ট্র। কারণ, হিন্দুদের অন্তরে সর্বদা বিরাজ করে মুসলিমদের প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষ ও হিংসা। তাই তাদের সাথে এক দেশে বাস করা কল্যাণকর হবে না। এই চেতনা লালন করতেন পাকিস্তানের বিখ্যাত কবি ও দার্শনিক আল্লামা ইকবালও। সে সময় হিন্দুস্তানের মানুষের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক প্লাটফর্ম ছিল 'কংগ্রেস' যার নেতৃত্বে ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। তিনি ছিলেন গোঁড়া হিন্দু, তবে তার মধ্যে মুসলিমদের প্রতি কিছুটা নমনীয়তাও ছিল। কারণ, তাদের সমর্থনও তার প্রয়োজন ছিল। আরেকটি দল ছিল 'মুসলিম লিগ', যার নেতৃত্বে ছিলেন মুহাম্মাদ আলি জিন্নাহ। মুসলিম লিগই পৃথক ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য সংগ্রাম করছিল।

হিন্দুস্তানের স্বাধীনতা ও দেশভাগ

ইংরেজরা সর্বক্ষেত্রে মুসলিমদের ওপর হিন্দুদের প্রাধান্য দিত ঠিক, তবে এই শ্বেতসন্ত্রাসীদের নিকট মূলত ভিনজাতি প্রতিটি গোষ্ঠীর ওপরই রয়েছে অবহেলা। সফলতার নাগাল পেতে যে কাউকে সেতু বানানোর হীন উপায় অবলম্বনেও তাদের কুণ্ঠা নেই। ইংরেজরা যুদ্ধে লড়ার জন্য সেনাবাহিনীতে প্রচুর পরিমাণে হিন্দুস্তানি সদস্য অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ, লড়াইয়ের ময়দানে নিজেদের গা বাঁচিয়ে অন্যদের সামনে পাঠিয়ে দেওয়াটা ছিল খুবই নিরাপদ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন চরম আকার ধারণ করে, জাপানি বাহিনী মায়ানমার পর্যন্ত চলে আসে, তখন হিন্দুস্তান নিয়ে শঙ্কায় পড়ে যায় ইংরেজ সরকার। কারণ, জাপানি আক্রমণের সুযোগে হিন্দুস্তানিরা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উঠতে পারে। তাই পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা দেয়, যুদ্ধ শেষ হলে হিন্দুস্তানকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে। এই ভিত্তিতে হিন্দুস্তানিদেরকে যুদ্ধে আরও বেশি সক্রিয় করে তোলে ব্রিটেন।

এ সময় ভারতীয় বাহিনীকে বিপজ্জনক সব অভিযানে সামনে ঠেলে দিতে থাকে। যার উদাহরণ দেখা যায় আলামেইন ময়দানে। সে সময় মাইনফিল্ড পরিষ্কার করার জন্য পশু ব্যবহার করা হতো। আত্মহুতি দিয়ে নিরীহ প্রাণীগুলো ময়দানকে মাইনমুক্ত করত। এই যুদ্ধে একটি মাইনফিল্ড পরিষ্কার করার কাজে পর্যাপ্ত পশু ছিল না। ফলে আত্মহুতি দিতে এক দল ভারতীয় সৈনিককে মাইনফিল্ডে ছেড়ে দেওয়া হলে সব সৈনিক মারা

পড়ে। এ ঘটনায় হিন্দু-মুসলিম সবার অন্তরেই ইংরেজদের প্রতি নতুন করে ক্ষোভ বৃদ্ধি পায়।

১৩৬৬ হিজরিতে (১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে) বিভক্ত হয়ে দুটি নতুন দেশের জন্মের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয় উপমহাদেশ। একটি দেশ হিন্দুদের, যার নাম ইন্ডিয়া। অন্যটি মুসলিমদের, যার নাম পাকিস্তান তথা পবিত্র ভূমি। হিন্দুস্তানের প্রতিটি স্বাধীন রাজ্যকে নতুন দুটি দেশের যেকোনো একটিতে যোগ দেওয়ার কিংবা চাইলে স্বাধীন থাকার সুযোগ দেওয়া হয়ে। এই বিভক্তি গান্ধী ও তার নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস নেতারা মেনে নিতে চায়নি। তারা চেয়েছিল অখণ্ড ভারত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মুসলিম লিগের চাওয়াই শেষ পর্যন্ত পূর্ণ হয়।

উত্তরপূর্ব ভারত তথা পূর্ব বাংলা ও আসামের কিছু অংশ এবং উত্তরপশ্চিম ভারতের কিছু অঞ্চল তথা পাঞ্জাব প্রদেশের বড় একটা অংশ, সিন্ধু প্রদেশ ও বেলুচিস্তান মিলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের পত্তন হয়। যার রাজধানী করা হয় করাচিকে। আর বাকি সমস্ত অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় ইন্ডিয়া, যার রাজধানী প্রথমে ছিল দিল্লি, পরে হয় নয়াদিল্লি।

পাকিস্তান ও ইন্ডিয়া উভয়েই পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করেছিল। তবে তারা কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর অন্তর্ভুক্ত থেকে যায়। এই আন্তর্জাতিক সংগঠনটি হলো ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের সাক্ষী। ইংল্যান্ড থেকে স্বাধীন হওয়া দেশগুলো এর অন্তর্ভুক্ত। ইংল্যান্ডের রাজপরিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং পূর্বের শাসক ও শাসিতদের মাঝে কূটনৈতিক সুসম্পর্ক বজায় রাখা এই সংগঠনের উদ্দেশ্য।

ইংরেজ কর্তৃক এই দেশভাগ মোটেও ন্যায়ভিত্তিক ছিল না। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা ও পাঞ্জাবের পুরো ভূখণ্ড পাকিস্তানে না দিয়ে হিন্দুদের জন্য প্রদেশ দুটোকে দুই ভাগ করে ফেলা হয়। তা ছাড়া কিছু স্বাধীন রাজ্য পাকিস্তানে যুক্ত হতে চেয়েছিল। যেমন গুজরাটের জুনাগাধ রাজ্যের মুসলিম শাসক চেয়েছিলেন পাকিস্তানে যোগ দিতে। তেমনই হায়দারাবাদের মুসলিম শাসকও পাকিস্তানে যোগ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভারত উভয় রাজ্যের দাবি প্রত্যাখ্যান করে সৈন্য প্রেরণ করে রাজ্যগুলো দখল করে নেয়। নেপাল ও ভুটান ব্রিটিশ শাসন থেকেও মুক্ত ছিল। তাই দেশ দুটির বৌদ্ধ অধিবাসীরা স্বাধীনতা বজায় রাখে। তারপর ১৩৯৫ হিজরিতে (১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে) সিকিম ভারতে যুক্ত হয়।

শ্রীলঙ্কা ১৩৬৭ হিজরিতে ভারত থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। আর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র মালদ্বীপ ১৩৭৩ হিজরিতে শ্রীলঙ্কা থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। দেশভাগের সময় হিন্দুস্তানজুড়ে ভয়াবহ দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখা দেয়। নানা জায়গায় মুসলিমরা হিন্দুদের হাতে নির্যাতিত হয়। বহু মুসলিম হিজরত করে নতুন মুসলিম দেশে পাড়ি জমায়। যাওয়ার পথে ট্রেনেও তারা হিন্দুদের আক্রোশের মুখে পড়ে। ট্রেনগুলো আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

কাশ্মীর সংকট

কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ভৌগোলিক অবস্থান অসাধারণ। সুউচ্চ পাহাড়ি ভূমি কাশ্মীরকে দিয়েছে অনন্য স্বতন্ত্রতা। সৌন্দর্যের পাশাপাশি দুর্গম ও অজেয় এক দুর্গ যেন এ ভূমি। বহুদিন পর্যন্ত মুসলিম সেনাবাহিনী কাশ্মীর জয় করতে পারেনি। হিজরি অষ্টম শতকে শামসুদ্দিন শাহ মির্জা নামে এক ব্যক্তি খোরাসান থেকে কাশ্মীর আগমন করেন। তিনি এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন মূর্তিপূজারি রাজার দরবারে। তার যোগ্যতায় মুগ্ধ হয়ে রাজা তাকে কাছে টেনে নেন। তিনি রাজা ও রাজপুত্রের পক্ষ থেকে বিশাল জায়গির লাভ করেন। সেখানে ছোট পরিসরে শুরু হয় শাহ মির্জার রাজত্ব।

পূর্বের হিন্দু রাজার মৃত্যুর পর রাজ্যের ভার গ্রহণ করেন তার স্ত্রী। এদিকে শাহ মির্জা রানিকে বিয়ে করে নেন। রানি ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু কোনো কারণে তিনি শাহ মির্জাকে ত্যাগ করতে চাইলে মির্জা তাকে কারাবন্দি করেন এবং নিজেকে কাশ্মীরের শাসক ঘোষণা করেন। তার রাজবংশ দুই শতাব্দীরও বেশি সময় (৭৪৪-৯৭০ হিজরি) কাশ্মীর শাসন করে। এই বংশের শেষ সময়ে মোঘল সম্রাট আকবর কাশ্মীরের দিকে অগ্রসর হন। বেশ সময় ধরে কাশ্মীর শাসিত হয় মোঘল বংশের হাতে। মোঘল আমলে কাশ্মীরে ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করে। একসময় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মুসলিম হয়ে যায়।

১১৬৪ হিজরিতে মোঘলদের পতন ঘটলে ক্ষমতায় আসে আফগান দুররানিরা। ১২৩৪ হিজরি (১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত তারা কাশ্মীর শাসন করে। এ সময় আরও দ্রুত ইসলামের প্রসার ঘটে। তারপর ইংরেজদের সহায়তায় শিখরা ১২৩৪ হিজরিতে কাশ্মীর দখল করে নেয়। শিখরা এসেই শুরু করে মুসলিমদের ওপর দমন-পীড়ন। আগুন দিয়ে ধ্বংস

করতে থাকে মসজিদ। অনেক মসজিদকে আস্তাবলে পরিণত করা হয়। শিখদের বিরুদ্ধে কাশ্মীরি জনতার মাঝে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। অবস্থা বেগতিক দেখে ইংরেজরা ১২৬২ হিজরিতে (১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে) শিখদের হাত থেকে কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। তারপর ডোগরা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোলাপ সিংহের কাছে একশ বছরের জন্য ৭৫ লাখ রুপির বিনিময়ে কাশ্মীরকে বিক্রি করে দেয়। শিখদের আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক রাজধানী অমৃতসরে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়। ডোগরা রাজবংশ ক্ষমতায় এসে মুসলিমদের ওপর নতুন করে অত্যাচার শুরু করে। চাপিয়ে দেওয়া হয় দুঃসহ করের বোঝা। মুসলিম ভূমিসমূহ বাজেয়াপ্ত করা শুরু হয়। কাশ্মীরি মুসলিমরা নিজ দেশে পরবাসী হয়ে পড়ে। গরু জবাই নিষিদ্ধ করা হয়। গরু জবাইয়ের শাস্তি নির্ধারণ করা হয় মৃত্যুদণ্ড। পরে তা কমিয়ে দশ বছর কারাদণ্ডের বিধান করা হয়।

নানামুখী নির্যাতন থেকে রেহাই পেতে বহু কাশ্মীরি লোক পাঞ্জাবে হিজরত করে। এদিকে ইংরেজ সরকার শাসক পরিবারের এসব নিপীড়নমূলক কাজে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছিল। কালক্রমে কাশ্মীরের বিভিন্ন ইসলামি আন্দোলন হিন্দু শাসক ও ইসলামবিদ্বেষী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। এরমধ্যেই ১৩৬৬ হিজরিতে (১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে) চলে আসে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা ও দেশভাগের মুহূর্ত। মুক্তির এই মোক্ষম সময়ে কাশ্মীরের মুসলিম জনগোষ্ঠী পাকিস্তানকেই স্বদেশ হিসেবে গ্রহণ করতে চায়। কিন্তু বাধ সাধে হিন্দু শাসক। রাজা কাশ্মীরি ও বহিরাগত হিন্দুদের দিয়ে কাশ্মীরের পাকিস্তানে যোগ দেওয়া ঠেকাতে সচেষ্ট হয়। হিন্দু আন্দোলনকারীরা মুসলিমদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। একটি দাঙ্গা সৃষ্টি করে পরিস্থিতি ঘোলা করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। এই দাঙ্গায় ১ লক্ষ ৩৭ হাজার মুসলিম নিহত হয়। ফলে কাশ্মীরের সাধারণ মুসলমান বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। কাশ্মীরি রাজা বিক্ষোভকারীদের ওপর কঠিন পুলিশি অভিযান চালায়। বহু লোককে জেলে ঢোকানো হয়। এই প্রেক্ষিতে নানাদিক থেকে মুজাহিদ বাহিনী কাশ্মীরের মুক্তি সংগ্রামে তাদের ভাইদের পাশে এসে দাঁড়ায়। মহারাজা হরি সিং ভারতে পালিয়ে যায়। কাশ্মীরের কিছু অংশ মুজাহিদদের মেহনতে আজাদ হয়। ৮০% মুসলিম থাকা সত্ত্বেও কাশ্মীরের মূল ভূখণ্ড ভারতের সীমানায় থেকে যায়। কাশ্মীর ইস্যুতে দেশভাগের সাধারণ নিয়মটি মানা হলো না। মূলনীতি ছিল মুসলিম

অধ্যুষিত অঞ্চল পাকিস্তানে আর হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল ভারতে যোগ দেবে।

জাতিসংঘ এ সময় কাশ্মীরে গণভোট করার ব্যাপারে ভারত ও পাকিস্তানকে রাজি করায়। কিন্তু দেখা গেল, এই উদ্যোগ ভারতের সেনাবাহিনীকে কাশ্মীরে প্রবেশ করানোর একটা অসিলা মাত্র। ভারত সরকার মহারাজাকে সহায়তা করতে বিশাল বাহিনী পাঠিয়ে দেয়। তারা ঘোষণা করে, যারা পাকিস্তানে হিজরত করতে ইচ্ছুক তাদের সহায়তা দেওয়া হবে। মুহাজিরদের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় জমা হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু যখন অনেক মানুষ মুহাজির শিবিরে একত্রিত হলো তখন তাদের ওপর চালানো হয় নৃশংস হামলা। এ ঘটনায় প্রায় ৫ লক্ষ মুসলমান শাহাদাত বরণ করে। আর সমপরিমাণ মানুষ পাকিস্তানে হিজরত করতে সক্ষম হয়।

হিন্দু সেনাবাহিনী বহু মুসলিম নারীকে নির্যাতন করে। খুন, ধর্ষণ, এমনকি নৃশংসভাবে নারীদের স্তন কেটে ফেলার মতো অমানুষিক নিপীড়ন চলে পরিবারের সামনেই। কয়েক লক্ষ মুসলিমকে হত্যা করা হয়। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, অচিরেই যুদ্ধ বেধে যায় মুজাহিদ এবং হিন্দু ভারতীয় বাহিনীর মাঝে। এটি ছিল ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত ভারত-পাকিস্তানের প্রথম যুদ্ধ। যুদ্ধের মাধ্যমে মুজাহিদরা কাশ্মীরের উল্লেখযোগ্য এলাকা স্বাধীন করতে সক্ষম হয়। এই অংশ আজও আজাদ কাশ্মীর নামে পাকিস্তানের সাথে রয়েছে। মুজাহিদরা হিন্দু বাহিনীর অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেয়। লড়াই মারাত্মক আকার ধারণ করে। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পাকিস্তান বাহিনী ও মুজাহিদরা কাশ্মীরি স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাদের সহায়তা দিয়েছিল।

বিশাল বাহিনী নিয়েও ভারত আজাদ কাশ্মীরে প্রবেশ করতে পারল না। মুজাহিদরা তাদের ঠেকিয়ে রাখে শক্ত অবস্থান নিয়ে। অস্ত্রশস্ত্রে ভারতীয়দের চেয়ে অনেক দুর্বল হলেও মূলত মুজাহিদিনের ঈমানি জোরের কারণে কাশ্মীরে ভারতের আগ্রাসন বাধাগ্রস্ত হয়। এই দীর্ঘ সময়ে জাতিসংঘ ছিল কাশ্মীরের ব্যাপারে নীরব। তারা ধারণা করেছিল, ভারত এই সময়ের মধ্যে কাশ্মীর আয়ত্তে নিয়ে নেবে। আর সবকিছু হচ্ছিল জাতিসংঘের হর্তাকর্তা, বলা ভালো জাতিসংঘের ছদ্মবেশে পুরো বিশ্বের হর্তাকর্তা খ্রিষ্টান দেশগুলোর নীরব সম্মতিতে।

অবশেষে ১৩৬৮ হিজরিতে জাতিসংঘ যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানাতে বাধ্য হয়। জাতিসংঘ থেকে বলা হয়, বিদেশি সৈনিকরা কাশ্মীর ত্যাগ করবে। তারপর সেখানে এক গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। গণভোটেই নির্ধারিত হবে কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ। প্রকাশ্যভাবে ইন্ডিয়া এই যুদ্ধবিরতির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। কিন্তু অধিকৃত অংশে তাদের সেনা উপস্থিতি অব্যাহত থাকে। এরপর ১৩৭৭ হিজরিতে সমস্ত রাখঢাক ছুড়ে ফেলে প্রকাশ্যেই কাশ্মীরকে ইন্ডিয়ার অংশ বলে ঘোষণা করা হয়। অধিকৃত অঞ্চলে মুসলিম জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে বাহির থেকে হিন্দুদের কাশ্মীরে পাঠানো হয়। আর মুসলিমদের ওপর অত্যাচার-জুলুম যেন পুলিশদের তিন বেলা খাবারের মতোই রুটিনমাফিক কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

শুধু শারীরিক ও আর্থিক নিপীড়নই নয়; বরং কাশ্মীরি মুসলিমদের স্বাধীনতার স্বাদ ভুলিয়ে দিতে ও চিন্তাগতভাবে দুর্বল করে দিতে তারা নানা উপকরণ ব্যবহার করে। গোয়েন্দা সংস্থার লোকদেরকে স্পেন, রাশিয়াতে প্রেরণ করা হয়। তারা স্পেনিশ ও তাতার মুসলিমদের কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিল সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করে আসে।

মুসলমানদের দ্বীন ও সংস্কৃতি ধ্বংস করার ভারতীয় ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করতে মুসলমানরা ঝাঁপিয়ে পড়ে কঠিন সংগ্রামে। জিহাদের ধ্বনি উচ্চারিত হয় দিকে দিকে। ইত্তিহাদে ইসলামি নামে মুজাহিদদের একটি ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়ে 'তাহরিরে জম্মু-কাশ্মীর' নামে নতুন সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে।

ঠিক সে সময় পাকিস্তানেও অনেক রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জামাআতে ইসলামি। তারা পাকিস্তানজুড়ে শরিয়া প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করে। দলটির প্রতিষ্ঠাতা হলেন আবুল আলা মওদুদি।

নবগঠিত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন মুহাম্মাদ আলি জিন্নাহ। তার সময়েই প্রথম ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিছুদিন পর জিন্নাহর ইনতেকাল হয়। তার উত্তরসূরি হন খাজা নাজিমুদ্দিন। তারপর ক্ষমতায় বসেন গোলাম মুহাম্মাদ। তারপর আসেন সেকান্দার মির্জা। তার সময়ে পাকিস্তান থেকে ডোমিনিয়নব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়। ১৩৭৮ হিজরিতে (১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে) ক্ষমতায় আসেন আইয়ুব খান। তিনি ছিলেন একজন সামরিক শাসক। সেনাবাহিনীর ওপর ভর করে দীর্ঘদিন দেশ শাসন করেন।

কাশ্মীরের নিকটবর্তী হওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি করাচি থেকে রাওয়ালপিন্ডিতে (বর্তমান ইসলামাবাদ) রাজধানী স্থানান্তর করেন। আইয়ুব খান একসময় জামাতে ইসলামির ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। জামাতের নেতাদের গ্রেফতার ও তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন।

দ্বিতীয় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ

(১৩৮৫ হিজরি/১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দ)

কিছুদিন পর কাশ্মীর ইস্যুতে আবারও ভারত-পাকিস্তানের মাঝে যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধের শিখা পশ্চিম পাকিস্তানেই বেশি ছড়িয়ে পড়ে। কারণ, পূর্ব সীমান্ত দিয়ে পাকিস্তানে প্রবেশ করলে চীনের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার হুমকি ছিল। পূর্ব থেকেই চীন-ভারত সীমান্ত এলাকায় উভয় দেশের দ্বন্দ্ব চলে আসছিল। ১৩৬২ হিজরির এক লড়াইয়ে ভারত চীনের কাছে পরাজিত হয়। তারই জের ধরে চীন পাকিস্তানকে সমর্থন জানিয়েছিল। এই যুদ্ধে পাকিস্তানি যোদ্ধারা দারুণ সাহসের প্রদর্শনী করে। যুদ্ধে পাকিস্তান যখন জয়ের দ্বারপ্রান্তে তখনই জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ থেকে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানানো হলো। তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ার অধীন উজবেকিস্তানে এই পরিষদের 'তাসখন্দ বৈঠক'টি অনুষ্ঠিত হয়। এতে সিদ্ধান্ত হয়, শান্তিপূর্ণভাবে কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের জন্য কাশ্মীর যুদ্ধের আগের অবস্থানে ফিরে যাবে। প্রত্যেকেই সকল যুদ্ধবন্দি ফিরিয়ে দেবে। এভাবে কৌশলি হস্তক্ষেপে পাকিস্তান ও কাশ্মীরের মুসলিমদের হাতের মুঠো থেকে বিজয় ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত ও খ্রিষ্টানবিশ্ব পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ঐক্য ভাঙার প্রচেষ্টা চালাতে থাকে—যাতে মুসলমানরা বিভক্ত পড়ে এবং তাদের শক্তি ও প্রতিপত্তি দুর্বল হয়ে যায়। এদিকে পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) রাজনৈতিক অঙ্গনে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের আবির্ভাব ঘটে। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা দাবি করেন। অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টো। পূর্ব পাকিস্তানে একের পর এক বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। অবশেষে ১৯৬৯ সাল মোতাবেক ১৩৮৯ হিজরি সনে (গণঅভ্যুত্থানের মুখে) প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন। তারপর ক্ষমতায় আসেন জেনারেল ইয়াহিয়া খান। তিনি ছিলেন শিয়া মতাবলম্বী।

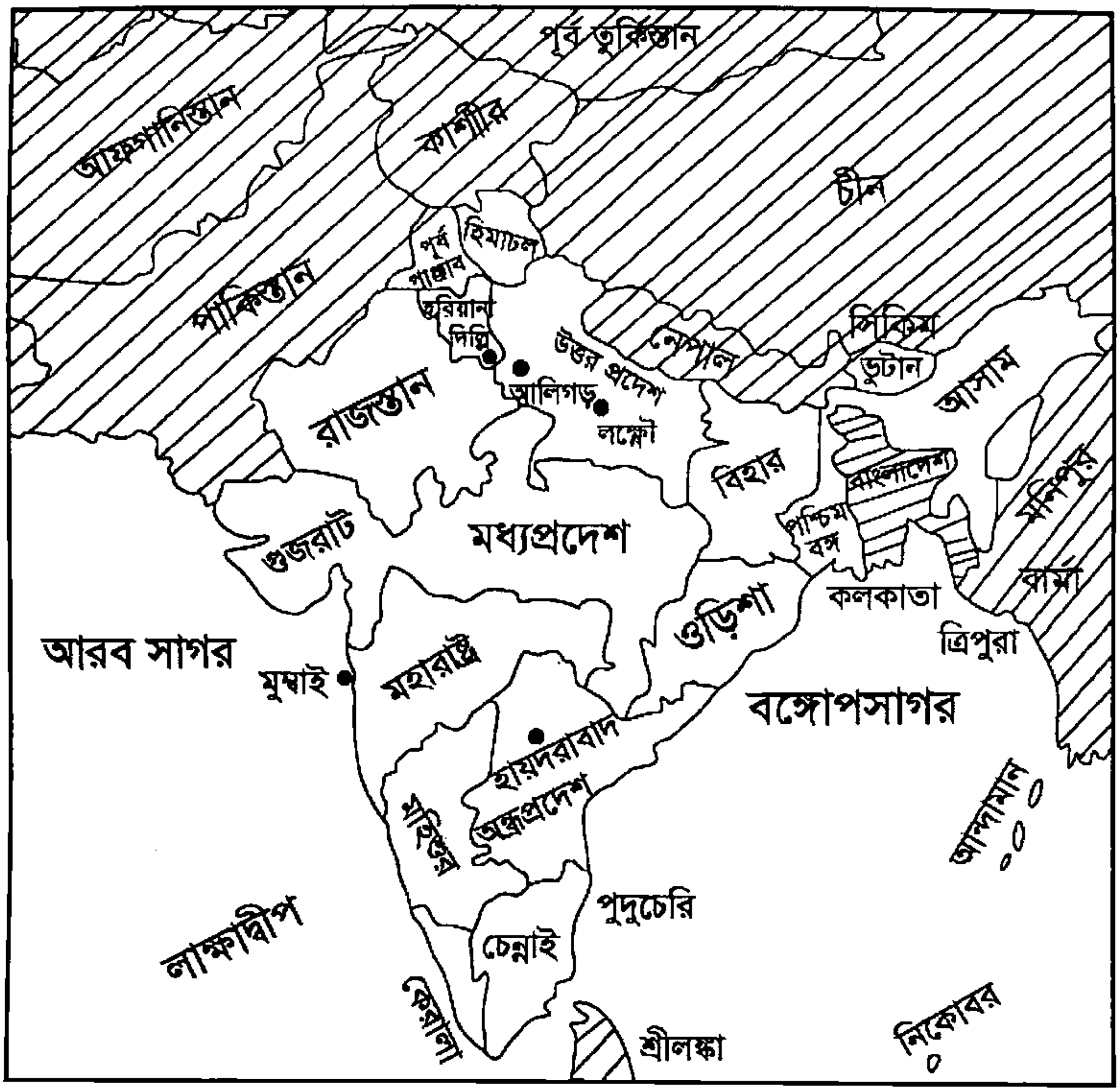
তার দমননীতির কারণে দেশে অস্থিরতা ও নৈরাজ্য আরও বেড়ে যায়। এই উত্তাল সময়ে ভারত শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের এই আন্দোলনের সমর্থনে দাঁড়িয়ে যায় এবং হিন্দুদেরকে তার সমর্থন ও সাহায্যে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানায়। আমেরিকাও শেখ মুজিবকে সমর্থন করে—আবার একইসঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলি ভুট্টোর আন্দোলনকেও সমর্থন করে। শিয়া ও কাদিয়ানিরা ভুট্টোর সাহায্যে এগিয়ে আসে। পাকিস্তানকে দুই ভাগে বিভক্ত করতে এভাবে দানা বেঁধে ওঠে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত।

১৯৭১ সালে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি করাকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। অস্থিরতা ও গোলযোগ ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে। সেই সঙ্গে ব্যাপক অবনতি ঘটে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির। এমন সময় গ্রেফতার করা হয় শেখ মুজিবুর রহমানকে। ফলে পূর্বপাকিস্তানজুড়ে বয়ে যায় তীব্র বিক্ষোভ ও আন্দোলনের জোয়ার। অবস্থা বেগতিক দেখে প্রায় নয় মিলিয়ন মানুষ পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেয়—যাদের বেশির ভাগই হিন্দু। ভারতও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য আঘাতের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে। বিদ্রোহীরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। বিশেষত ইহুদি গোষ্ঠী। তাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করে, তারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করবে।

একপর্যায়ে বাংলাদেশে স্বাধীন পতাকা ওড়ে। নতুন দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু ১৯৭৫ সালে এসে শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। ক্ষমতায় আসেন খন্দকার মুশতাক আহমদ। কিন্তু এরপর টানা গোলযোগ চলতে থাকে। তারপর ক্ষমতায় আসেন খালেদ মোশাররফ। তারপর প্রেসিডেন্ট হন জিয়াউর রহমান। ১৯৮১ সালে একটি সামরিক ক্যুতে তিনিও নিহত হন। তারপর প্রেসিডেন্ট হন আব্দুস সাত্তার। এরপর ক্ষমতায় আসেন সামরিক শাসক হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ। এরশাদ পরবর্তী সময়ে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বরাবরই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসছেন খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা।

অন্যদিকে ইয়াহিয়া খানের পর পাকিস্তানের ক্ষমতায় আসেন জুলফিকার আলি ভুট্টো। একপর্যায়ে পাকিস্তানে রাজনৈতিক সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। জুলফিকার আলি ভুট্টোর পদত্যাগের দাবিতে বিশাল আন্দোলন শুরু হয়।

অবশেষে ১৯৭৭ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। এই অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেন মুহাম্মদ জিয়াউল হক। ১৯৭৮ সালে তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জামাতে ইসলামির সঙ্গে তার ভালো সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই সংগঠনের আমির ছিলেন জিয়াউল হকের মামা। তিনি জামাতে ইসলামির অনেক নেতাকে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেন। তবুও সামরিক শাসন জারি করার কারণে জামাতে ইসলামি জিয়াউল হকের বিরোধিতা করে। ১৯৭৯ সালে জনৈক রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে খুনের অভিযোগে জুলফিকার আলি ভুট্টোকে ফাঁসি দেওয়া হয়। জিয়াউল হক আমেরিকার সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন। রুশবিরোধী জিহাদে তিনি আফগান মুজাহিদদের সাহায্য করেন। আফগান শরণার্থীদের জন্য তিনি সীমান্ত খুলে দেন। আফগানিদের তিনি অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করেন। অস্ত্র যোগানদাতাদের তালিকায় আমেরিকা ছিল সবার আগে। তবে তা মুসলমানদের প্রতি ভালোবাসার কারণে নয়; বরং প্রতিপক্ষ রাশিয়াকে দমানোর লক্ষ্যে এবং উভয় দেশের মাঝে চলমান শীতল যুদ্ধের কারণে। শেষ দিনগুলোতে জিয়াউল হক শরিয়া শাসন জারির ঘোষণা দিয়েছিলেন। ১৯৮৮ সালে একটি বোমার বিস্ফোরণে তিনি প্রাণ হারান। কারা বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল তা আজও পর্যন্ত জানা যায়নি। তারপর গোলাম ইসহাক খান ক্ষমতায় আসেন এবং মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন।



মানচিত্র নং-১৬

ভারতের রাজ্যসমূহের বর্তমান মানচিত্র

ভারতীয় মুসলিমদের বর্তমান অবস্থা

ভারতের বর্তমান মুসলিম জনসংখ্যা নয় কোটির বেশি (রচনাকালীন জরিপ)। এই বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত মার খাচ্ছে হিন্দুদের হাতে। নানারকম অত্যাচার ও অপমানের জীবনই যেন তাদের নিয়তি। প্রায়ই বিভিন্ন প্রদেশে মসজিদ ভেঙে ফেলা হচ্ছে।

প্রশ্ন জাগে, উত্তর আফ্রিকা কিংবা প্রাচীন রোম-পারস্য অঞ্চলে যেভাবে দ্রুত ইসলামের বিস্তার ঘটেছিল, ভারত উপমহাদেশে সেরকম হয়নি কেন? অথচ শতাব্দীর পর শতাব্দী সমগ্র ভারত শাসন করেছে মুসলিম শাসকগণ। এর তত্ত্ব তালাশ করতে গেলে বেশকিছু ব্যাপার পাওয়া যায়। যেমন :

ভারত শাসনকারী মুসলিম গোষ্ঠীগুলোর অধিকাংশ ছিল ইসলাম গ্রহণে তুলনামূলক নবীন। দেখা যায়, মাত্র কয়েক প্রজন্ম আগে তাদের পূর্বপুরুষ ইসলাম কবুল করেছিল। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের সাথে তাদের দৃঢ় সম্পর্ক ছিল না। সঠিক দ্বীনি পরিবেশে তারা লালিত হয়নি। এসব কারণে তাদের দ্বীনি চেতনাবোধ ছিল তুলনামূলক কম। রাজ্যশাসন আর সাম্রাজ্য বিস্তারেই ছিল তাদের মূল মনোযোগ। পাশাপাশি তারা সবাই ছিল অনারব বিভিন্ন তুর্কি বা আফগান গোত্র থেকে আগত। আরবি ভাষার সাথে সম্পর্কহীন হওয়ায় দ্বীনি ইলম ও অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় থেকেও তারা ছিল একপ্রকার বিচ্ছিন্ন।

কিছু কিছু শাসক ছিল, যারা জনগণের মনোরঞ্জনের জন্য সব ধর্মকেই প্রশ্রয় দিত। সর্বোচ্চ মাত্রার স্বাধীনতা ভোগ করতে পারত সব ধর্মের অনুসারীরা। ইসলামি রাষ্ট্রে অনুমোদিত হতে পারে না এমন অনেক বিধর্মী প্রথাও তারা নিষিদ্ধ করেনি। যেমন হিন্দু ধর্মের অমানবিক সতীদাহ প্রথা। অনেক হারাম বিষয়কেই অনুমোদন দিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধার করা হতো। যেমন মুশরিক নারীকে বিয়ে করা। এমনকি মুসলিম নারীকেও মুশরিক পুরুষের বিয়ে করার সুযোগ দেওয়া হতো। আবার অনেক বৈধ হালাল বিষয়কে নিষিদ্ধ করা হতো বিধর্মীদের খুশি করতে। যেমন গরু জবাই। কারণ, হিন্দুরা গরুকে দেবতা মনে করে। আর কোনো শাসক তো সব ছাড়িয়ে, হিন্দু মুসলিম ও অন্যান্য ধর্মীয় বিশ্বাস সংমিশ্রণ করে নতুন ধর্ম তৈরিতেও পিছপা হয়নি। শাসকদের ধারণা ছিল, এসব করে

তারা নিজের শাসনকে সুসংহত করতে পারবে। এজন্য সবাইকে খুশি করতে যা দরকার সবই করত। এসব কারণে উপমহাদেশে অনেক নতুন ধর্ম চালু হয়। শিখ ধর্ম তার অন্যতম।

ঔপনিবেশিক শক্তি সবসময় মুসলমানদের দমনে সক্রিয় থেকেছে। মুসলিমবিরোধিতায় হিন্দুদের সাথে তাল মিলিয়েছে। মুসলমানদের দুর্বল করতে সৃষ্টি করেছে কাদিয়ানি, আহমাদিসহ বিভিন্ন বাতিল ফেরকা। এসব ফিরকাকে আজও তারা বিশ্বজুড়ে কাজ করার মদদ জোগায়। মুসলিমদের পথভ্রষ্ট করতে, তাদের ঐক্য বরবাদ করতে এদের ব্যবহার করে।

ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা ১৪%। হিন্দুদের পর তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। শ্রীলঙ্কায় ৮%। নেপালে প্রায় ৪% ও ভুটানে ৫%। তবে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও মালদ্বীপে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমরা। কাশ্মীরে ভারতীয় নোংরা রাজনীতির পরও এখনো সেখানে ৬৫% মুসলিমের বাস। যদিও এই সংখ্যা এর পূর্বে ছিল অনেক বেশি। আর বাংলাদেশ দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও খ্রিষ্টান মিশনের ফাঁদসহ নানা বিপর্যয়ের মধ্যে নিপতিত হয়। বিশেষত পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পর এসব সমস্যা বাংলাদেশকে আরও বেশি করে জেঁকে ধরে।

বাংলাদেশের ইতিহাস[২৮]

৮০০ বছর আগেই ইখতিয়ারুদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি যখন বাংলা জয় করেন তখন বাংলা ছিল প্রাকৃতিক সীমান্ত বেষ্টিত একটি এলাকা। এর উত্তরে ছিল হিমালয় পর্বতমালা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে আসাম, ত্রিপুরা, খাসিয়া জয়ন্তিয়া, পশ্চিমে রাজমহলের পাহাড়, বীরভূমের সাঁওতাল পরগনা, ঝাড়খণ্ড ও ময়ূরগঞ্জের ঘন বনভূমি। উত্তর-দক্ষিণে বাংলা ছিল সুরক্ষিত। বাহির থেকে আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল না। আরাকানের সাথে মাঝেমধ্যে সংঘর্ষ হলেও তেমন একটা বিপদের ঝুঁকি ছিল না। তবে পশ্চিম দিক থেকে বাংলা প্রায়ই আক্রান্ত হতো। আক্রমণকারীরা এগিয়ে আসত গঙ্গা নদী ধরে। শত্রুর আক্রমণ ঠেকাতে বাংলার শাসকরা তাই রাজমহলের গিরিপথে নির্মাণ করেছিলেন দুটি দুর্গ তেলিয়াগড় ও সিকড়িগড়। যদিও মুসলমানরা বাংলা বিজয় করেছিল অনেক পরে, কিন্তু আরবের সাথে বাংলার যোগাযোগ এর আগেই গড়ে উঠেছিল। প্রায় সকল ঐতিহাসিক একমত, আরব ব্যবসায়ীদের কাছে বাংলা অপরিচিত ছিল না। খ্রিষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে রচিত আরব ভূগোলবিদদের (ইবনে খুরদাদবা, সুলাইমান তাজির, আলইদ্রিসি) বইপত্রে চট্টগ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সময় বাণিজ্যিক কারণে আরব ব্যবসায়ীরা বাংলায় সফর করতেন। প্রথম যুগের মুসলিমরা অন্তরে তীব্র দাওয়াতি স্পৃহা লালন করতেন। এই সকল আরব বণিককে নিছক ব্যবসায়ী ভাবলে ভুল হবে। ব্যবসার পাশাপাশি তারা একইসাথে একেকজন মুবাল্লিগ বা ধর্মপ্রচারক হয়ে উঠতেন। ফলে তাদের মাধ্যমে বাংলার অধিবাসীরা ইসলাম ধর্মের সাথে পরিচিত হয়ে ওঠার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। ড. এম এর হিম ওড. এনামুল হক মনে করেন, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে আরব বণিকরা বসবাসও করেছিলেন। এই দুই অঞ্চলের ভাষা ও রীতিনীতি পর্যবেক্ষণ করে তাঁরা এই অনুমান ব্যক্ত করেন।

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলায় সেন রাজারা রাজত্ব করছিলেন। ১১৭৮ সালে সেন রাজা বল্লাল সেনের মৃত্যুর পর তার পুত্র লক্ষ্মণসেন বাংলার

---

২৮. এই অনুচ্ছেদটি সম্পাদক কর্তৃক সংযোজিত। -সম্পাদক

ক্ষমতায় বসেন। তার শাসনকালেই ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে ইখতিয়ারুদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি নদীয়া আক্রমণ করেন। লক্ষ্মণসেন কোনো প্রতিরোধই গড়তে পারেননি। বখতিয়ার খলজির হাত ধরে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা হয়। ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মারা যান। এরপর শাসনক্ষমতা চলে যায় তার একজন সভাসদ মুহাম্মদ শিরান খলজির হাতে। পরবর্তী শাসকদের মধ্যে ইওজ খলজির নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ১২১২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২২৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেছিলেন। তিনি দিল্লি থেকে স্বাধীন হয়ে দেশ শাসন করছিলেন। এজন্য দিল্লির সুলতানদের সাথে তার দ্বন্দ্ব হয়। তিনি জনদরদি শাসক ছিলেন। বাংলার সেনাশক্তি বৃদ্ধিতেও তার বিশাল অবদান রয়েছে। তিনি অনেক মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১২২৭ খ্রিষ্টাব্দে যুবরাজ নাসিরুদ্দিন মাহমুদ লখনৌতি আক্রমণ করলে ইওজ খলজি পরাজিত ও নিহত হন। আবদুল করিমের মতে, তিনি লখনৌতির মুসলিম রাজ্যকে বাংলার মুসলিম রাজ্যে পরিণত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। দিল্লির সুলতান বৈরী ভাব পোষণ না করলে তিনি হয়তো সফল হতেন।[২৯]

ইওজ খলজির মৃত্যুর পর নাসিরুদ্দিন মাহমুদ লখনৌতির ক্ষমতায় বসেন। লখনৌতি দিল্লির অধীনস্থ প্রদেশে পরিণত হয়। ১২৮৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত লখনৌতি দিল্লির অধীনে শাসিত হতে থাকে। ১২৮৭ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবনের মৃত্যুর পর বুগরা খান লখনৌতিতে স্বাধীন বলবন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। আবারও লখনৌতি দিল্লির নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ১২৯১ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতায় বসেন বুগরা খানের ছেলে রুকনুদ্দিন কায়কাউস। তিনি রাজত্বের সীমানা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করেন। জয় করেন হুগলি জেলার ত্রিবেনী। পরবর্তী শাসক শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ এই সীমানা আরও বৃদ্ধি করেন। তিনি সোনারগাঁ জয় করেন। ১৩০৫ খ্রিষ্টাব্দে সোনারগাঁ টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ একটি মুদ্রার সন্ধান পাওয়া গেছে। তিনি ময়মনসিংহ ও সিলেট জয় করেন। সিলেট অভিযানকালে তার সাথে বিখ্যাত সুফি ব্যক্তি হজরত শাহজালাল মিলিত হন। সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের সময় একদিকে রাজত্বের সীমানা বৃদ্ধি পেয়েছিল, অপরদিকে এ সময় বাংলায় ইসলাম প্রচারের গতিও বেড়ে

---

২৯. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস* (১২০০-১৮৫৭ খ্রি.), ২৯ পৃষ্ঠা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

যায়। বিশেষ করে হজরত শাহজালালের কারণে সিলেট অঞ্চলেই ইসলামের ব্যাপক প্রচার-প্রসার হয়।

দিল্লিতে তখন চলছিল ক্ষমতার পালাবদল। খলজিদের পতনের পর ক্ষমতায় আসে তুঘলকরা। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গিয়াসুদ্দিন তুঘলক। ১৩২৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি লখনৌতি আক্রমণ করেন। তিনি বাংলাকে তিনটি প্রদেশে ভাগ করেন: লখনৌতি, সাতগাঁও ও সোনারগাঁ। প্রতিটি প্রদেশে পৃথক গভর্নর নিয়োগ দেওয়া হয়। ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সোনারগাঁর গভর্নর বাহরাম খান মারা গেলে তার বর্মরক্ষক ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ স্বাধীন সোনারগাঁ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজের নামে মুদ্রা চালু করেন। চট্টগ্রাম জয় করেন। চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত একটি সড়কও নির্মাণ করেন।

১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দ। সে বছর লখনৌতির শাসক আলাউদ্দিন আলি শাহকে হত্যা করে ক্ষমতায় বসলেন হাজি ইলিয়াস। সিংহাসনে বসে তিনি নাম ধারণ করেন শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ। তিনি ইলিয়াস শাহ রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশ প্রায় ৭০ বছর বাংলা শাসন করেছিল।

শুরুতে ইলিয়াস শাহ শুধু লখনৌতির শাসক ছিলেন। সোনারগাঁ শাসন করতেন স্বাধীন সুলতান ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ। সাতগাঁও শাসন করতেন দিল্লির অনুগত গভর্নর। ১৩৪৬ খ্রিষ্টাব্দে ইলিয়াস শাহ সাতগাঁও আক্রমণ করে দখলে নেন। সেখানে নিজের নামে মুদ্রা চালু করেন। ১৩৫২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সোনারগাঁ আক্রমণ করেই ইখতিয়ারুদ্দিন গাজি শাহকে পরাজিত করেন। এর ফলে ইলিয়াস শাহ সমগ্র বাংলার শাসক হন। এর আগে আর কেউ পুরো বাংলার সুলতান হতে পারেননি। অন্যরা ছিলেন নির্দিষ্ট কোনো অঞ্চলের শাসক। ইলিয়াস শাহের আমল থেকেই এই অঞ্চল বাংগালা নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করে। দিল্লির ঐতিহাসিকরাও তাকে শাহ-ই-বাংগালা, সুলতান-ই-বাংগালা উপাধিতে ভূষিত করেছেন। ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নেপাল আক্রমণ করে অনেক ধনসম্পদ অর্জন করেন। পাশাপাশি কামরূপ, ওড়িশা ও বাহরাইচ জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। ১৩৫৩ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক বাংলার অভিযানে বের হন। ইলিয়াস শাহের সাথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু যুদ্ধ হয়। কিন্তু চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন ছাড়াই ১৩৫৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দিল্লি ফিরে যান। ১৩৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ইলিয়াস শাহ মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন বাংলার

মুসলিম সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এক সুলতান। তার মৃত্যুর পর তার ছেলে সিকান্দার শাহ ক্ষমতায় বসেন। সিকান্দার শাহ অত্যন্ত যোগ্য শাসক ছিলেন। তার সময়ে ফিরোজ শাহ তুঘলক দ্বিতীয়বার বাংলা আক্রমণ করেন এবং ব্যর্থ হন। ৩১ বছরের রাজত্ব শেষে ১৩৮৯ খ্রিষ্টাব্দে এক লড়াইয়ে তিনি নিহত হন।

১৩৮৯ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার মসনদে আসীন হলেন সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ। তিনি ছিলেন সিকান্দার শাহের ছেলে এবং ইলিয়াস শাহের নাতি। উদার, চরিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ একজন সুশাসক হিসেবে তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। যৌবনে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেও প্রফেসর আবদুল কারিমের মতে, তিনি ছিলেন ষড়যন্ত্রের শিকার। একজন কবি ও বিদ্বান ব্যক্তি হিসেবে তার সুনাম ছিল। পারস্যের কবি হাফিজের সাথে তার পত্রযোগাযোগ ছিল। ছিলেন বিখ্যাত সুফি-বুজুর্গ নুর কুতুবুল আলমের সহপাঠী। মক্কা-মদিনায় লোক পাঠিয়ে মাদরাসা, মসজিদ ও সরাইখানা নির্মাণ করেন তিনি। বাংলার সুলতানদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

১৪১০ খ্রিষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দিন আজম শাহকে হত্যা করা হয়। এই হত্যায় গনেশ নামে তার একজন হিন্দু সভাসদের হাত ছিল। গনেশ ক্ষমতায় এনে বসায় নিহত সুলতানের ছেলে হামজাহ শাহকে। দুবছর পর, ১৪১২ খ্রিষ্টাব্দে গনেশের হাতে তিনিও নিহত হন। এর সাথে বাংলায় ইলিয়াস শাহি শাসনের অবসান ঘটে। এই বংশের অবদান হলো, তারা বাংলাকে এক রাজদণ্ডের অধীনে নিয়ে এসেছিলেন। সীমানাও বিস্তৃত করেছিলেন।

১৪১২ থেকে ১৪১৫ খ্রিষ্টাব্দ

এই তিন বছর একজন ক্রীতদাস বাংলা শাসন করেছিলেন। তার নাম শিহাবুদ্দিন বায়েজিদ শাহ। ১৪২৫ সালে তাকে হত্যা করে গনেশ সরাসরি ক্ষমতায় বসেন। এর ফলে দুইশ বছর ধরে চলা মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে এবং হিন্দু শাসনের সূত্রপাত হয়। *রিয়াজুস সালাতিন* রচয়িতার বক্তব্য অনুসারে, গনেশ ক্ষমতায় বসেই মুসলমানদের উপর অত্যাচার শুরু করেন। অনেককে হত্যা করেন। বাধ্য হয়ে শায়েখ নুর কুতুবুল আলম জৌনপুরের শাসক ইবরাহিম শর্কির কাছে পত্র লিখে গনেশের অত্যাচার সম্পর্কে জানান। সুলতান ইবরাহিম শর্কি বাংলা আক্রমণ করতে এগিয়ে এলে গনেশ সিংহাসন ছেড়ে দেন। তার পুত্র যদুকে ক্ষমতায় বসান। যদু

কুতুবুল আলমের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তার নাম রাখা হয়েছিল জালালুদ্দিন। জালালুদ্দিনকে ক্ষমতায় বসানোর কারণেই ইবরাহিম শর্কি বাংলা আক্রমণ না করে ফিরে যান। তিনি ফিরে যেতেই গনেশ আবার ক্ষমতায় বসে যান। একটি বর্ণনা মতে জালালুদ্দিনকে গনেশ বন্দি করে রাখেন।

বাংলায় হিন্দু রাজত্বকাল আরও বাড়তে পারত, কিন্তু ১৪১৮ খ্রিষ্টাব্দে গনেশের মৃত্যুর পর জালালুদ্দিন আবার ক্ষমতায় বসেন। তিনি রাজধানী গৌড়ে সরিয়ে নেন। মিশরের খলিফার কাছ থেকে সনদ নেন। গনেশ কর্তৃক নির্বাসিত শায়েখ জাহেদকে ফিরিয়ে আনেন। এ ছাড়া জনগণের কল্যাণের জন্য তিনি অনেক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেন। তিনি চীন, মিশরে দূত পাঠান। তৈমুর লংয়ের ছেলে শাহরুখের সাথেও যোগাযোগ করেন। একজন শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন যথার্থ। ১৪৩৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মারা যান। তার মৃত্যুর পর তার ছেলে শামসুদ্দিন আহমাদ শাহ তিন বছর রাজত্ব পরিচালনা করেন। ১৪৩৬ খ্রিষ্টাব্দে নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ ক্ষমতায় আরোহণ করেন। নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ ছিলেন ইলিয়াস শাহি পরিবারের সদস্য। সুতরাং তাদের এই শাসনামলকে দ্বিতীয় ইলিয়াস শাহি শাসনামল বলা যায়। তার শাসনামলে খুলনা ও বাগেরহাট অঞ্চল মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে আসে। এ সময় খান জাহান বাগেরহাট জয় করেন। ১৪৫৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন।

তার মৃত্যুর পর ক্ষমতায় বসেন রুকনুদ্দিন বারবক শাহ। একজন শাসক ও সেনাপতি হিসেবে তার সুনাম ছিল। তিনি ত্রিহুত ও বরিশাল জয় করেন। ১৪৭৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মারা যান। ১৪৮৭ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় ইলিয়াস শাহিদের হটিয়ে হাবশিরা ক্ষমতা দখল করে নেয়। চারজন হাবশি সুলতান ৬ বছর বাংলা শাসন করেন। ১৪৯৩ খ্রিষ্টাব্দে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ তাদের হটিয়ে হোসেন শাহি বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ প্রজাদরদি শাসক ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের বিকাশে তার উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। ১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মারা যান। তার মৃত্যুর পর তার ছেলে নসরত শাহ ১৫৩২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেন। ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে শের শাহের আক্রমণে গৌড়ের পতন হয়। হোসেন শাহি বংশকে সরিয়ে এবার ক্ষমতায় আসে আফগানরা। বাংলায় সূচনা হয় আফগান শাসনের। শের শাহের বাংলা বিজয়ের সংবাদ

শুনে মোঘল সম্রাট হুমায়ুন বাংলা আক্রমণ করেন। ১৫৩৯ খ্রিষ্টাব্দে শের শাহ চৌসার যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজিত করেন। ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে কান্নুজের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হুমায়ুন ভারত থেকে পালাতে বাধ্য হন। শের শাহ দিল্লির মসনদে বসেন। বাংলাকে পরিণত করেন দিল্লি সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে। খিজির খানকে বাংলার গভর্নর নিয়োগ দেওয়া হয়।

শের শাহের ছেলে ইসলাম শাহের শাসনামলেও বাংলা ছিল দিল্লির নিয়ন্ত্রণাধীন। ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর শামসুদ্দিন মুহাম্মদ শাহ বাংলার মসনদে বসেন। তিনি নিজেকে স্বাধীন সুলতান ঘোষণা করেন। এরপর তার বংশের কয়েকজন শাসক শাসন করে। ১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দে তাজখান কররানি গৌড় জয় করেন। তিনি কয়েক মাস শাসন করেন। এরপর ক্ষমতায় আসেন তার ভাই সুলাইমান কররানি। দিল্লিতে ততদিনে মোঘলরা নিজেদের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেছে। সম্রাট হুমায়ুন ফিরে এসে মারা গেছেন। ক্ষমতায় বসেছেন তরুণ সম্রাট আকবর। সুলাইমান কররানি আকবরকে খেপিয়ে তোলার পরিবর্তে তার সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। তাই প্রথমদিকে আকবরও এদিকে আগ্রহ দেখাননি। ১৫৭২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মারা গেলে তার ছেলে দাউদ খান কররানি ক্ষমতায় বসেন। তার সময়ে আকবরের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে বাংলার দিকে।

এদিকে দাউদ খান কররানিও নিজের নামে মুদ্রা ও খুতবা চালু করেন। ফলে আকবর তেতে ওঠেন। দাউদ খানকে পরাস্ত করতে মোঘল বাহিনী এগিয়ে আসে। ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ১২ জুলাই রাজমহলের যুদ্ধে আফগানরা মোঘলদের মুখোমুখি হয়। এ যুদ্ধে মোঘলরা জয়ী হয়। দাউদ খান কররানিকে হত্যা করা হয়। সমাপ্ত হয় সাড়ে তিনশ বছর ধরে চলা সুলতানি আমলের। সূচনা হয় মোঘল শাসনামলের।[৩০]

মোঘল শাসনামলের শুরুর দিকে বাংলার বারো ভুঁইয়া নামে পরিচিত জমিদাররা তাদের রুখে দিয়েছিলেন। আকবরের সময় পুরো বাংলা মোঘলদের নিয়ন্ত্রণে আসেনি। জাহাঙ্গীরের আমলে বারো ভুঁইয়াকে দমন করা হয়। মোঘল আমলের বাংলার সুবাদারদের মধ্যে ইসলাম খান বেশ বিখ্যাত। শাহজাহানের সময় সুবাদার ছিলেন কাসেম খান জুয়ানি। আলমগীরের আমলে দায়িত্বে ছিলেন শায়েস্তা খান। ন্যায়পরায়ণ শাসক

৩০. প্রাগুক্ত, ৫০-১২২ পৃষ্ঠা

হিসেবে তার সুনাম ছিল। তার শাসনামলে টাকায় আট মন চাল পাওয়া যেত। তিনি চট্টগ্রাম জয় করেন এবং মগ দস্যুদের দমন করেন। মোঘল আমলের শেষদিকে বাংলা, বিহার ও ওড়িশায় মোঘল আশীর্বাদপুষ্ট নবাবি শাসন গড়ে ওঠে। বাংলার শেষ নবাব সিরাজুদ্দৌলার পতন ঘটে ১৭৫৭ সালে, পলাশির যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে পরাজয়ের মাধ্যমে। এরপর বাংলা চলে যায় ইংরেজদের দখলে। তবে বাংলার জনগণ ইংরেজ শাসন মেনে নেয়নি। তারা ইংরেজদের জুলুম ও শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। যার পরিণতিতে ১৭৬৪ সালে মজনু শাহ ফকির বিদ্রোহের সূচনা করেন।

তিতুমিরের বিদ্রোহও ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। ১৮৩১ সালে সাইয়েদ আহমাদ শহিদ বালাকোটের ময়দানে ইংরেজদের মোকাবিলা করতে গেলে তার সাথে অনেক বাঙালি যোগ দেন। গাজি ইমাদুদ্দিন বাঙালি তাদের অন্যতম। ১৮৪০ সালে ফরিদপুরে হাজি শরিয়তুল্লাহ সূচনা করেন ফরায়েজি আন্দোলন। এটি একটি সংস্কারমূলক আন্দোলন ছিল। ১৮৫৭ সালে ভারতে মহাবিদ্রোহের সূচনা হলে বাংলা অঞ্চলের বাসিন্দারাও এই বিদ্রোহে যোগ দেন। ইংরেজরা কঠোর হাতে এই বিদ্রোহ দমন করেছিল। বিদ্রোহের পর ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কে অনেক বিদ্রোহীকে শাস্তি দেওয়া হয়। ১৯৪৭ সালে ইংরেজদের বিদায় নেওয়ার আগ পর্যন্ত বাংলার অধিবাসীরা নানা আন্দোলন-সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সবাই ইনসাফভিত্তিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু তা হয়নি। পাকিস্তানিরা নানাভাবে এই অঞ্চলের মানুষদের শোষণ করে। চূড়ান্ত পরিণতিতে ১৯৭১ সালে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। যার ফলাফল আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ।

* * *

সপ্তম অধ্যায়

উসমানি সাম্রাজ্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

উসমানি সাম্রাজ্য : উত্থান ও পতন

সুদীর্ঘ ৬০০ বছরের বেশি সময় ধরে বিশ্বের বুকে ইসলামের পতাকা উন্নীত করে রেখেছিল উসমানি সাম্রাজ্য। এই দীর্ঘ সময়ের ইতিহাসে তারা অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে মোকাবিলা করেছে ইসলামের প্রতিপক্ষদের। উসমানিদের গৌরবের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তাদের হাতেই কনস্টান্টিনোপল বিজিত হয়েছিল। অথচ দীর্ঘ ৭০০ বছর বহু মর্দে মুজাহিদ অসংখ্যবার চেষ্টা করেও এই নগরটির চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে পারেননি। এ ছাড়া পৃথিবীর এমন সব ভূখণ্ডে তারা ইসলামকে বিজয়ী করেছিল, যা দ্বিতীয় কোনো মুসলিম শাসকের শাসন করার সৌভাগ্য হয়নি। হ্যাঁ, একমাত্র উসমানিরাই পেরেছিল ইউরোপের হৃৎপিণ্ডে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করতে। তারা জয় করেছিল গ্রিস, যুগোস্লাভিয়া (বর্তমান সার্বিয়া, মন্টেনিগ্রো ও ক্রোয়েশিয়া) বসনিয়া, হার্জেগোভিনা, আলবেনিয়া, মেসিডোনিয়া, বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, হাঙ্গেরি, মালদোভা, ইউক্রেন, সাইপ্রাস, রাশিয়ার বিরাট এক অংশ, অস্ট্রিয়া, পোল্যান্ড, স্লোভাকিয়া, ইতালি। তথা তৎকালীন অর্ধ ইউরোপ ছিল উসমানিদের পদানত। এদিকে সম্পূর্ণ এশিয়া মাইনর তথা আধুনিক তুরস্ক, আর্মেনিয়া, জর্জিয়াসহ সমগ্র ককেশাস অঞ্চল। অবশেষে উসমানিদের বিজয়যাত্রা ভিয়েনার দুর্গ-প্রাচীর পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়ায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

উসমানি সাম্রাজ্য : উত্থান ও পতন

এই অধ্যায়ে আমরা উসমানি সাম্রাজ্য নিয়ে আলোচনা করব। উসমানিদের উত্থান হয়েছিল ৬৯৯ হিজরিতে। তবে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রায় সোয়া দুইশ বছর পর ৯২৩ হিজরিতে উসমানিরা খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ১৩৩৭ হিজরিতে খিলাফতের পতন পর্যন্ত উসমানিরা সর্বতোভাবে ইসলামের অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করে গিয়েছিল।

সমগ্র মুসলিমবিশ্ব উসমানিদের করতলে না এলেও অধিকাংশ অঞ্চলই ছিল তাদের শাসনাধীন। কিন্তু যেসব নগরী তাদের আয়ত্তাধীন ছিল না তার অধিবাসীদের চোখেও উসমানিদের এলাকাগুলো ছিল শ্রদ্ধার জায়গা। কারণ, প্রথমত উসমানি সাম্রাজ্য হচ্ছে খিলাফতভূমি, এর সুলতান হলেন মুসলিম বিশ্বের খলিফা। দ্বিতীয়ত উসমানি সাম্রাজ্য ছিল তৎকালীন বিশ্বের সর্বোচ্চ না হলেও অন্যতম বৃহৎ এবং শক্তিধর সাম্রাজ্য।

ইসলামি ইতিহাসের অতি গুরুত্বপূর্ণ এই অধ্যায়টি নানাভাবে কলুষিত হয়েছে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের মিথ্যাচারের দরুন। ক্রুসেডে শোচনীয় পরাজয়ের প্রতিশোধ হিসেবে খ্রিষ্টীয় লেখকরা আমাদের উপহার দিয়েছে বিজয়ী বীরদের নামে অজস্র অপবাদ। কিন্তু হতাশার কথা হলো এসব লেখকদের অনুসরণ করেছে আমাদেরই কিছু মুসলিম ইতিহাস রচয়িতা। ইউরোপীয় সভ্যতা দ্বারা চরম প্রভাবিত এসব লেখক বহু মিথ্যাচার অন্ধের মতো অনুসরণ করেছে। নানাপ্রকার জ্ঞানবিজ্ঞানে ইউরোপীয় বিদ্বানদের আবিষ্কারের ঝলক দেখে তারা সত্য মিথ্যা পৃথক করার হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। সত্য এ বাণী যে, 'আল্লাহর শপথ, যদি তারা গুঁইসাপের গর্তে প্রবেশ করে তাহলে তোমরাও পিছুপিছু তাই করবে।' সুতরাং উসমানিদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার পাশাপাশি আমাদের বিশেষ প্রচেষ্টা থাকবে তাদের ওপর আরোপিত নানা মিথ্যাচার খণ্ডন করা।

এ ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন মস্তিষ্কে ঘুরপাক খায়, অন্যান্য খিলাফতের তুলনায় বিশেষভাবে উসমানিদের নিয়ে এত বাজে বক্তব্য শোনা যায় কেন?

মূলত নিজেদের পুরো ইতিহাসজুড়ে উসমানিরা ইউরোপের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে ছিল। বরং বলা যায়, সাম্রাজ্যের চতুর্দিকে একসাথে দ্বীনের জন্য লড়াই চালিয়ে গিয়েছিল উসমানিরা। পশ্চিম সীমান্তে অস্ট্রিয়া ও স্পেনের রাজকীয় বাহিনীর সাথে তুমুল লড়াই চলছিল। দক্ষিণে জাজিরাতুল আরবে পর্তুগিজ বাহিনীকে বারবার রুখে দিয়েছিল। উত্তর সীমান্তে রুশ বাহিনীর হাত থেকে তাতার ও শারকাসি মুসলিমদের রক্ষার লড়াই চলছিল। আর পূর্বে লড়াই চলছিল শিয়া গাদ্দারদের সাথে, যারা ক্রুসেডারদের সঙ্গে যোগসাজশে ব্যাপকভাবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সাথে আর বিশেষভাবে খিলাফতে উসমানিয়ার সাথে লড়ছিল।

অতএব, ক্রুসেডারদের কাছে এর ব্যতিক্রম আর কীই-বা আশা করা যায়। এটাই তো স্বাভাবিক যে, তারা উসমানি খিলাফতের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করবে। নেতিবাচক প্রোপাগান্ডা চালাবে। মন্দ সামান্য কিছু পেলেও তা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলে ধরবে। অপরদিকে খিলাফতের কোনো ভালো দিক তাদের চোখে পড়বে না। তারা উসমানি খিলাফতকে চিত্রিত করতে চায় এক দখলদার শক্তি হিসেবে, যারা কিনা জোরপূর্বক মুসলিম দেশগুলো শাসন করেছিল। এভাবে তৈরি করতে পারবে নতুন বিশৃঙ্খলা, নতুন ফিতনা। উম্মাহ হবে আরও দ্বিধাবিভক্ত। এভাবেই তারা আরবদের প্রলুব্ধ করে উসমানিদের বিরুদ্ধে 'আরব বিদ্রোহ' ঘটাতে সক্ষম হয়।

তাদের বোঝানো হলো যে, খিলাফতের কেন্দ্র হতে হবে আরবদের মাঝে। কিন্তু তারা প্রিয়নবির এই বাণী ভুলে গেল—'অনারবের ওপর আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হলো তাকওয়া।'

ইউরোপীয়রা উসমানিদের পরাভূত করার জন্য সর্বাত্মক ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে। সেজন্য খ্রিষ্টান বা মুসলিম যার মাধ্যমে ষড়যন্ত্র সফল হতে পারে সবাইকে তারা ব্যবহার করেছিল। আর বিদ্রোহীদের দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতাকামী, নিষ্ঠাবান ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করত; যদিও তারা কুখ্যাত ডাকাতই হোক না কেন।

ইউরোপীয়রা জাতীয়তাবাদের মোহনীয় স্লোগান নিয়ে এসেছিল, যাতে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ধ্বংস হয়ে যায় এবং তাদের জন্য একের পর এক ইসলামি অঞ্চলগুলো গিলে খাওয়ার পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। নিজেদের মধ্যে কাটাকাটিতে লিপ্ত থেকে মুসলিমরা সবকিছু থেকে অনেক পিছিয়ে পড়েছিল। অপরদিকে শিক্ষা-সংস্কৃতি আবিষ্কার সবকিছুতে ইউরোপের উন্নতি অগ্রগতি ছিল বিশাল। এর ফল হলো, উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী তরুণরা শিক্ষার জন্য ইউরোপের দ্বারস্থ হতে লাগল। অথচ দ্বীনি বিষয়ে তাদের ভালো জ্ঞান ছিল না। দেখা গেল ইউরোপ থেকে যা শিখে আসে, তা দিয়েই তারা ইতিহাস রচনা করছে। ইসলামবিদ্বেষীদের চর্চিত ইতিহাস তারা মগজে করে নিয়ে আসে। ইউরোপের একেবারে আক্ষরিক অনুগত্যের শিকার এসব তরুণ সিলেবাস প্রণয়ন ও ইতিহাস রচনায় কদমে কদমে ইউরোপীয় চর্চার প্রকাশ ঘটায়। ফলে বহু মুসলিমের মনে একসময় এ মারাত্মক চিন্তা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, মুসলিমদের পতন ও পিছিয়ে পড়ার একমাত্র কারণ উসমানি খিলাফত। আর এ থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন ইউরোপের অন্ধ অনুকরণ করা। উন্নতির যে শিখরে আজ ইউরোপ অবস্থান করছে, মুসলিমদের সেখানে পৌছতে হলে তার অনুসরণের বিকল্প নেই। বস্তুত মুসলিম উম্মাহ তখন ভুলে গিয়েছিল যে, নিজেদের দ্বীন পূর্ণভাবে আঁকড়ে ধরা ব্যতীত তাদের মুক্তি সম্ভব নয়। এখন যা কিছু লাঞ্ছনা-বঞ্চনা তাদের কপালে জুটেছে, এর মূল কারণও হলো দ্বীন ভুলে যাওয়া। সেই সাথে ইহজগতের ভালোবাসা ও প্রবৃত্তির চাহিদার সাগরে ডুব দেওয়া।

আমরা এ কথা বলি না যে, উসমানিরা পরিপূর্ণ ইসলাম পালন করত বা খিলাফতে রাশিদার অনুরূপ ছিল তাদের খিলাফত। বরং তাদেরও ছিল ভালো-মন্দ উভয় দিক। উমাইয়াদের থেকে নিয়ে আব্বাসিদের শেষ তথা উসমানিদের সূচনা পর্যন্ত খিলাফতের যে হালত ছিল উসমানিদের সময়ও তার ব্যতিক্রম ছিল না। হ্যাঁ, আমাদের কর্তব্য হলো সকল যুগেরই লোকদের ভালো-মন্দ উভয় দিকটি বিবেচনা করা। এ থেকে হয়তো আমরা শিক্ষা নিয়ে ভালোটা গ্রহণ করতে পারব, আর মন্দ থেকে বেঁচে থাকতে পারব। তো পাঠক, এখন আমরা মুসলিম উম্মাহর এক সোনালি সময়ের আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি। এ অধ্যায়ে আপনাকে স্বাগতম!।

তুর্কি জাতির ইতিকথা

তুর্কিদের আলোচনা উঠলে সাধারণত কল্পনায় ভেসে ওঠে আধুনিক তুরস্ক রাষ্ট্রের কথা, যা পূর্বে এশিয়া মাইনর নামে পরিচিত ছিল। যাই হোক, এটি কিন্তু ভুল ধারণা। এশিয়া মাইনর বা বর্তমান তুরস্ক তুর্কিজাতির আদি বাসস্থান নয়। তুর্কিদের আদি বাসস্থান মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত, যা ঐতিহাসিকভাবে তুর্কিস্তান নামে পরিচিত।

প্রাচীন তুর্কিস্তান এখন ছড়িয়ে আছে মধ্য এশিয়ার তুর্কি রাজ্যগুলোর মধ্যে। অর্থাৎ কাজাখস্তান, তুর্কমেনিস্তান, তাজিকিস্তান, কিরগিজস্তান, উজবেকিস্তান। নব্বই দশকের শেষদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে মুক্ত হওয়ার পর থেকে এই পাঁচটি এখন স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশ। তুর্কিস্তানের আরেকটি বৃহৎ অংশ রয়ে গেছে চীনের পরাধীন প্রদেশ হিসেবে। ঐতিহাসিকভাবে পূর্ব তুর্কিস্তান নামে পরিচিত উইঘুর মুসলিম জনগোষ্ঠীর আবাসস্থল এই দেশ এখন চীনা ভাষায় শিনচিয়াং প্রদেশ নামে পরিচিত। শিনচিয়াং অর্থ হলো নতুন রাজ্য। নামেই বোঝা যাচ্ছে, চীনারা এখানে দখলিস্বত্ব বা উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে। প্রাচীন তুর্কিস্তানের আরও একটি প্রদেশ বর্তমানে ইরান ও আফগানিস্তানের অংশ, যার ঐতিহাসিক নাম খোরাসান। খোরাসানের বৃহৎ দুটি অংশ রয়ে গেছে আফগানিস্তান ও ইরানে, আর কিছু অংশ তুর্কমেনিস্তানে।

এখানে এই প্রশ্ন আসে যে, তুর্কিদের একটা ধারা মধ্য এশিয়া থেকে পশ্চিম এশিয়ায় (এশিয়া মাইনর তথা আনাতোলিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে) এলো কীভাবে?

তুর্কি জাতি মূলত মোঙ্গলীয় নৃগোষ্ঠীভুক্ত হলুদ চামড়ার মানুষ। (বলা হয় নুহ আ.-এর ছেলে ইয়াফিসের বংশধর এরা।) এশিয়ার সিংহভাগ অঞ্চলেই এদের বাস। যেমন : চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া, তাতারিস্তান, তুর্কিস্তান, মালয়েশিয়া ইত্যাদি।

শৌর্যবীর্য ও যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হিসেবে জগৎজোড়া তাদের খ্যাতি ছিল। তাদের জন্মস্থান ও বিচরণভূমির প্রভাব এতে কম নয়। উঁচু মালভূমি, পার্বত্য এলাকা ও শুষ্ক মরুভূমিতে তাদের বসবাস। এই অঞ্চলে ইসলামের আবির্ভাব পর্যন্ত তুর্কিরা ছিল মূর্তি ও তারকা পূজারি।

উমাইয়া শাসনামলে মধ্য এশিয়ার দেশগুলো বিজিত হয়। ইসলামের আগমনের সাথে সাথেই তুর্কিরা দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হতে থাকে। নিষ্ঠাবান মুজাহিদগণের আত্মত্যাগের ফলে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় খুব অল্প সময়ে মধ্য এশিয়ার তুর্কিজাতির একমাত্র ধর্ম হয়ে উঠল ইসলাম। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে যে মুসলিম সেনানায়কের নাম নিতে হয়, তিনি হলেন কুতাইবা বিন মুসলিম আল-বাহিলি।[৩১] এরপর আসে মুহাল্লাব পরিবারের নাম[৩২] যাদের নিয়োগ হয়েছিল হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলা এই তুর্কি জাতিকে কবুল করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাদের দ্বারা ইসলামের অভাবনীয় খেদমত হয়।

এখন আমরা সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি যে, তুর্কিদের একটি ধারা কীভাবে মধ্য এশিয়া থেকে আনাতোলিয়ায় চলে গেল। এর উত্তর হলো, আব্বাসীয় শাসনামলে তুর্কিদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। সে সময় আনাতোলিয়া ছিল খিলাফত ও রোমান বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী এলাকা। এ অঞ্চল ছিল উভয় পক্ষের সীমানা। ফলে জায়গাটা ছিল যুদ্ধ কবলিত। এজন্য আব্বাসীয় খলিফারা খোরাসান থেকে আসা সৈনিকদেরকে আনাতোলিয়ায় স্থায়ী ঘাঁটি করে দিয়েছিলেন। খলিফা মাহদি ফারগানা (বর্তমান কিরগিজস্তানের একটি শহর) ও বলখ (বর্তমান আফগানিস্তানের একটি প্রদেশ) থেকে তুর্কিদের এনে তাদের থিতু করেছিলেন আনাতোলিয়ার সীমান্ত এলাকাগুলোতে। যেমন : তারতুস, আজিন্না, মারআশ, খারশানা ইত্যাদি। এসব অঞ্চল মুসলিম ও রোমানদের মধ্যবর্তী পাহাড়ি সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত। খলিফা মামুন ও মুতাসিমের সময় আনাতোলিয়ায় তুর্কিদের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে।

খলিফা মুতাওয়াক্কিলের সময় তুর্কিরা হয়ে ওঠে খলিফার সেনাবাহিনীর মূল চালিকাশক্তি। আনাতোলীয় সীমান্ত অঞ্চলে কার্যত তুর্কিদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তুর্কি শাসকরা খলিফার প্রতি অনুগত ছিল। তবে কখনো

---

৩১. কুতাইবা বিন মুসলিম ৪৯-৯৬ হিজরি/৬৬৯-৭১৫ খ্রিষ্টাব্দ। প্রথম হিজরি শতাব্দীতে এশিয়া মাইনর অঞ্চলে তার হাত ধরেই ইসলামি বিজয় যাত্রা শুরু হয়। -সম্পাদক

৩২. আল-মুহাল্লাব। পুরো নাম: আল-মুহাল্লাব বিন আবু সুফরা। ৭৮ হিজরি মোতাবেক ৬৯৭ খ্রিষ্টাব্দে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাকে খোরাসানের গভর্নর পদে নিয়োগ করেছিলেন। বৃহত্তর মাওয়ারাউন নাহার তথা ট্রান্সঅক্সিয়ানা অঞ্চলে তার নেতৃত্বে ইসলামি বিজয় যাত্রা লাভ করেছিল ব্যাপক বিস্তৃতি। -সম্পাদক

আবার আনুগত্য প্রকাশ করত হালাবের (আলেপ্পো) শাসক হামাদানিদের। কখনো মিশরের তুলুনিদের। তবে নানা বিভক্তি সত্ত্বেও আনাতোলীয় সীমান্তে রোমানদের সাথে মুসলিমদের লড়াই সবসময় অব্যাহত ছিল। এসব যুদ্ধে কখনো মুসলিমদের জয় হতো, আবার কখনো পরাজয়ও হতো।

আব্বাসীয় শাসনের দুর্বল সময়ে সেলজুক তুর্কিদের উত্থান ঘটে। সেলজুকরা রোমান বাইজান্টাইন সম্রাটদের স্বস্তি কেড়ে নিয়েছিল। সেলজুকরা অনবরত যুদ্ধ চালিয়ে যায় রোমানদের বিরুদ্ধে। তাদের সবচেয়ে সফল শাসক হলেন আলপ আরসালান[৩৩]। ৪৬৩ হিজরির এক মহাসমরে রোমানদের বিরুদ্ধে তিনি মহাবিজয় অর্জন করেছিলেন।

এই যুদ্ধের পর আনাতোলিয়ায় সেলজুক তুর্কিদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সেলজুক আমিরদের অনেকগুলো ইমারা বা প্রশাসনিক প্রদেশ গড়ে ওঠে। আনাতোলিয়াজুড়ে ক্রমপ্রসারমান সেলজুকরা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য স্মরণীয় কিছু অবদান রেখে গিয়েছিল। যার অন্যতম হলো রোমানদের কাছে হাতছাড়া হওয়া অনেক অঞ্চলে পুনরায় মুসলিমদের বিজয় লাভ। আনাতোলিয়ার বিস্তৃত ভূমির অধিকাংশই ইসলামি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। সেলজুক সালতানাতের সর্বাধিক বিস্তৃতি হয় আরসালানপুত্র মালিক শাহের হাতে। এই অঞ্চলে আর অল্প কয়েকটি খ্রিষ্টান রাজ্য ছিল। উসমানিদের হাতে এগুলো চূড়ান্তরূপে পদানত হয়।

দুঃখের বিষয় হলো, কতিপয় দুর্বলচিত্তের সেলজুক শাসক সর্বগ্রাসী মোঙ্গল আক্রমণের মুখে চরমভাবে ভেঙে পড়ে। রণাঙ্গনে পরাজয় নয়, ভীত হয়ে এরা মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে তৎপরতায় মোঙ্গলদের সহযোগীতে পরিণত হয়।

সেলজুকদের রাজ্য তাতারদের হাতে দখল হয়। সেলজুক আমিররা আত্মসমর্পণ করে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে সম্মত হয়। এরপর ৬৫৮ হিজরিতে তাতাররা যখন আইনে জালুত রণাঙ্গনে পরাজিত হলো তখন এরা শাম ত্যাগ করতে বাধ্য হলো। রুকনুদ্দিন বাইবার্স

---

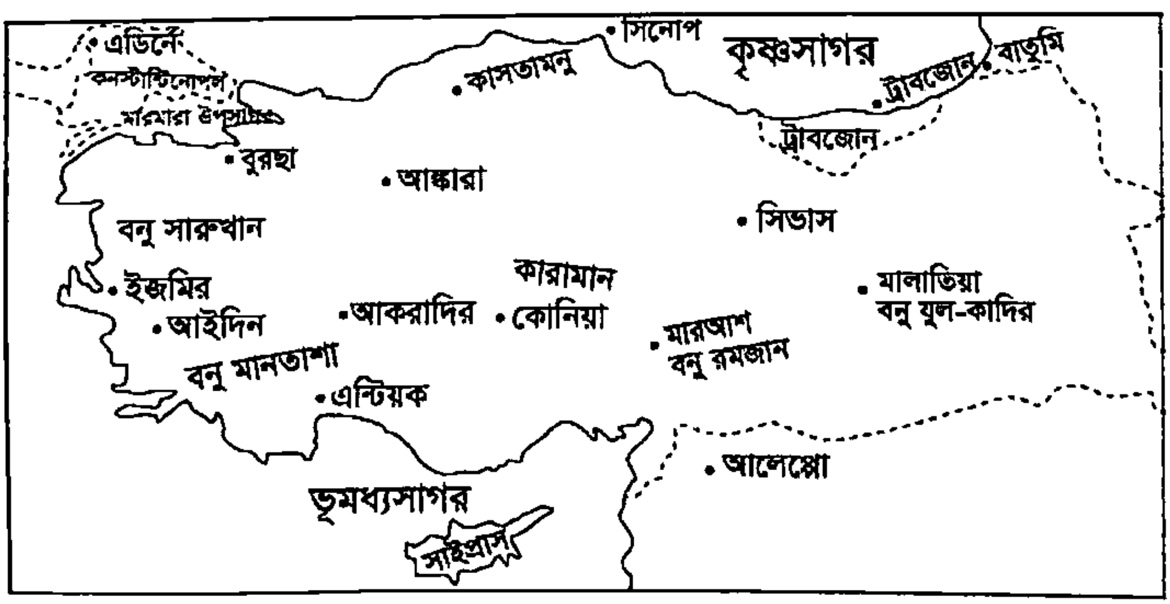
৩৩. আলপ আরসালান। ইসলামি ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। সেলজুক সাম্রাজ্যের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ সুলতান। ১০২৯ খ্রিষ্টাব্দে সেলজুক পরিবারে তার জন্ম। ১০৭২ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল। -সম্পাদক

সেলজুকদের ওপর প্রতিশোধ নিলেন। ৬৭৫ হিজরিতে সেলজুক ও তাদের তাতার মিত্রদের সাথে বুসতানের যুদ্ধে মুখোমুখি হয়ে তাদের পরাজিত করেন। সেলজুক রাজধানী কায়সারিয়াও দখল করে নেন। তাতারদের শক্তিক্ষয়ের সাথে সাথে রোমান সেলজুকদের রাজ্যও বিলুপ্ত হয়ে যায়। আনাতোলীয় পার্বত্য অঞ্চলে বেশ কয়েকটি স্বাধীন ইমারা প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন : আইদিনের রাজবংশ, তারিকাহ বংশ, আরতিনা বংশ, কিরমিয়ান বংশ, হামিদ বংশ, আশরাফ কারা ইসার বংশ, সারুখান বংশ, মিনতাশা বংশ, জানবাদার (ইসফান্দিয়ার) বংশ, বারওয়ানাহ বংশ, সাহিব আতার বংশ, কাজমান বংশ, রমজান বংশ, জুলকাদির বংশ ইত্যাদি।

আনাতোলিয়ার মুসলিমদের জন্য অপেক্ষা করছিল স্পেন বা তাতারি হামলার শিকার মুসলিম দেশগুলোর ভাগ্য। অনৈক্য, বিভক্তি, নিজেদের মধ্যে মারামারি আর ক্ষমতার লিপ্সায় অমুসলিম শাসকদের সাথে হাত মেলানো একটা জাতির পরিণতি তো এটাই হবে। কারণ, আল্লাহ তাআলা তো বিশেষভাবে বলে দিয়েছেন—

> ‘তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা বিভেদ করে এবং সুস্পষ্ট প্রমাণ সামনে থাকার পরও মতভেদ করে। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।’ [সুরা আলে ইমরান : ১০৫]

কিন্তু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় আনাতোলিয়াতে উসমানি শাসন প্রতিষ্ঠা হলো। তারা ছোট-বড় সকল রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ করে বিভেদ দমন করতে সক্ষম হয়েছিল।



মানচিত্র নং-১৭

উসমানি সালতানাত প্রতিষ্ঠার পূর্বে আনাতোলিয়ার সেলজুক রাষ্ট্রসমূহ

পূর্ব দিক থেকে তাতারদের মুহুর্মুহু আক্রমণ হচ্ছিল। সে সময় বহু পরিবার দলবেঁধে জন্মভূমি ত্যাগ করে আরও পশ্চিমে হিজরত করে যাচ্ছিল। কারণ, তাতাররা ছিল হিংস্র হায়নার মতো। তারা যেখানে প্রবেশ করে, সেখানে বর্বরতার পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। এই মুহাজির কাফেলার মধ্যে ছিল তুর্কমেন তুর্কি কাই উপজাতির একটি গোত্রের প্রায় দুইশ পরিবার। তাদের নেতার নাম সুলাইমান শাহ। তাদের জন্মভূমি তুর্কমেনিস্তানের ঐতিহাসিক মার্ভ নগরের সন্নিকটে। কাফেলা পশ্চিম দিকে চলতে চলতে তুরস্কের পূর্বাঞ্চলের ভ্যান ল্যাকের[৩৪] নিকটে পৌঁছে যায়। একসময় তাতারদের ত্রাস কিছুটা কমে এলে সুলাইমান জন্মভূমিতে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে করে। কিন্তু নিয়তি ছিল অন্যকিছু। তাই যাত্রাপথে ফোরাত নদী পার হতে গিয়ে ডুবে মারা যায় সুলাইমান। তার চার পুত্র গন্তব্য নিয়ে মতভেদে জড়িয়ে পড়ে। দুই পুত্র সারু ইয়াতি ও তুগুর পিতার ইচ্ছা অনুযায়ী জন্মভূমিতে ফিরে যেতে চাইল। আর আর্তুগ্রুল ও দানদান উত্তরে যেতে চাইল। আনাতোলিয়ায় ঘুরে বেড়ানো কাফেলার নেতৃত্ব রইল আর্তুগ্রুলের হাতে। সে সেলজুক আমির আলাউদ্দিনের কাছে সাহায্য চেয়ে পুত্র সাওজিকে পাঠাল। তিনি তখন কিরমানের শাসক। তার রাজধানী কোনিয়াতে।[৩৫] উদ্দেশ্য হলো তার কাছে রাজ্যের কোথাও কাফেলার বসবাসের জন্য কিছু জমি চেয়ে নেওয়া। কিন্তু পুত্র সাওজি পথেই মারা গেল। এমন সময়ই আর্তুগ্রুল দেখতে পেল দুটো বাহিনী লড়াইয়ে লিপ্ত, যার একটি মুসলিম। মুসলিম বাহিনীটি পরাজয়ের মুখে ছিল। আর্তুগ্রুল তৎক্ষণাৎ তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে গেল। তার জীবনপণ সংগ্রামে পরাজয়োন্মুখ মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করল। কাকতালীয়ভাবে এই যোদ্ধারা ছিল আলাউদ্দিন সেলজুকির বাহিনী। তিনি আর্তুগ্রুলের সাহসিকতা ও নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে বাইজান্টাইন সীমান্তে তাকে পরগনা দান করেন। এর অন্যতম উদ্দেশ্য আর্তুগ্রুল যেন নিয়মিত ক্রুসেডারদের

---

[৩৪]. **ভ্যানল্যাক :** তুরস্কের সবচেয়ে বড় লেক। আনাতোলিয়ার পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। -সম্পাদক

[৩৫]. **কোনিয়া :** তুরস্কের আনাতোলিয়া সীমান্তের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় বৃহত্তম শহর। -সম্পাদক

হামলার জবাব দেয় এবং নিজেও অভিযান চালাতে থাকে। এসব অভিযানে বিজিত অঞ্চলগুলো আর্তুগ্রুলের জায়গিরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত।

আর্তুগ্রুলের পুত্র উসমান। সেখানকার এক নেককার বান্দার সাথে উসমানের বেশ ভালো সম্পর্ক ছিল। প্রায়ই সে তার কাছে যেত, তার সাথে নানা বিষয়ে আলাপ করত। এর মধ্যে একবার উসমান দরবেশ লোকটির কন্যাকে দেখে পছন্দ করে সে তাকে বিয়ে করতে চাইল। কিন্তু মেয়ের বাবা সে প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন। এতে উসমান অত্যন্ত ব্যথিত হলো। একদিন সে এক আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখল। ঘুম ভাঙতেই সে ছুটে গেল দরবেশ লোকটির কাছে। তাকে স্বপ্নের কথা খুলে বলল। স্বপ্ন শুনে নেককার লোকটি উসমানের সাথে তার কন্যাকে বিয়ে দিতে রাজি হয়ে গেলেন। সে মূলত স্বপ্ন দেখেছিল, আকাশের চাঁদ নেককার লোকটির বুক থেকে বের হয়ে আকাশে পূর্ণিমার মতো উজ্জ্বলরূপে স্থাপিত হলো। তারপর আকাশ থেকে নেমে উসমানের বুকে স্থাপিত হলো। তখন উসমানের ঔরস থেকে একটি গাছ বের হলো। সে গাছ দ্রুত বড় হয়ে চারপাশ ছেয়ে ফেলল। এমনকি তার ছায়া ককেশাস, বলকান, তুরুস, এটলাস প্রভৃতি অঞ্চল অতিক্রম করে ফেলল। সে গাছের শেকড় থেকে প্রবাহিত হলো দজলা, ফোরাত, নীল ও বলকানের তুনা নদী। গাছের পাতাগুলো ছিল তরবারির মতো। বাতাসে সেসব পাতা উড়ে উড়ে কনস্টান্টিনোপলের দিকে যাচ্ছিল। এই বিস্ময়কর স্বপ্নে ভালো ইঙ্গিত ছিল দেখে দরবেশ তার মেয়েকে উসমানের কাছে বিয়ে দিতে রাজি হলেন। তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলেন যে, উসমানের বংশধরগণ একদিন বিশ্ব শাসন করবে।

সুলতান গাজি উসমান প্রথম
(৬৯৮-৭২৬ হি./১২৯৯-১৩২৬ খ্রি.)

উসমানি সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করে আর্তুগ্রুল ৬৮৭ হিজরিতে ইনতেকাল করেন। তার পুত্র উসমান দায়িত্ব গ্রহণ করেই আলাউদ্দিনের সমর্থন নিয়ে পরগানার সীমানা বৃদ্ধি করতে থাকেন। ৬৯৯ হিজরিতে মোঙ্গলরা আলাউদ্দিনের রাজ্য কিরমানে ভয়াবহ হামলা করে। আলাউদ্দিন পালিয়ে বাইজান্টাইন এলাকায় চলে যান। এ বছরই আলাউদ্দিন ইনতেকাল করেন। তার পুত্র গিয়াসুদ্দিন রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু মোঙ্গলরা গিয়াসুদ্দিনকে শহিদ করে দেয়। আর্তুগ্রুল ছিলেন আলাউদ্দিনের নিয়োগপ্রাপ্ত। কিন্তু তাদের রাজ্য দখল হয়ে যাওয়ার পর উসমান একজন স্বাধীন শাসক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন। এখান থেকেই সূচনা উসমানি সাম্রাজ্যের।

উসমান তার অধীনস্থ অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করলেন। রাজধানী নির্মাণ করলেন 'ইয়ানি শহর' বা নতুন নগরী নামের একটি শহরে। রাজ্যের পতাকা তৈরি করলেন। সেই পতাকা আজও তুরস্কের পতাকা হিসেবে টিকে আছে। রাজ্য গড়েই তিনি আনাতোলিয়ার সকল রোমান রাজাদেরকে ইসলামের দাওয়াত পাঠালেন। আর ইসলাম গ্রহণ না করলে তার বশ্যতা স্বীকার করে এবং জিজিয়া দিয়ে আনাতোলিয়ায় থাকতে হবে মর্মে বার্তা পাঠালেন। তার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা হলে লড়াইয়ের মাধ্যমে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার বার্তাও পাঠান। ছোট ছোট রাজ্যের রাজারা ভীত হয়ে মোঘলদের সাহায্য প্রার্থনা করল। এমন হতে পারে তা আগেই অনুমিত ছিল বিধায় উসমান প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলেন। উসমানের পুত্র উরখানের নেতৃত্বে একটি বাহিনী মোঙ্গলদের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়। মোঙ্গল বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে তিনি ফেরার পথে বুরসা[৩৬] নগরী জয় করেন। সময়টা ছিল ৭১৭ হিজরি। বুরসা বিজয় করে সেখানে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেন। তার অধিবাসীদের সাথে উরখান যে আচরণ করেন তাতে মুগ্ধ হয়ে তারা উসমানি বাহিনীকে ত্রিশ হাজার

---

৩৬. **বুরসা :** তুরস্কের চতুর্থ ঘনবসতিপূর্ণ শহর এবং অন্যতম শিল্প নগরী। - সম্পাদক

স্বর্ণমুদ্রা উপহার দেন এবং তাদের শাসক আফরিনুস ইসলাম কবুল করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি উসমানি বাহিনীর অনেক গুরুত্বপূর্ণ সদস্যে পরিণত হয়েছিলেন।

৭২৬ হিজরিতে পুত্র উরখানের হাতে শাসনভার অর্পণ করে উসমান শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। বুরসাতে তাকে দাফন করা হয়। এখানেই পরবর্তী উসমানি সুলতানদের দাফন করা হতো।

উসমান নিজেকে গাজি উসমান হিসেবে পরিচয় দিতেন। গাজি দ্বারা বোঝানো হতো মুজাহিদ। তিনি বোঝাতে চাইতেন যে, হয়তো গাজি নয়তো শহিদ, এটাই তো মুমিনের জীবন। জিহাদের প্রতি ভালোবাসার চিহ্ন তার এই উপাধি। তার অনুকরণে পরবর্তী অনেক উসমানি সুলতানই নিজেদের গাজি উপাধিতে ভূষিত করেন।



মানচিত্র নং-১৮
যে অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল উসমানি সাম্রাজ্য

সুলতান গাজি উরখান প্রথম

(৭২৬-৭৬৩ হিজরি/১৩২৬-১৩৬২ খ্রি.)

উরখান ছিলেন গাজি উসমানের দ্বিতীয় সন্তান। তার বড় ভাইয়ের নাম আলাউদ্দিন। বড় হলেও তিনি ছিলেন নির্জনতাপ্রিয় এবং অধিক পরহেজগার। অপরদিকে উরখান ছিলেন দৃঢ় হিম্মত ও বীরত্বের অধিকারী। তাই রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে উরখানই ছিলেন বেশি উপযুক্ত। এজন্য উসমান নিজেই মৃত্যুর আগে উরখানকে রাজ্যভার দিয়ে যান। আলাউদ্দিনও তা মেনে নিয়েছিলেন। উরখান স্বীয় বড় ভাইকে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ অনেক দায়িত্ব দিয়ে নিজে রাজ্য বিস্তার ও অন্যান্য বিষয়ে মনোযোগ দিলেন। তিনি রাজধানী পরিবর্তন করে বুরসায় নিয়ে আসেন।

রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রদবদল ও সেনাবাহিনীর নববিন্যাস

আলাউদ্দিন স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা প্রচলন করলেন। সেনাবাহিনীকে শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে এলেন এবং তাদেরকে নিয়মিত বাহিনীতে পরিণত করলেন। ইতিপূর্বে সেনাসদস্যরা কেবল যুদ্ধের ডাক পড়লেই উপস্থিত হতো, নিয়মিত ব্যারাকে থাকত না। এদিকে প্রত্যেক গোত্রের সেনাসদস্যরা যেকোনো সময় গোত্রের পক্ষে শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। এই সমস্যা সব যুগে সব শাসককেই ভুগিয়েছে। খলিল-পরবর্তী সময়ে যিনি খাইরুদ্দিন পাশা নামে ইতিহাসে বিখ্যাত হন, উসমানিদের অন্যতম বিশ্বস্ত একজন উজির ছিলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন অসহায় দরিদ্র ও যুদ্ধে নিহত হওয়া বাইজান্টাইন সৈনিকদের এতিম সন্তানদেরকে ইসলামের ওপর প্রতিপালন করে বিশেষ সেনাবাহিনী তৈরি করার। তাদেরকে এমনভাবে যুদ্ধের প্রশিক্ষণে মগ্ন রাখা হবে, যাতে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ছাড়া আর কোনো কাজ তারা জানবে না। আর সুলতান ছাড়া আর কাউকেও তারা চিনবে না বা মানবে না। সরাসরি সুলতান হবে তাদের প্রধান। এতে একদিক থেকে তারা অসহায়ত্ব ও বিলীন হয়ে যাওয়া থেকে রেহাই পাবে, অন্যদিকে তারা লাভ করবে ইসলামের মহান দৌলত এবং ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার মহাগৌরব।

এই বাহিনীর নামকরণ করা হলো 'ইয়ানি তাশরি' বা নতুন বাহিনী। ইতিহাসে যারা জেনিসারি বাহিনী নামে পরিচিত। অচিরেই এ বিশেষায়িত

বাহিনী উসমানিদের অন্যতম শক্তি হয়ে দেখা দিলো। ইউরোপজুড়ে উসমানিদের দিগ্বিজয়ী অভিযানে তারা নেতৃত্ব দিতে লাগল। প্রকৃত রহস্য জানার পর ব্যাপারটা ক্রুসেডারদের জন্য মারাত্মক ক্রোধ উদ্দীপক হলো। কারণ, তারা দেখছিল এই দুর্ধর্ষ বাহিনীটি তাদের ধর্ম থেকে আসা তরুণদের দিয়ে তৈরি, যারা ইসলাম কবুল করেছিল। আর শুধু ইসলাম কবুলেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং ইসলামের দিগ্বিজয়ে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছিল। তাই পশ্চিমা ও ক্রুসেডারঘেঁষা লেখকরা জেনিসারিদের ইতিহাসকে নানাভাবে কলুষিত করার চেষ্টা করে। আর উসমানিদের ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে যে, সন্তানদেরকে জোরপূর্বক আনা হতো এবং ইসলাম কবুলে বাধ্য করা হতো। উসমানিদের ব্যাপারে তাদের অসংখ্য মিথ্যাচারের মধ্যে এটা অন্যতম।

তবে জেনিসারিদের ব্যাপারে সুলতানগণ সবসময় সঠিক নীতি অবলম্বন করতে পারেননি। কোনো কোনো সুলতান জেনিসারিদের রাজনীতিতে নাক গলানোর সুযোগ দিয়েছিলেন। ফলে প্রায়ই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় রাজনীতিতে সৈনিকদের হস্তক্ষেপের কারণে। এসব কারণে ১২৪২ হিজরিতে খলিফা দ্বিতীয় মাহমুদ জেনিসারি বাহিনী বিলুপ্ত করে দেন।

গাজি উরখান রাজ্য বিস্তারের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের জন্য অনেক মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন, সরকারি কাজের সুবিধার্থে বিভিন্ন দপ্তর চালু করেন। অনেক মসজিদ ও খানকা তৈরি করেন। উলামায়ে কেরাম, কবি ও সাহিত্যিকসহ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিদের জন্য ভাতা চালু করেন।

উরখানের বিজয় অভিযান

একের পর এক রাজ্য বিজয় করছিলেন গাজি উরখান। আনাতোলিয়ার বেশ কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্য জয় করেন। তিনি ইজমির, আজনিক ও কোরাহসি দখল করেন। মূলত পিতা মারা যাওয়ার পর তার দুই পুত্র কোরাহসির শাসনভার নিয়ে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল, যেকোনো সময় পার্শ্ববর্তী রোমান রাজ্য থেকে হামলা হতে পারে। তাই উরখান রাজ্যটিকে নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তিনি কোনো রাজ্য জয় করলে তার অধিবাসীদের সাথে অত্যন্ত কোমল আচরণ করতেন। প্রত্যেককে যার যার ধর্ম পালনে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেন। আর কেউ ভিটেমাটি বিক্রি করে সর্বস্ব নিয়ে দেশ ত্যাগ করতে চাইলেও কাউকে বাধা দিতেন না।

বিধর্মী বিয়ে

দেখতে দেখতে উসমানি সাম্রাজ্য শক্ত অবস্থানে পৌঁছতে সক্ষম হয়। ৭৫৬ হিজরিতে বাইজান্টাইন সম্রাট পঞ্চম ইউহান্না সার্বিয়ার রাজা স্টিফেনের বিরুদ্ধে উরখানের সাহায্য কামনা করেন। স্টিফেন সার্বিয়ার অন্যান্য রাজা ও ভেনিসের রাজার সাথে একাট্টা হয়ে কনস্টান্টিনোপলে হামলার ইচ্ছা করেছিল। ইউহান্না উরখানকে প্রতিশ্রুতি দেন, তাকে সাহায্য করা হলে উরখানের সাথে কনস্টান্টিনোপলের উত্তরাধিকারী যুবরাজ ইউহান্না কান্তাকুজিনের মেয়ের বিয়ে দেওয়া হবে। যে যুবরাজের বোন স্বয়ং বাইজান্টাইন সম্রাটের স্ত্রী। উরখান প্রস্তাবে রাজি হন। তবে পথিমধ্যেই স্টিফেনের মৃত্যু খবর পৌঁছালে যাত্রা বাতিল করেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উরখান খ্রিষ্টান স্ত্রী গ্রহণ করেন।

একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, উসমানি সুলতানদের সময়টাতে মুসলিম সুলতানদের মধ্যে খ্রিষ্টান স্ত্রী গ্রহণ করার বিষয়টি ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। গাজি উসমানের খ্রিষ্টান স্ত্রী ছিল। গাজি উরখানও গ্রিক খ্রিষ্টান রমণীকে বিয়ে করেছিলেন। তাদের উত্তরসূরিদের মধ্যেও অনেক সুলতান তা করেন। এটা অবশ্যই উসমানিদের নেতিবাচক একটি দিক। কারণ, এসব স্ত্রীদের অধিকাংশই খ্রিষ্টধর্ম পরিবর্তন করত না। তারা নিজেদের সামর্থ্য কাজে লাগিয়ে স্বজাতি ও সাম্রাজ্যের খ্রিষ্টান প্রজাদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট আচরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল।[৩৭]

উসমানিদের ইউরোপ যাত্রা

সে সময় বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য অতি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। উরখান দেখলেন কনস্টান্টিনোপলে আক্রমণ করার মোক্ষম সুযোগ তার সামনে। যেই ভাবা সেই কাজ। তবে তিনি গতানুগতিক আক্রমণের দিকে গেলেন না। ইতিপূর্বে যতবার মুসলিমরা কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ করেছিল প্রত্যেকবার ছিল পূর্ব দিক থেকে। আর প্রতিবারই ব্যর্থতা নিয়ে ফিরে যেতে হয়েছিল। তাই উরখান সিদ্ধান্ত নিলেন প্রথমে নগরীর পশ্চিমের

---

৩৭. কিছু শর্ত সাপেক্ষে আহলে কিতাব নারীদেরকে বিয়ে করা ইসলামে বৈধ। তবে মুহাক্কিক আলেমগণ বলেন, বর্তমানে ফিতনার আশঙ্কা ও শর্তের অনুপস্থিতিতে আহলে কিতাব নারীদের বিয়ে করা অনুত্তম। -সম্পাদক

অঞ্চলগুলো দখলে নিয়ে নেবেন। শহরটিকে সব দিক থেকে ঘিরে ফেলে চূড়ান্ত আক্রমণ করাই ছিল তার পরিকল্পনা।

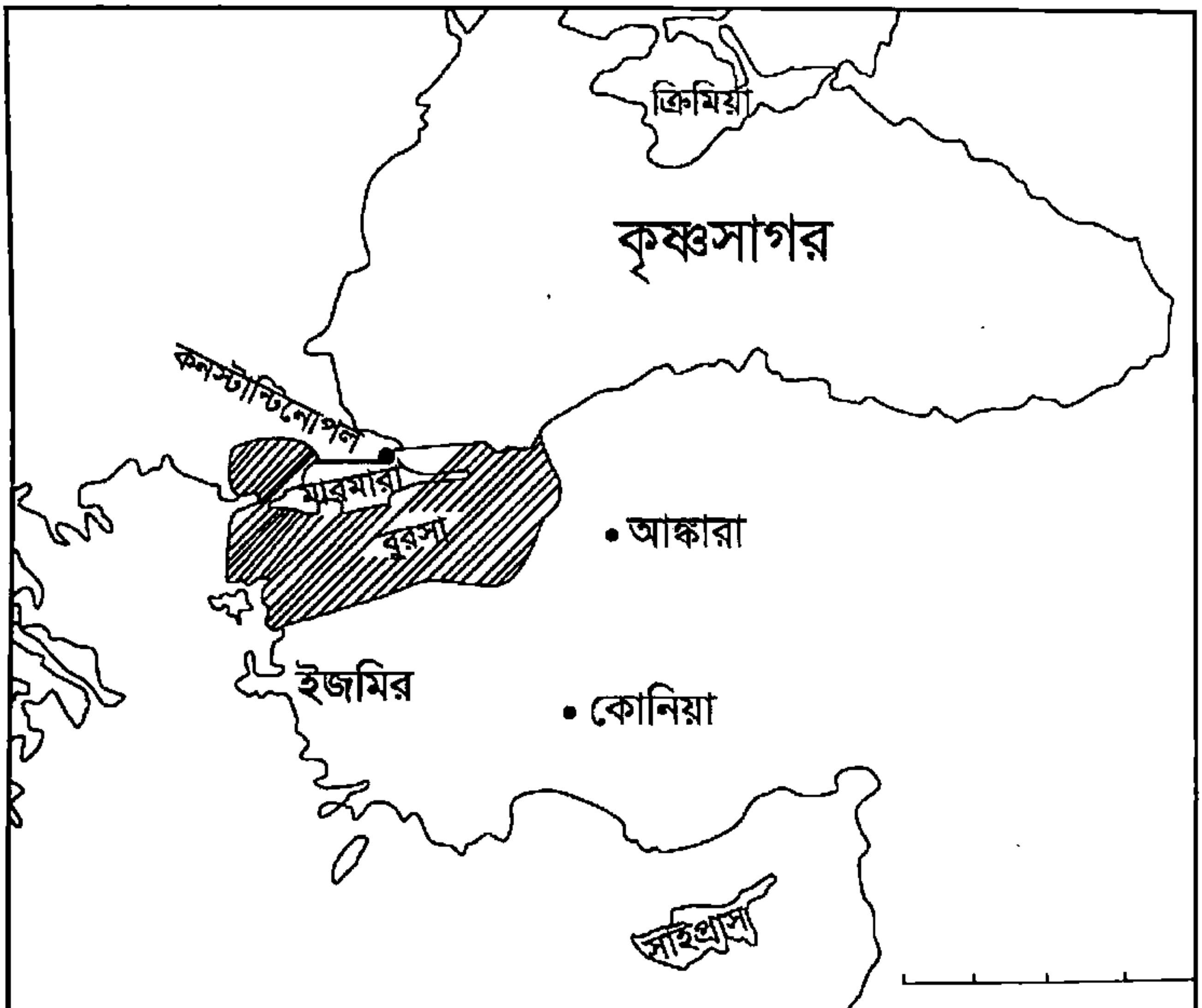
তখন পর্যন্ত উসমানিদের নৌবহর ছিল না। তাই প্রথম কাজ ছিল প্রতিপক্ষের নৌযানগুলো দখল করা। তাই উরখানের পুত্র সুলাইমান চল্লিশ জন বীর মুজাহিদের ছোট এক বাহিনী নিয়ে নগরীর পশ্চিম তীরের সকল নৌযান কবজা করে নিলেন। তারপর পূর্বে ফিরে এসে মূল বাহিনী নিয়ে পুনরায় পশ্চিমে অভিযান চালালেন। এভাবে সহজেই নগরের পশ্চিম পাশের বিস্তীর্ণ ভূমিতে এবং গ্যালিপলি[৩৮] উপদ্বীপে উসমানিদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হলো। অশেষ সামরিক গুরুত্বের অধিকারী অনেক দুর্গবিশিষ্ট গ্যালিপলি উপদ্বীপের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারাটা ছিল বিরাট টার্নিং পয়েন্ট। কারণ, ভূমধ্যসাগর থেকে কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছার একমাত্র নৌপথ দার্দানেলিস[৩৯] প্রণালি। উপদ্বীপের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এই দার্দানেলিস প্রণালির ওপর উসমানি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

৭৬০ হিজরিতে উরখানের বড় পুত্র উসমানি বাহিনীর প্রধান সেনাপতি সুলাইমান ঘোড়া থেকে পড়ে ইনতেকাল করেন। পরের বছর সুলতান উরখান ইনতেকাল করেন। সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন তার দ্বিতীয় পুত্র মুরাদ।

---

৩৮. **গ্যালিপলি :** তুরস্কের পশ্চিমাঞ্চলে ইউরোপীয় অংশে অবস্থিত একটি উপদ্বীপ। এর পশ্চিমেই জিয়ান সাগর এবং পূর্বে দার্দানেলিস প্রণালি অবস্থিত। -সম্পাদক

৩৯. **দার্দানেলিস :** মারমারা এবং এজিয়ান সাগর এই প্রণালির মাঝ দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। -সম্পাদক



মানচিত্র নং-১৯

১ম উরখানের শাসনামলে উসমানি সালতানাত

সুলতান গাজি মুরাদ প্রথম

(৭৬৩-৭৯১ হি./১৩৬২-১৩৮৯ খ্রি.)

আনাতোলিয়ার পররাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা

নতুন সুলতান গাজি মুরাদ তার পূর্বসূরিদের ধারা বজায় রেখে এশিয়া ও ইউরোপ দুই দিকেই অভিযান চালিয়ে যান। ইউরোপের চেয়ে এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তার করতেই উসমানিদের বেশি সতর্ক থাকতে হয়। কারণ, আনাতোলিয়ার অধিকাংশ অঞ্চলেই মুসলিম শাসন জারি ছিল। তাই যুদ্ধ ও রক্তপাত এড়িয়ে কৌশলে সেসব রাজ্য জয় করাই ছিল তার লক্ষ্য। এর মধ্যে আত্মীয়তা করা ছিল একটা কার্যকরী কৌশল। বস্তুত সাম্রাজ্য বড় করার চেয়ে মুসলিম শক্তিকে এক পতাকার নিচে সমবেত করা এবং অনৈসলামি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করাই ছিল উসমানিদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি সৈনিকদেরও চাহিদা ছিল না মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার। এরকম স্থানে তাদের কোনোরকম ধরেবেঁধে নিয়ে যাওয়া হতো। পক্ষান্তরে ইউরোপে অভিযানের ক্ষেত্রে তারা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত।

মুরাদ ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই কিরমানের শাসক আলাউদ্দিন তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠল। আনাতোলিয়ার স্বাধীন রাজ্যগুলোকে উসমানিদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা শুরু করল আলাউদ্দিন। পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে সুলতান মুরাদ নিজেই একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে কিরমানের রাজধানী আঙ্কারায় উপস্থিত হলেন। বিপদ টের পেয়ে আলাউদ্দিন রাজধানী আঙ্কারা উসমানিদের হাতে ছেড়ে দিয়ে দ্রুত রাজ্যের বাকি অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ মজবুত করে। এদিকে সুলতান মুরাদ আলাউদ্দিনের সাথে বিবাদ মেটানোর লক্ষ্যে তার কন্যাকে বিয়ে করে নেন।

সুলতান মুরাদের সাথে কন্যার বিয়ে হওয়ার পরও আলাউদ্দিনের মনের আগুন ধিকিধিকি জ্বলছিল। সুযোগ পেলেই উসমানিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিয়ে সময়ের অপেক্ষা করছিল। গোপনে আরও কিছু রাজ্যপতিকেও হাত করে নেয়। ৭৮৭ হিজরিতে (১৩৮৫ খ্রিষ্টাব্দে) কয়েকজন রাজা মিলে মুরাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত অভিযান চালায়।

এমতাবস্থায় মুরাদ তাদের দমনে শক্ত বাহিনী পাঠান। মুরাদের বাহিনী বিজয় লাভ করে। বন্দি হন সুলতানের শ্বশুর আলাউদ্দিন। কিন্তু কন্যার মধ্যস্থতায় রক্ষা পান আলাউদ্দিন। বছরে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ কর ধার্য করে নিজের পদে পুনর্বহাল করা হয় আলাউদ্দিনকে।

কিরমিয়ান রাজ্যের সাথে ঘনিষ্ঠতা করতে মুরাদ কিরমিয়ানের আমিরের কন্যার সাথে স্বীয় পুত্র ইয়াজিদের বিয়ে দেন। ইয়াজিদের শ্বশুর উপহার হিসেবে কোতাহিয়া নগর স্বীয় কন্যার হাতে তুলে দেন। শহরটি উসমানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ৭৮২ হিজরি সনে (১৩৮০ খ্রিষ্টাব্দে) দুওয়াইলাতুল হামিদ নামের ছোট এক রাজ্যের শাসক সম্পূর্ণ রাজ্য উসমানিদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের অধীনতা স্বীকার করে নেন।

ইউরোপে অভিযান

৭৬২ হিজরিতে (১৩৬১ খ্রিষ্টাব্দে) উসমানি বাহিনী ইউরোপে এডির্নে নগর জয় করে। এই শহরটি কনস্টান্টিনোপল থেকে কিছুটা উত্তরে। গুরুত্বপূর্ণ শহরটি দখল করেই সুলতান মুরাদ রাজধানী সেখানে স্থানান্তর করেন, যেন ইউরোপে অভিযান পরিচলানা সহজ হয়। তার এই পদক্ষেপ ছিল কনস্টান্টিনোপল জয়ের প্রথম কার্যকরী ধাপ। ৮৫৭ হিজরিতে সুলতান ফাতিহ কনস্টান্টিনোপল বিজয় করা পর্যন্ত আদ্রিয়ানোপল উসমানি সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে বহাল থাকে।

খুব অল্প সময়ে ইউরোপের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ শহর জয় হয়। যেমন : ফিলিপা (বর্তমান দক্ষিণ বুলগেরিয়া), কালজামিনা, ওয়ারদার। এর ফলে কার্যত চারদিক থেকেই কনস্টান্টিনোপল উসমানিদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে পড়ে।

উসমানিদের এই অগ্রগতিতে পার্শ্ববর্তী ইউরোপীয় রাজ্যগুলো শঙ্কিত হয়ে ওঠে। সবাই পোপকে চিঠি লিখে ব্যবস্থা নিতে আবেদন জানাতে শুরু করে। বাইজান্টাইন সম্রাট নিজে পোপের কাছে উপস্থিত হয়ে মাথা নত করে সম্মান জানান। পোপের হাতে পায়ে চুমু খেয়ে তার সমর্থন কামনা করেন। অথচ পোপ হলো ক্যাথলিক মতাবলম্বী আর কনস্টন্টাইন সম্রাট ছিল অর্থোডক্স। এর আগ পর্যন্ত উভয় দলের মধ্যে প্রচণ্ড মতবিরোধ ও শত্রুতা ছিল। কিন্তু ইসলামের বিরুদ্ধে তারা সে শত্রুতা ভুলে গিয়ে এক হয়ে গেল। সম্রাটের আহ্বানে পোপ সাড়া দিলো। ইউরোপের সকল

রাজাকে চিঠি লিখে নতুন ক্রুসেডের ডাক দিলো। ইউরোপে ছড়িয়ে পড়া উসমানিদের শায়েস্তা করার জন্য সবাইকে প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানাল।

এদিকে সার্বিয়ার রাজা পঞ্চম উরুকের ধৈর্য হলো না পোপের পদক্ষেপ পর্যন্ত অপেক্ষা করার। পার্শ্ববর্তী বসনিয়া, দক্ষিণ রোমানিয়ার রাজকীয় বাহিনী ও হাঙ্গেরির কিছু বিদ্রোহী ঘোড়সওয়ারের সহায়তায় নিজেই উসমানিদের হাত থেকে এডির্নে শহর মুক্ত করতে ছুটে এলো। সুলতান মুরাদ তখন আনাতোলিয়ায় কোনো এক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন। সেটাকে সুযোগ মনে করে সার্বিয়ানরা (ইউরোপীয় অংশে) উসমানিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু এখানেও উসমানিরা শক্তিতে বেশ সবল ছিল। তারা দ্রুত সে আক্রমণ প্রতিহত করে। এডির্নে শহরের বুক চিরে বয়ে যাওয়া মারতিজা নদীর কিনারে ইউরোপীয় বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে উসমানিরা। জীবিত সৈনিকেরা পালিয়ে জীবন রক্ষা করে। উসমানিদের শক্তিমত্তা দেখে অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের উপকূল অঞ্চল ডালমেসিয়ায় (প্রাচীন রাজ্য; যা বর্তমানের ক্রোয়েশিয়া, মন্টেনিগ্রো ও আলবেনিয়ার বিভিন্ন অংশজুড়ে বিস্তৃত) অবস্থিত রাজুজা রাজ্যের আমিররা ভীত হয়ে পড়ে। তারা উসমানিদের সাথে সন্ধি করে নেওয়াকেই নিরাপদ মনে করে। বাৎসরিক ৫০০ তদাঞ্চলীয় স্বর্ণমুদ্রা জিজিয়া প্রদানের ভিত্তিতে সন্ধি চুক্তি স্থাপিত হয়।

এরপর সার্বিয়ার আরেক রাজা ল্যাজার বিলিন বুলগেরিয়ার রাজা সিসমানের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উসমানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। কিন্তু এবারও তারা উসমানিদের হাতে পর্যুদস্ত হলো। ফলে বশ্যতা স্বীকার করে বাৎসরিক জিজিয়া দেওয়ার চুক্তিতে আবদ্ধ হলো। এ সময় সুলতান বুলগেরিয়ার রাজকন্যাকে বিয়ে করে দুই দেশের সম্পর্ককে আরও মজবুত করে নিলেন।

জিজিয়া প্রদানের সময় হওয়ার পর সার্বিয়া আর বুলগেরিয়া গড়িমসি শুরু করল। তখন তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে সুলতান সৈন্য প্রেরণ করলেন। উসমানি বাহিনী সার্বিয়ার (বর্তমানে যুগোস্লাভিয়ার দক্ষিণ অংশের) কয়েকটি শহর দখল করে নিলো। তিন বছর অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার পর ৭৮৪ হিজরিতে (১৩৮২ খ্রিষ্টাব্দে) উসমানিরা এই অঞ্চলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শহর সফিয়া জয় করতে সক্ষম হয়। এ ছাড়াও প্রাচীন

মেসিডোনিয়া বা বর্তমান গ্রিসের থেসালোনিকিও উসমানিদের করতলগত হয়।

এ সময় সুলতান মুরাদের এক পুত্র সাওজি ক্ষমতার লোভে পিতার সাথে বিদ্রোহ করে। তার সাথে মিলিত হয় বাইজান্টাইন সম্রাট ইউহান্না বালিয়ুজের আরেক পুত্র এন্ড্রনিকোস। এ কারণে বাইজান্টাইন সম্রাট নিজের পুত্রকে সিংহাসনের ব্যাপারে ত্যাজ্য করে। সুলতান মুরাদ দুই সাম্রাজ্যের উভয় যুবরাজকে শায়েস্তা করতে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। যুদ্ধে বিদ্রোহী দুই যুবরাজ নিহত হয়।

কসোভোর যুদ্ধ

(৭৯১ হিজরি/১৩৮৯ খ্রিষ্টাব্দ)

উসমানিরা যখন আনাতোলিয়াতে আলাউদ্দিনের সাথে যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত ঠিক সে সময়টিকে সার্বিয়ার রাজা হামলা করার মোক্ষম সুযোগ মনে করল। এই সুযোগেই তারা উসমানিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দক্ষিণ সার্বিয়ার কিছু অঞ্চল তারা দখল করে নিলো। এ পরিস্থিতি বুলগেরিয়ার শাসক সিসমানকে উসমানিদের ওপর হামলা করতে প্রলুব্ধ করে। কিন্তু উসমানি বাহিনী তাকে সে সুযোগ না দিয়ে ঝটিকা আক্রমণ চালায়। সিসমান পালিয়ে বুলগেরিয়ার উত্তর অংশে নিকোপলিসে আশ্রয় নেয়। তারপর সমস্ত শক্তি জড়ো করে পুনরায় উসমানিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু এবারও ভীষণ পর্যুদস্ত হয়ে রাজা নিজেও বন্দি হয়ে পড়ল। সুলতান মুরাদ তাকে প্রাপ্যের চেয়েও অনেক বেশি মর্যাদা দিলেন। তাকে মুক্তি তো দিলেনই, সাথে তার রাজ্যের অর্ধেক ফিরিয়ে দিলেন। বাকি অংশ উসমানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন।

সার্বিয়ার রাজা এসব জানতে পেরে তার বাহিনী নিয়ে পশ্চিমে চলে যেতে লাগল। পথেই উসমানিরা তাদের ধরে ফেলে। কসোভো ময়দানে দুই বাহিনী মুখোমুখি হয়। (এই ঐতিহাসিক অঞ্চল বর্তমানে যুগোস্লাভিয়া থেকে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে। এখানে অধিকাংশ অধিবাসী আলবেনিয়ান মুসলিম।) যুদ্ধ চলছিল সমানে সমান। এক পর্যায়ে সার্ব রাজার জামাতা দশহাজার সৈন্যসহ মুসলমানদের দলে চলে আসে। এতে সার্বদের পরাজয় হয়। সার্ব রাজা রণাঙ্গনে নিহত হয়। মুসলিম বন্দিদের সাথে সার্ব রাজা যে ভয়ানক আচরণ করেছিল সে সম্পর্কে মুসলিম সৈন্যরা

যথেষ্ট অবগত ছিল। তাই রাজাকে পেয়ে সৈন্যরা হত্যা করতে একটুও দেরি করেনি।

সুলতানের ইনতেকাল

যুদ্ধের পর সুলতান মুরাদ নিহত সার্ব সৈন্যদের মাঝে ঘুরে দেখছিলেন। এক সার্ব সৈনিক নিহতদের সাথে পড়ে ছিল। সুলতানকে দেখতে পেয়ে লাশের স্তুপ থেকে উঠে সুলতানকে খঞ্জর দিয়ে আঘাত করে বসে। দেহরক্ষীরা তৎক্ষণাৎ ঘাতককে হত্যা করে ফেলে, কিন্তু সুলতান এই আঘাতেই ইনতেকাল করেন।

কোথাও কোথাও পাওয়া যায় যুদ্ধের আগের রাতে সুলতান দোয়া করেছিলেন : 'হে আল্লাহ, আপনার ইজ্জত ও জালালের কসম! আমি এইসব জিহাদ দ্বারা অস্থায়ী দুনিয়ার কোনো কিছুই কামনা করি না। আমি কামনা করি আপনার সন্তুষ্টি। হে আমার রব, আপনি আমাকে জিহাদের পথে পরিচালিত করে সম্মানিত করেছেন। হে আমার মালিক, এখন আমাকে শাহাদাতের মৃত্যু দিয়ে আরও সম্মানিত করুন।'

সুলতান মুরাদের সময় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা

সুলতান মুরাদ ঘোড়সওয়ার বাহিনীকে বেশ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এদেরকে ডাকা হতো সিবাহ বা সিবাহিয়া বা অশ্বারোহী বাহিনী নামে। প্রত্যেক ঘোড়সওয়ারের জন্য কিছু জমি বরাদ্দ দিয়ে পরগনার ব্যবস্থা করেছিলেন। এসব জমির অধিবাসীরা মুসলিম হোক বা নাসারা; যুদ্ধবিরতি বা শান্তি-স্থিতির সময় সৈনিককে খারাজ পরিশোধ করত। আর যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সাধ্যমতো যুদ্ধ সরঞ্জাম দিত। তাদের জন্য আরও সৈন্য সরবরাহ করত। এই ব্যবস্থায় প্রাথমিকভাবে সুলতান বেশ উপকার লাভ করেন। কিন্তু এর দীর্ঘস্থায়ী ফলাফল ছিল খারাপ। সৈনিকদের মধ্যে কর্তৃত্বের মনোভাব তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বহু স্থানীয় ও আদিবাসীদের সাথে তারা রাজা-প্রজার মতো আচরণ শুরু করে। যার ফলে স্থানীয়রা বৈরী আচরণ করে ও প্রতিশোধ নেয়। একসময় এসব ভেতরগত দ্বন্দ্বের ফলে সরকারকেও বেশ বেকায়দায় পড়তে হয়।

সুলতান গাজি বায়েজিদ প্রথম

(৭৯১-৮০৪ হি./১৩৮৯-১৪০২ খ্রি.)

সুলতান বায়েজিদ সাম্রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে। তার রাজত্বের পুরোটা সময়জুড়ে তিনি জিহাদে মশগুল ছিলেন এবং দ্বীনের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। জিহাদের প্রচণ্ড উদ্দীপনা, দুরন্ত গতি ও আকস্মিকতায় শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন বলে তার নাম হয়ে যায় ইলদিরম বা বজ্র।

আনাতোলিয়াতে তৎপরতা

৭৯৩ হিজরিতে (১৩৯১ খ্রিষ্টাব্দে) মিনতাশা, আইদিন, সরুখান রাজ্যগুলো বিনা যুদ্ধেই উসমানিদের পদানত হয়। এসব রাজ্যের যুবরাজরা সব গিয়ে আশ্রয় নিতে লাগল ইসফানদিয়ারের রাজধানী কাস্তামনু শহরে। সুলতান বায়েজিদ আনাতোলিয়ার পশ্চিম ভূমিতে খ্রিষ্টানদের শেষ রাজ্য আশহারও জয় করে নেন। এদিকে কিরমানের শাসক আলাউদ্দিনও সামান্য কিছু জায়গা রক্ষা করার বিনিময়ে পুরো রাজ্য বায়েজিদের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

দাগাবাজি ও বিশ্বাসঘাতকতায় কুখ্যাত হয়ে গিয়েছিল আলাউদ্দিন। সুলতান মুরাদের সময়ও বারবার তার বিশ্বাসঘাতকতা দেখা গিয়েছিল। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। বায়েজিদ যখন ইউরোপে লড়াইয়ে ব্যস্ত ঠিক তখনই আলাউদ্দিন উসমানি বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল হারানো অঞ্চল পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে। আনাতোলিয়ায় নিযুক্ত কয়েকজন উচ্চপদস্থ উসমানি সেনাপতিকে বন্দি করে ফেলল আলাউদ্দিন। সংবাদ পেয়ে বজ্রের মতো দ্রুতগতিতে ছুটে আসেন সুলতান বায়েজিদ ইলদিরম। আলাউদ্দিনকে পর্যুদস্ত করে দুই সন্তানসহ তাকে বন্দি করেন। এবার আর তাকে রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি। এখানেই কিরমান রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে। কিরমানের পাশাপাশি সিভার্স, তুকাত রাজ্য দুটিও জয় করে নেন। তারপর রোখ করেন পলাতক যুবরাজদের আশ্রয়দাতা ইসফানদিয়ার রাজ্যের দিকে। সেখানে পৌঁছে ইসফানদিয়ারের আমিরকে আহ্বান জানালেন পলাতক যুবরাজদের সুলতানের হাতে তুলে দিতে। কিন্তু সে অস্বীকৃতি জানাল। তখন সুলতান সেখানে অভিযান চালিয়ে ইসফানদিয়ার

দখল করে নিলেন। আমির পালিয়ে তৈমুর লংয়ের আশ্রয় নিলো। যার আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

সুলতান বায়েজিদের ইউরোপ অভিযান

বায়েজিদ সার্বিয়ার শাসনক্ষমতায় সার্বিয়ার নিহত রাজা লাজারের পুত্র স্টিফেনকে বহাল রাখলেন। শর্ত হলো বার্ষিক জিজিয়া প্রদান করতে হবে এবং সুলতানের প্রয়োজনে যেকোনো মুহূর্তে সেনাবাহিনী নিয়ে তাকে সাহায্য করতে হবে। স্টিফেনের বোন উলিফারকে সুলতান বিয়ে করে প্রতিপক্ষের সাথে সম্পর্ক মজবুত করেন।

৭৯৪ হিজরিতে (১৩৯২ খ্রিষ্টাব্দে) সুলতান বায়েজিদ কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করেন। বায়েজিদই প্রথম উসমানি সুলতান, যিনি কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করেছেন। অবরোধ অব্যাহত রেখেই তিনি ওয়ালাচিয়ায় অভিযান পরিচালনা করেন। ওয়ালাচিয়ার রাজাকে বাধ্য করেন জিজিয়া দিয়ে উসমানি সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করে নিতে।

মুরাদের হাতেই বুলগেরিয়ার অর্ধেকাংশ উসমানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। রাজা সিসমানের মৃত্যুর পর বায়েজিদ বুলগেরিয়ার বাকি অর্ধাংশও সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। সে সময় সিসমানের পুত্র ইসলাম কবুল করলেন। বায়েজিদ তাকে সামসুন অঞ্চলের গভর্নর নিয়োগ দেন। এতে বুলগেরিয়া পূর্ণরূপে উসমানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

উসমানিদের বিজয় মিছিল দেখে ইউরোপজুড়ে খ্রিষ্টান সম্রাটদের মধ্যে হইচই শুরু হয়ে গেল। হাঙ্গেরির রাজা পোপ ও অন্য সব খ্রিষ্টান রাষ্ট্রের কাছে সাহায্য চাইল। পোপ উসমানিদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড যুদ্ধের ডাক দিলো। সে সময়ের প্রভাবশালী খ্রিষ্টান রাজারা সে ডাকে সাড়া দিতে লাগল। ডিউক অব বুরগুন্ডি (পূর্ব ফ্রান্সে অবস্থিত), অস্ট্রিয়া, বায়ান (দক্ষিণ জার্মান), সাধু জোহনের ঘোড়সওয়ার বাহিনীগুলো পোপের ডাকে সাড়া দিয়ে যুদ্ধযাত্রা করল।

অ্যাকর থেকে বের হয়ে সাইপ্রাস, তারপর রোডস হয়ে মাল্টায় গিয়ে উপস্থিত হলো। সম্মিলিত বাহিনী প্রথম আক্রমণ করল উত্তর বুলগেরিয়ার নিকোপলিস শহরে। ৭৯৮ হিজরিতে (১৩৯৬ খ্রিষ্টাব্দে) নিকোপলিস অবরোধ করা হলো। স্টিফেনের নেতৃত্বে উসমানি বাহিনী সেখানে পৌঁছে। সাথে উসমানি বাহিনীতে যোগ দেওয়া বহু খ্রিষ্টান সৈনিকও ছিল।

লড়াইয়ে ক্রুসেডার শক্তি চরমভাবে পরাজিত হয়। বহু নেতৃত্বস্থানীয় লোক বন্দি হয়। ডিউক অব বুরগুন্ডি বন্দি হয়। বিপুল মুক্তিপণ ও উসমানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না মর্মে ওয়াদা দিয়ে ডিউক মুক্তি পায়। তার ওয়াদা শুনে সুলতান বায়েজিদ তার বিখ্যাত উক্তিটি করেছিলেন, 'তোমাকে অনুমতি দিলাম এই ওয়াদা না রক্ষা করলেও চলবে। তুমি পুনরায় আমার সাথে লড়াই করতে আসতে পারো। ইউরোপের সব খ্রিষ্টানের সাথে লড়াই করে বিজয় লাভ করার চেয়ে বেশি প্রিয় আমার আর কোনো কাজ নেই।'

ইউরোপীয় বাহিনীর মহাপরাজয়ের পর বাইজান্টাইন সম্রাট বাধ্য হয়ে দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে অবরোধ থেকে রক্ষা পায়। সেই সাথে কনস্টান্টিনোপলের মুসলিমদেরকে সেখানে মসজিদ নির্মাণের সুযোগ দেয়।

তৈমুর লংয়ের সাথে সংঘর্ষ এবং উসমানি সাম্রাজ্যের সাময়িক দুর্দশা

এতক্ষণ যা শুনলাম সব যেন মধুর এক স্বপ্ন। ইউরোপের বুকে ইসলামের বিজয় অভিযান দুরন্ত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, এ যেন স্বপ্নের চেয়েও সুন্দর বাস্তবতা। কিন্তু এ পর্যায়ে আমাদের আচানক জেগে উঠতে হবে স্বপ্নভঙ্গের হতাশা নিয়ে। হঠাৎ এক ঝড় এসে যেন কিছু সময়ের জন্য লন্ডভন্ড করে দিয়ে গেল সাজানো বাগান।

এই প্রলয়ংকারী ঝড়ের নাম তৈমুর লং। পূর্ব দিক থেকে তীব্র ঝড়ের গতিতে এসে একে একে মুসলিম সাম্রাজ্যগুলো পদানত করে যাচ্ছিল এই যুদ্ধদানব। তৈমুর লং ছিল নামধারী মুসলিম। ইসলামের বিন্দুমাত্র চেতনাও যার ছিল না। ইসলামের দুশমনরা তাকে বারবার ব্যবহার করেছিল। মুসলিম হওয়ার পরও তার মাধ্যমে ইসলামের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল। তার কর্মকাণ্ডের ওপর ইসলামের কোনো ছাপ ছিল না।

তৈমুর লং বাগদাদ আক্রমণ করল। হালাকু খার পর দ্বিতীয়বার বাগদাদ ধ্বংস করল তৈমুর। বাগদাদের গভর্নর প্রাণ নিয়ে পালিয়ে সুলতান বায়েজিদের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। তৈমুর বায়েজিদের কাছে তাকে ফিরিয়ে দিতে বলল। কিন্তু বায়েজিদ তাতে অস্বীকৃতি জানালেন। ফলে যা হওয়ার তাই হলো। যুদ্ধদানব তৈমুর লং ঝাঁপিয়ে পড়ল উসমানি সাম্রাজ্যের ওপর। সিভাস নগরী দখল করল। সিভাসের গভর্নর বায়েজিদপুত্র আর্তুগ্রুলকে হত্যা করা হলো। পদানত করতে করতে

সাম্রাজ্যের কেন্দ্রের দিকে যেতে লাগল তৈমুর। তাকে থামাতে চূড়ান্ত লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলেন সুলতান বায়েজিদ। সুলতানের ছিল দেড় লক্ষ সৈনিকের বিশাল বহর। আর তৈমুরের বাহিনীর সদস্য সংখ্যা আশি হাজার। এ ঘটনা ৮০৪ হিজরির।

উভয় বাহিনী আঙ্কারায় মুখোমুখি হলো। সূর্যোদয়ের আগেই তুমুল সংঘর্ষ বেধে গেল। চলতে থাকল সূর্যাস্তের পরও। উসমানি বাহিনী অপেক্ষাকৃত বড় ছিল। কিন্তু যুদ্ধের মাঝপথে আইদিন, মিনতাশা, কিরমিয়ান, সারখুনের আঞ্চলিক (খ্রিষ্টান) বাহিনী বিশ্বাসঘাতকতা করে তৈমুরের বাহিনীতে যোগদান করে। এরপর সুলতান আর টিকে থাকতে পারলেন না। পরাজিত হলো উসমানি রাজকীয় বাহিনী। সুলতান নিজে এবং তার পুত্র মুসা তৈমুরীয়দের হাতে বন্দি হয়ে পড়েন। আরেক পুত্র মোস্তফা আত্মগোপনে চলে গেল। বিভিন্ন প্রদেশে পালিয়ে গেল বাকি তিন পুত্র সুলাইমান, ইসা ও মুহাম্মাদ। সুলতান বায়েজিদ অন্তত তিনবার বন্দিদশা থেকে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু প্রতিবারই তাকে ব্যর্থ হতে হয়। এর ফলে তিনি অনেক বেশি মুষড়ে পড়লেন। বন্দিজীবনের এই অপমান তার সহ্য হলো না। ৮০৫ হিজরিতে সুলতান বায়েজিদ ইনতেকাল করলেন।

তৈমুর সমগ্র আনাতোলিয়া বিজয় করল। আর তার প্রস্থানের পরই পুরো অঞ্চল আবার উসমানিদের বিজয়ের পূর্বের মুহূর্তের মতো ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গেল।

উসমানি সাম্রাজ্যের এই দুঃসময়টা সবচেয়ে বেশি উপভোগ করছিল ইউরোপীয় রাজ্যগুলো। উসমানিদের ভগ্নদশার সুযোগে স্বাধীনতা ঘোষণা করল বুলগেরিয়া, সার্বিয়া, আফলাক। ফলে দেখতে দেখতেই উসমানি সাম্রাজ্য সংকুচিত হয়ে গেল।

এদিকে পালিয়ে আসা তিন ভাইয়ের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে সাম্রাজ্যের যা বাকি ছিল, তা আরও টুকরো টুকরো হয়ে গেল। এডির্নেকে কেন্দ্র করে ইউরোপীয় অংশ দখল করল সুলাইমান। ভাইদের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করতে সে চুক্তি করল বাইজান্টাইন সম্রাট দ্বিতীয় ইমানুয়েলের সাথে। সম্রাটের সাথে সন্ধির অংশ হিসেবে থেসালোনিকি[৪০] শহর ও কৃষ্ণসাগরের

৪০. **থেসালোনিকি :** গ্রিসের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর।

উপকূলবর্তী কিছু অঞ্চল তার হাতে তুলে দিলো। পাশাপাশি সম্রাটের এক নিকটাত্মীয়র সাথে বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ হলো।

আরেক পুত্র ইসা পিতার মৃত্যুর সাথে সাথেই প্রাক্তন রাজধানী বুরসায় গিয়ে নিজেকে সাম্রাজ্যের অধিপতি ঘোষণা করল।

আরেক ভাই মুহাম্মাদ কিছুদিন আনাতোলিয়ায় আত্মগোপনে ছিল। তারপর তাতারদের দৌরাত্ম্য কমে এলে মুহাম্মাদ বেরিয়ে আসে। সৈন্যসামন্ত জোগাড় করে অবশিষ্ট তাতারদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অনেক অঞ্চল পুনর্দখল করে নেয়। পিতার সাথে বন্দি হওয়া ভাই মুসাকে মুক্ত করে। তারপর মুসাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে অন্য ভাইদের বিরুদ্ধে লড়ে সাম্রাজ্য নিজের করে নিতে।

ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ে মুহাম্মাদের বিজয় ও সিংহাসন লাভ

কয়েকটি লড়াইয়ের পর ইসা পরাস্ত হয় মুহাম্মাদের হাতে। ইসাকে হত্যা করা হয়। তারপর মুসার নেতৃত্বে মুহাম্মাদ একটি বাহিনী পাঠান আরেক ভাই সুলাইমানকে শায়েস্তা করতে। মুসা প্রথমে হামলা করতে এসে ভীত হয়ে পিছিয়ে যায়। সাহস সঞ্চয় করে দ্বিতীয়বার সুলাইমানের বাহিনীকে আক্রমণ করে। এবার সে ঠিকই সফল হয়। ৮১৩ হিজরিতে (১৪১০ খ্রিষ্টাব্দে) এডির্নের নগর দুয়ারে নিহত হয় সুলাইমান।

তারপর মুসা সার্বিয়া রাজ্যমুখী হয় উসমানিদের দুঃসময়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করা সার্বিয়ানদের উচিত শিক্ষা দিতে। পাশাপাশি হাঙ্গেরির বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করে বিজয় লাভ করে। এরা সব কাজে সার্বিয়ানদের সমর্থন দিয়ে যেত।

মুসা চেয়েছিল সাম্রাজ্যের ইউরোপীয় অংশে স্বতন্ত্র রাজত্ব কায়েম করতে। তাই মুসা কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করল। অবস্থা বেগতিক দেখে বাইজান্টাইন সম্রাট মুহাম্মাদের সাহায্য প্রার্থনা করল। আহ্বান শুনে মুহাম্মাদ দ্রুত সাড়া দিলেন এবং ইউরোপে এসে বাইজান্টাইন সম্রাট ও সার্বিয়ান রাজার সাথে চুক্তি করলেন আপন ভাইয়ের বিরুদ্ধে। চুক্তিবদ্ধ শক্তির কাছে মুসা পরাজিত হলো। মুসাকে হত্যা করা হলো এবং সাম্রাজ্যের একক অধিপতি হয়ে উঠলেন মুহাম্মাদ।

সুলতান গাজি মুহাম্মাদ প্রথম

(৮১৬-৮২৪ হি./১৪১৩-১৪২১ খ্রি.)

পররাষ্ট্র কার্যক্রম

উসমানি সাম্রাজ্যে পুনরায় প্রাণ ফিরে এলো। সুলতান মুহাম্মাদ শাসনক্ষমতায় বসলেন, কিন্তু তার হৃদয় আশ্বস্ত হলো না। বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে দেখা যায় তিন ভাইকে হত্যা করে ক্ষমতা গ্রহণ করার কারণে সুলতান মুহাম্মাদ আত্মপীড়ায় ভুগতেন। এজন্য পরবর্তী সময়ে তিনি আমূল বদলে গিয়েছিলেন। যেমন, কিরমানের আমির যুদ্ধ করে মুহাম্মাদের হাতে পরাজিত হয়ে তার কাছে আনুগত্যের ওয়াদা করলে মুহাম্মাদ তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু এই আমির মুক্ত হয়ে পুনরায় সুলতানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। আবার সে পরাজিত হয় ও বন্দি হয়। কিন্তু আবারও সুলতান তাকে ক্ষমা করে দেন। এমনইভাবে ইজমিরের আমিরকে পরাজিত করেও তাকে হত্যা না করে নিকোপলিসের শাসকের পদে বসিয়ে দেন।

অভ্যন্তরীণ রাজনীতি

বদরুদ্দিন নামের এক বিচারক সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সে এক নতুন মতবাদের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করতে শুরু করে। তার মতবাদ ছিল অনেকটা বর্তমান সাম্যবাদের মতো। অনেক মানুষ তার অনুসারী হতে শুরু করে। বিশেষত বিধর্মীদের মধ্যে তার সমর্থক বৃদ্ধি পায়। সুলতান তাকে সাম্রাজ্যের জন্য হুমকি মনে করলেন। তার সাথে যুদ্ধ করে তাকে পরাজিত করলেন এবং তাকে হত্যা করলেন।

বায়েজিদপুত্র মোস্তফার প্রত্যাবর্তন

সে সময় আত্মগোপন থেকে বের হয়ে আসে সুলতান মুহাম্মাদের আরেক ভাই মোস্তফা। মোস্তফা আত্মপ্রকাশ করেই সুলতানের কাছে সাম্রাজ্যের ভাগ দাবি করে এবং মুহাম্মাদের বাহিনীর সাথে লড়াই শুরু করে। কারা জুনাইদ মোস্তফার বাহিনীতে যোগ দেয়। মোস্তফা নিজের বাহিনী নিয়ে গ্রিসে প্রবেশ করল। কিন্তু সেখানে সুলতানের বাহিনীর কাছে মার খেয়ে পালিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করল বাইজান্টাইন সম্রাটের। সম্রাট তাকে গ্রহণ

করল। সুলতান সম্রাটকে বললেন মোস্তফাকে তার হতে তুলে দিতে, কিন্তু সম্রাট তা প্রত্যাখ্যান করল। তবে সুলতানকে কথা দিলো যে, মোস্তফা যেন নতুন কোনো ষড়যন্ত্র না করতে পারে তাই তাকে নজরদারিতে রাখা হবে। সুলতান তা মেনে নিলেন এবং ভাইয়ের জন্য মাসিক ভাতা ধার্য করলেন। কারা জুনাইদের বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও তাকে পুনরায় ক্ষমা করলেন।

৮২৪ হিজরিতে (১৪২১ খ্রিষ্টাব্দে) পুত্র মুরাদ (দ্বিতীয়)-কে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী বানিয়ে সুলতান মুহাম্মাদ পরপারে পাড়ি জমালেন। উসমানি সাম্রাজ্যের আরেকটি নেতিবাচক দিক হলো রাষ্ট্র ক্ষমতার দ্বন্দ্বে এক ভাই অপর ভাইকে হত্যা করা। এই যে তা শুরু হলো এরপর এই প্রক্রিয়া চলেছে বহুবার।

সুলতান গাজি মুরাদ দ্বিতীয়
(৮২৪-৮৫৫ হি./১৪২১-১৪৫১ খ্রি.)

৮২৪ হিজরিতে (১৪২১ খ্রিষ্টাব্দে) মাত্র আঠারো বছর বয়সে মুরাদ ক্ষমতায় আরোহণ করেন। সুলতান মুরাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল তৈমুরীয় ঝড়ে লন্ডভন্ড হয়ে যাওয়া এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া আনাতোলিয়াতে শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। কারণ, ঐক্যবদ্ধ মুসলিম শক্তি ছাড়া ইউরোপে বিজয় অভিযান পরিচালনা সম্ভব নয়। সে লক্ষ্যে তিনি আপাতত ইউরোপে যুদ্ধ স্থগিত করলেন এবং হাঙ্গেরির রাজার সাথে পাঁচ বছরের যুদ্ধবিরতি চুক্তি করলেন।

কিন্তু এতে বেশকিছু সমস্যা দেখা দিলো। যুদ্ধবিরতির জন্য বাইজান্টাইন সম্রাট শর্ত দিলো কনস্টান্টিনোপলের ওপর হামলা করা যাবে না, আর সেটা নিশ্চিত করার জন্য সুলতানের দুই ভাইকে সম্রাটের হাতে তুলে দিতে হবে। শর্ত না মানলে হুমকি দেওয়া হলো কনস্টান্টিনোপলে নির্বাসিত মোস্তফাকে মুক্ত করে দেওয়া হবে। সুলতান শর্ত গ্রহণ করলেন না। বাইজান্টাইন সম্রাট তখন মোস্তফাকে দশটি ছোট জাহাজ দিয়ে মুক্ত করে দিলো। মুক্ত হয়েই মোস্তফা দার্দানেলিস প্রণালির নিকটস্থ গ্যালিপলি শহরে অভিযান চালাল। কিন্তু দুর্গ দখল করতে পারল না। শহরে রক্ষীবাহিনী মোতায়েন করে সে রাজধানী এডির্নের দিকে এগিয়ে চলল। পথিমধ্যে সুলতানি বাহিনীর সেনাপতি বায়েজিদ পাশাকে বন্দি করে হত্যা করল। কিন্তু মোস্তফা এডির্নেতে পৌঁছতে পারলেন না। তার অনুগামী বাহিনীর কয়েকজন সেনাপতি তার সঙ্গ ত্যাগ করল। ফলে সে গ্যালিপলিতে ফিরে গেল। সেখানেই তাকে পাকড়াও করা হয় এবং শেষ করে দেওয়া হয়।

সুলতান মুরাদ ক্ষিপ্ত হয়ে কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করলেন। সময়টা ছিল ৮২৫ হিজরি। কিন্তু নগর জয় করতে পারলেন না।

সুলতান ভ্রাতার বিদ্রোহ

সুলতান মুরাদ কনস্টান্টিনোপল অবরোধে ব্যস্ত থাকার সুযোগকে সদ্ব্যবহার করার চিন্তা করল তার ভাই মোস্তফা। সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। তাকে সমর্থন দিলো আনাতোলিয়ার ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যগুলোর শাসকেরা। এই কারণে সুলতান কনস্টান্টিনোপলের অবরোধ তুলে নিয়ে ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযান করতে বাধ্য হলেন। মোস্তফা পরাজিত ও নিহত হলো।

কারা জুনাইদের বিদ্রোহ

সুলতান মুহাম্মাদের হাতে দুই দুইবার পরাজিত হয়ে বন্দি হওয়ার পর সুলতান তাকে উভয়বার ক্ষমা করেছিলেন। কিন্তু এরপরও এই লোকের বিশ্বাসঘাতকতার সাধ মেটেনি। সুযোগ বুঝে পুনরায় সুলতান মুরাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল কারা জুনাইদ। আইদিন দখল করে নিজেকে স্বাধীন সুলতান ঘোষণা করল। এবার উসমানি বাহিনী তার ওপর কঠিনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার বাহিনীকে পরাজিত করে তাকেও হত্যা করা হলো।

সুলতান মুরাদের আনাতোলিয়া অভিযান

নানা বিশৃঙ্খলার পরও সুলতান মুরাদ তার লক্ষ্য ভুলে যাননি। তিনি আনাতোলিয়ায় উসমানি সাম্রাজ্যের হারানো অঞ্চলগুলো পুনরুদ্ধার করতে উঠেপড়ে লাগলেন। তবে এগোলেন খুবই কৌশলে। তিনি প্রথমেই কিরমানের আমিরের সাথে সন্ধিচুক্তি করলেন।

এদিকে কাস্তামনুর আমির দেখলেন তিনি অচিরেই গ্যাঁড়াকলে পড়তে যাচ্ছেন। কারণ, সুলতানের ভাই মোস্তফাকে তিনি বিদ্রোহের সময় সমর্থন দিয়েছিলেন। তাই সুলতান মুরাদ প্রতিশোধের জন্য আসার আগেই তিনি রাজ্যের অর্ধেক সুলতানকে ছেড়ে দিলেন এবং আপন কন্যাকে সুলতানের সাথে বিয়ে দিলেন।

এরপর সুলতান মুরাদ আইদিন, মিনতাশা, সারখুন, হামিদ অঞ্চল ও কিরমিয়ান দখল করে নেন। কিরমিয়ানের শাসক মৃত্যুর সময় অসিয়ত করল যে, তার শাসনাঞ্চল যেন উসমানি সাম্রাজ্যে যুক্ত হয়ে যায়। কারণ, তার কোনো উত্তরসূরি ছিল না। ফলে এগুলো সব উসমানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এর মাধ্যমে আনাতোলিয়ার সমস্যার সমাধান হয়ে গেল এবং সুলতান ইউরোপে অভিযান চালনার পূর্ণ সুযোগ পেয়ে গেলেন।

ইউরোপে ইসলামের বিজয় অভিযান

ইউরোপে সুলতান মুরাদের অধিকাংশ অভিযান ছিল হাঙ্গেরির রাজার বিরুদ্ধে। সেসব লড়াইয়ে কখনো মুসলিমদের বিজয় হতো, কখনো বা পরাজয় হতো।

প্রথম যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর বিজয় হয়েছিল। সে যুদ্ধে হাঙ্গেরির রাজা দানিয়ুবের পূর্ব উপকূল উসমানিদের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ফলে তখন থেকে দানিয়ুব নদী দুই সাম্রাজ্যের সীমানা গণ্য হতে থাকে।

সার্বিয়ার রাজা জর্জ বার্নকপটিশ উসমানিদের অগ্রযাত্রায় ভীত হয়ে পড়ে। রাজা স্বেচ্ছায় সুলতানের হাতে কিছু অঞ্চল তুলে দেয়। সেই সাথে বাৎসরিক জিজিয়া প্রদান এবং হাঙ্গেরির সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শাসন টিকিয়ে রাখে। সুলতান সার্বিয়ান রাজকন্যা মারাকে বিয়ে করে নেন।

সুলতান মুরাদ ৮৩৩ হিজরিতে থেসালোনিকি থেকে ভেনিস পর্যন্ত এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন। ৮৩৬ হিজরিতে ওয়ালাচিয়ার শাসক সুলতানের অধীনতা স্বীকার করে। সুলতান মুরাদ আলবেনিয়া রাজ্য জয় করেন। পরাজিত হয়ে আলবেনিয়ার শাসক তার চার পুত্রকে সুলতানের হাতে অনেকটা বন্ধক রেখে নিজের শাসন ঠিক রাখে। ৮৩৪ হিজরিতে রাজা মারা গেলে সুলতান আলবেনিয়াকে উসমানি সাম্রাজ্যের অধীনে নিয়ে আসেন।

সুলতান এবার কনস্টান্টিনোপল বিজয় করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ঠিক তখনই খ্রিষ্টান রাজ্যগুলো সন্ধি ভঙ্গ করতে শুরু করল। সার্বিয়ার রাজা জর্জ বার্নকপটিশ চুক্তি ভঙ্গ করে বিদ্রোহ করল। ফলে সুলতান তার বিরুদ্ধে অভিযান চালালেন এবং তাকে হত্যা করলেন। সেই সাথে সার্বিয়ার আরও কিছু অঞ্চল বিজয় করলেন। বৃহত্তর শহর বেলগ্রেড অবরোধ করে রাখলেন ছয় মাস। কিন্তু ছয় মাসেও তা জয় করতে পারলেন না। তখন তিনি রোমানিয়ার পূর্বাঞ্চলের ট্রান্সসিলভানিয়ায় সেনা প্রেরণ করলেন। সে সময় অঞ্চলটি হাঙ্গেরির অধীনে ছিল। এখানে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে উসমানি বাহিনী পরাজিত হলো। সেনাপতিসহ বিশ হাজার সৈন্য শাহাদাত বরণ করল। এর প্রতি-আক্রমণে সুলতান আশি

হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী পাঠালেন। কিন্তু এই বাহিনীও পরাজিত হলো এবং এর সেনাপতি বন্দি হলেন। সময়টা ছিল ৮৪৫ হিজরি।

পরপর উসমানিদের দুটি বৃহৎ পরাজয় হলে হাঙ্গেরি সম্রাট বেশ সুযোগ পেয়ে গেল। সে তার সর্বশক্তি নিয়ে উসমানিদের থেকে সার্বিয়া মুক্ত করতে এলো। তার সাথে ছিল জার্মানি, ফ্রান্স, ভেনিস, পোল্যান্ড, জেনোভা, সার্বিয়া, দক্ষিণ রোমানিয়ার সম্মিলিত বিশাল সাহায্যকারী বাহিনী। পরপর তিনটি যুদ্ধে সম্মিলিত বাহিনীর হাতে উসমানিরা পরাজিত হয়। এমতাবস্থায় সুলতান সন্ধিচুক্তি করতে বাধ্য হলেন। সন্ধির শর্ত হিসেবে দক্ষিণ রোমানিয়া ছেড়ে দিতে হলো হাঙ্গেরির কাছে। সার্বিয়ার অনেক এলাকাও ছেড়ে দিতে হলো। এসব ছেড়ে দেওয়ার শর্তে দশ বছরের যুদ্ধ বিরতির চুক্তি করলেন।

পরপর তিন বৃহৎ পরাজয় ও টানা যুদ্ধে সুলতান যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এর মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র আলাউদ্দিনের ইনতেকালে তিনি আরও মুষড়ে পড়লেন। এজন্য চাইলেন বাকি জীবন কিছুটা নির্জনে থেকে কাটিয়ে দিতে। মাত্র চৌদ্দ বছরের বালকপুত্র মুহাম্মাদ (দ্বিতীয়)-এর হাতে ক্ষমতাভার ন্যস্ত করে তিনি চলে গেলেন রাজধানী থেকে অনেক দূরে পূর্ব আনাতোলিয়ার আইদিনে জীবনের শেষ দিনগুলো কাটাতে।

মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে নতুন ক্রুসেডীয় ঐক্য

খ্রিষ্টান দুনিয়ার আধ্যাত্মিক পিতা পোপ দেখল উসমানি বাহিনীতে এখন টানা পরাজয়ের গ্লানি ভর করছে। আবার সুলতান পদত্যাগ করে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রের কাছে, যে এখনো যুদ্ধের কিছুই তেমন বোঝে না। এই সুযোগে হয়তো মুসলমানদেরকে ইউরোপ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া যাবে। তাই সে হাঙ্গেরির রাজাকে সন্ধি ভঙ্গ করতে উদ্বুদ্ধ করল। সেই সাথে ইউরোপের সমস্ত খ্রিষ্টানকে আহ্বান জানালো এই যুদ্ধে অংশ নিতে।

ভার্নার[৪১] যুদ্ধ

(৮৪৮ হি./১৪৪৪ খ্রি.)

ইউরোপের রাজ্যগুলো সমস্ত শক্তি একত্র করে বুলগেরিয়া আক্রমণ করল। এই পরিস্থিতিতে সুলতান নির্জনতা ভঙ্গ করে পুনরায় রণাঙ্গনে উপস্থিত হলেন। এবার সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব নিজ হতে তুলে নিলেন। কৃষ্ণসাগরের উপকূলে ভার্না নগরে দুই পক্ষ মুখোমুখি হয়। তুমুল লড়াইয়ের পর ক্রুসেডীয় মিত্রশক্তি চরমভাবে পরাস্ত হলো। যুদ্ধে হাঙ্গেরির রাজা নিহত হলো। তখন সৈন্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলো। সুলতান চূড়ান্ত আঘাত হেনে তাদের ছিন্নভিন্ন করে দিলেন। পোপের প্রতিনিধি নিহত হলো। যুদ্ধের পর সুলতান মুরাদ পুনরায় ক্ষমতা হস্তান্তর করে নির্জনবাসে চলে গেলেন।

উসমানি বাহিনীর বিশেষ শাখা জেনিসারি সৈন্যরা কমবয়সী সুলতানকে হেয়জ্ঞান করতে লাগল। এদিকে বাইজান্টাইন সম্রাট সাম্রাজ্যকে তার সন্তানদের মধ্যে ভাগ করে দেয়। জানাকে কনস্টান্টিনোপল আর কনস্টান্টাইনকে গ্রিসের পূর্বাঞ্চলের শাসনভার দেয়। সুলতান জেনিসারিদের উচিত শিক্ষা দিতে পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসেন এবং জেনিসারি বাহিনীকে গ্রিসে যুদ্ধে প্রেরণ করেন।

ইস্কান্দার বেগের বিদ্রোহ

ইস্কান্দার বেগ আলবেনীয় রাজপুত্র। সেই চারজনের একজন, যারা সুলতানের হাতে বন্ধক হিসেবে ছিল। সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সুলতানের যুদ্ধে থাকার সুযোগে সে পালিয়ে আলবেনিয়া চলে গেল। আলবেনিয়া থেকে উসমানি বাহিনীকে বিতাড়িত করল। সুলতান তাকে ধাওয়া করলেন। তাকে পরাজিত করে হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করলেন। সময়টা ৮৫১ হিজরি (১৪৪৭ খ্রিষ্টাব্দ)। কসোভো প্রান্তরে হাঙ্গেরিদের সাথে যুদ্ধ বেধে গেলে সুলতান ইস্কান্দারকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। তিনি তাকে জিজিয়া প্রদান করে ক্ষমতায় আরোহণের প্রস্তাব দেন। কিন্তু ইস্কান্দার সেটা প্রত্যাখ্যান করল। পরবর্তী সময়ে সুলতান মুরাদ

---

৪১. ভার্না : বুলগেরিয়ার কৃষ্ণসাগর উপকূলীয় বন্দর নগরী। -সম্পাদক

আলবেনীয় অভিযানের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু এর আগেই তার মৃত্যু হয়ে যায়।

কসোভোর দ্বিতীয় যুদ্ধ

(৮৫২ হি./১৪৪৮ খ্রি.)

এই রণাঙ্গনে এটি মুসলিম ও খ্রিষ্টশক্তির দ্বিতীয় লড়াই। এবারের লড়াই হাঙ্গেরির সাথে এবং এবার ছিল ভার্নার পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের উপযুক্ত সময়। সত্যিই এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী বিশাল বিজয় লাভ করল।

৮৫৫ হিজরিতে (১৪৫১ খ্রিষ্টাব্দে) সুলতান মুরাদ ইনতেকাল করেন। বিশাল উসমানি সাম্রাজ্যের অধিপতি হন তার পুত্র মুহাম্মাদ (দ্বিতীয়)। যিনি ইতিহাসে মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ নামেই অধিক পরিচিত।



মানচিত্র নং-২০

২য় মুরাদের শাসনামলে উসমানি সালতানাত

সুলতান গাজি মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ
(৮৫৫-৮৮৬ হিজরি/১৪৫১-১৪৮১ খ্রিষ্টাব্দ)

অধিকাংশ মুসলিম উসমানি সালতানাত বলতে একবাক্যে সুলতান ফাতিহকে চেনেন। তিনিই উসমানিদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় শাসক। ইউরোপে রাজত্ব করার কারণে উসমানিদের প্রতি ইউরোপীয়দের আক্রোশ সবচেয়ে বেশি। এজন্য ইউরোপীয় লেখকরা উসমানিদের বদনাম করে করে তাদের ব্যাপারে একটা অনীহার জন্ম দিয়েছে মানুষের মনে। তাই আজ মানুষ উসমানিদের কোনো কৃতিত্ব জানে না এক কনস্টান্টিনোপল জয় ছাড়া। আর কোনো সুলতানকেও চেনে না এক সুলতান ফাতিহ ছাড়া।

সুলতান ফাতিহের অবদান সত্যিই অনস্বীকার্য। কিন্তু তার সময়ের চেয়ে সব দিক থেকে আরও উন্নত সময়ও উসমানিরা পার করেছে। বাকি সুলতানদের আলোচনায় পাঠক তা দেখবেন। অথচ সেসব কেউ জানে না, সেই সুলতানদেরও কেউ চেনে না। তবে সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ যে উসমানি সাম্রাজ্যের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র, সেটা প্রত্যেকেই স্বীকার করবে। তার শ্রেষ্ঠত্বের জন্য প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ভবিষ্যদ্বাণী যথেষ্ট : 'কনস্টান্টিনোপল অচিরেই বিজয় হবে। কতই-না উত্তম তার বিজেতা, আর কতই উত্তম সেই বাহিনী।'

কনস্টান্টিনোপল জয়

উসমানিদের আগেও বহুবার মুসলিম বাহিনী কনস্টান্টিনোপল জয়ের চেষ্টা করেছিল। এ ক্ষেত্রে তাদের উৎসাহিত করেছে প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস : আবু কাবিল রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রা.-এর নিকট বসা ছিলাম। তাকে প্রশ্ন করা হলো, কনস্টান্টিনোপল নাকি রোম, কোন নগর আগে জয় হবে? তখন তিনি পুরাতন একটি বাক্স আনতে বললেন। তারপর সেখান থেকে একটি কিতাব বের করে বললেন, আমরা একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু লেখার জন্য বসা

ছিলাম। তখন তাকে এই প্রশ্নই জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি উত্তর দিলেন, হিরাকলার শহর (কনস্টান্টিনোপল) প্রথমে জয় হবে।[৪২]

কনস্টান্টিনোপল অভিযানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

- কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের উদ্দেশ্যে মুসলিম বাহিনীর অভিযানের সূচনা হয় সেই উসমান রা.-এর সময়ে। মুআবিয়া রা. তখন শামের গভর্নর। তারই নেতৃত্বে ৩২ হিজরি মোতাবেক ৬৫৩ খ্রিষ্টাব্দে একটি স্থলবাহিনী কনস্টান্টিনোপল রওনা করে। স্থলপথে এশিয়া মাইনর অতিক্রম করে তারা বসফরাস উপকূলে পৌঁছে যান। এদিকে তাদের সহায়তায় একটি নৌবাহিনী বুসর বিন আবি আরতাতের নেতৃত্বে রওনা দেয়। পশ্চিম ত্রিপোলি থেকে এই বাহিনী কনস্টান্টিনোপলের পথ ধরে। কিন্তু এই যাত্রায় মুসলিম বাহিনীকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়।

- মুআবিয়া রা.-এর শাসনকালে ৪৪ হিজরি মোতাবেক ৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার কনস্টান্টিনোপল অভিযান চালানো হয়। কিন্তু আবারও তা ব্যর্থ হয়।

- ৪৯ হিজরিতে ৬৬৯ খ্রিষ্টাব্দে আবারও সৈন্য প্রেরণ করেন মুআবিয়া রা.। এবার এক বিশাল বাহিনী পাঠানো হয়। বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন সুফিয়ান বিন আওফ। সহ-অধিনায়ক ইয়াজিদ বিন মুআবিয়া। এই বাহিনীর সদস্য ছিলেন আবু আইয়ুব আনসারি রা. ইবনে উমর রা., ইবনে আব্বাস রা., ইবনে জুবাইর রা.-এর মতো মহান সাহাবিগণ। এবারও বুসর বিন আবি আরতাতের নেতৃত্বে একটি নৌবাহিনী সাথে ছিল। নৌবহর বিনা বাধায় দার্দানেলিস প্রণালি অতিক্রম করে ফেলে। জলে-স্থলে দীর্ঘ ৭ বছর অনিয়মিতভাবে নগরী অবরোধ করে রাখা হয়। শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে তাদের ফিরে আসতে হয়। ৫৮ হিজরি মোতাবেক ৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে তারা ফিরে আসেন।

---

৪২. *মুসনাদে আহমাদ* : ৬৬৪৫

- ৯৬ হিজরি মোতাবেক ৭১৫ খ্রিষ্টাব্দে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন সুলাইমান বিন আবদুল মালিক। তিনি দায়িত্ব নিয়ে তার ভাই মাসলামা বিন আবদুল মালিককে কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করতে পাঠান। নির্দেশ দেন, শহর জয় কিংবা মৃত্যু আসা পর্যন্ত অবরোধ অব্যাহত থাকবে। মাসলামা ৯৮ হিজরি মোতাবেক ৭১৬ খ্রিষ্টাব্দে আনাতোলিয়ার মালভূমি পাড়ি দিয়ে কনস্টান্টিনোপল পৌঁছেন। পথিমধ্যে জয় করেন অনেক শহর-নগর। তারপর কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করলেন ৯৯ হিজরির ২ মুহাররম (১৫ আগস্ট ৭১৭ খ্রিষ্টাব্দ) তারিখে। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ না যেতেই ১০ সফর ৯৯ হিজরিতে খলিফা সুলাইমান ইনতেকাল করেন। তার ওপর তখন শুরু হয়ে যায় শীতকাল। ইউরোপের শীতের তীব্রতায় আরবরা অভ্যস্ত ছিল না। ফলে মুসলিমরা অবরোধ তুলে নিয়ে শামের সীমান্তের দিকে ফিরে আসে।

- তারপর বেশ কয়েকবার মুসলিম বাহিনী নগরীর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন খিলাফতের পক্ষ থেকে কনস্টান্টিনোপল জয়ের জোর কোনো প্রচেষ্টা চালানো হয়নি।

- প্রথম যুগের অভিযানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছিল আব্বাসীয় খলিফা মাহদির শাসনকালে। সেবার খলিফাপুত্র হারুনুর রশিদের নেতৃত্বে ১৬৫ হিজরি মোতাবেক ৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দের গ্রীষ্মে মুসলিম বাহিনী কনস্টান্টিনোপল যাত্রা করে। আনাতোলিয়ার মালভূমি অতিক্রম করে বাহিনী পৌঁছে যায় বসফরাসের এশীয় তীরে। কনস্টান্টিনোপলের ঠিক উল্টো পাশে বসফরাসের অপর প্রান্তে আসকোডার টিলাঞ্চলে তারা তাঁবু ফেলেন। সে সময় বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসা নাবালক শিশু ষষ্ঠ কনস্টান্টাইন। মূলত সাম্রাজ্য সামলাচ্ছিল তার মা আইরিন। হারুনুর রশিদের বাহিনী বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাইজান্টাইনদের ওপর। যুদ্ধে বাইজান্টাইন সেনারা ভীষণ পর্যুদস্ত হলো। যুদ্ধ হয় বসফরাসের এশীয় তীরে। বিপদ বুঝে সন্ধি করতে এবং বাৎসরিক জিজিয়া প্রদান করতে বাধ্য হয়।

- উসমানি সুলতানদের মধ্যে প্রথম ৭৯৮ হিজরি মোতাবেক ১৩৯৫ খ্রিষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করেন সুলতান বায়েজিদ প্রথম। কিন্তু সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে তৈমুর লংয়ের আক্রমণ শুরু হলে তিনি অবরোধ উঠিয়ে সেদিকে মনোযোগ দিতে বাধ্য হন। মূলত প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই কনস্টান্টিনোপল বিজয় করাটাকে উসমানি সুলতানগণ টার্গেট করেছিলেন। কেমন যেন এটাই ছিল তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। প্রথম উসমানি সুলতান গাজি উসমান তার বংশধরদের কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের অসিয়ত করে যান। এই অসিয়ত প্রজন্ম পরম্পরায় সুলতানদের মাঝে চলতে থাকে। অবশেষে সুলতান মুহাম্মাদ দ্বিতীয়কে আল্লাহ তাআলা এই মহাসৌভাগ্য দান করেন। তিনিই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী করে যাওয়া সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। তিনিই ইসলামের ইতিহাসের একমাত্র সুলতান, যার উপাধি আল-ফাতিহ বা বিজেতা।

এই সবকিছু সামনে রেখেই সুলতান ফাতিহ কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। প্রথমেই তিনি একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। কনস্টান্টিনোপলের নৌ-চলাচলের পথ হলো মারমারা উপসাগর ও কৃষ্ণ সাগরের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টিকারী বসফরাস প্রণালি। এই প্রণালি দিয়েই বাইজান্টাইনের জাহাজগুলো আসা যাওয়া করে। আবার এই প্রণালি দিয়েই প্রয়োজনীয় সাহায্য আসে ইউরোপ থেকে। তাই যুদ্ধ শুরু করার প্রথম ধাপ হিসেবে বসফরাসের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করাটা ছিল সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। আগের সুলতানদের মধ্যে সুলতান বায়েজিদ এই বিষয়টা গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করেছিলেন। তাই তিনি বসফরাসের এশীয় তীরে একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন, যেন দুর্গ থেকে প্রণালি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এটা একটা শূন্যতা পূরণ করে, কিন্তু সম্পূর্ণ পথ রুদ্ধ করতে পারেনি। কারণ, জাহাজগুলো ইউরোপের তীরঘেঁষে চলাফেরা করতে পারত। তাই দুর্গ থেকে পুরো নৌপথের কর্তৃত্ব নেওয়া যায়নি।

সুলতান ফাতিহ ভালো করে বুঝতে পেরেছিলেন, ইউরোপের তীরে আরেকটি দুর্গ নির্মাণ করা ছাড়া এই পথের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ সম্ভব না। তাই তিনি প্রথমেই খুব অল্প সময়ে আগের দুর্গের ঠিক উল্টো দিকে আরেকটি দুর্গ তৈরি করেন। এর নাম রোমেলির দুর্গ।

দুর্গ নির্মাণসহ সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের অন্যান্য তৎপরতা দেখে কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট বুঝতে পারে এই সুলতান কনস্টান্টিনোপল বিজয় করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাই সম্রাট নিজ থেকেই জিজিয়া দিয়ে সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করে নেবে বলে প্রস্তাব পেশ করে। কিন্তু দৃঢ়প্রত্যয়ী সুলতান সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। সুলতানের এই মহাসমর সম্পর্কে আলোচনা শুরুর আগে কনস্টান্টিনোপলের সেই দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন বলে মনে করি। তাহলে হয়তো বুঝতে সহজ হবে, কেন কনস্টান্টিনোপল এত বছর এত অবরোধ উপেক্ষা করে টিকে ছিল। কী কারণে এই দুর্গ এত আক্রমণের মুখেও এমন দুর্জয়-দুর্লঙ্ঘ্য।



মানচিত্র নং-২১
কনস্টান্টিনোপল নগরী

দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

প্রথমত, শহরটি ছিল তিন দিক থেকেই পানিবেষ্টিত। একদিকে মারমারা উপসাগর, একদিকে বসফরাস প্রণালি, আরেক দিকে গোল্ডেন হর্ন[৪৩] বা স্বর্ণ শিং খাড়ি। গোল্ডেন হর্নের প্রবেশমুখ আটকানো ছিল বিশাল ও ভারী এক শেকল দিয়ে। নিজেদের জাহাজ প্রবেশের সময় শেকল পানিতে

---

[৪৩]. গোল্ডেন হর্নের বর্তমান নাম কাসিমপাশা। -সম্পাদক

অনেক নামিয়ে দেওয়া হতো। আর প্রতিপক্ষের জাহাজ দেখলেই শেকল ওপরে টেনে এনে জাহাজের পথ রুদ্ধ করা হতো।

দ্বিতীয়ত, সুউচ্চ দুর্গপ্রাচীর জল-স্থলের চারদিক থেকেই শহরটি ঘিরে রেখেছিল। স্থলভাগের প্রাচীর ছিল অনেক বিশাল ও অনেক বেশি দুর্ভেদ্য।

তৃতীয়ত, গোল্ডেন হর্নের প্রবেশমুখ শেকলের পাশাপাশি সামরিক দুর্গ দিয়েও সুরক্ষিত ছিল।

যুদ্ধের বিবরণ

বাইজান্টাইন সম্রাটের জিজিয়ার প্রস্তাব সুলতান প্রত্যাখ্যান করেন। পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে সম্রাট ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে সামরিক সাহায্য চেয়ে পাঠায়। তাতে সাড়া দিয়ে তৎকালীন জেনোয়া নামের এক রাজ্য থেকে ত্রিশটি জাহাজের একটি নৌবহর কনস্টান্টিনোপল এসে পৌঁছে। জাহাজগুলো যখন আসে ততদিনে উসমানি বাহিনী কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করেছে চারদিক থেকে। তাই প্রথমেই জাহাজগুলো উসমানি নৌবহরের মুখোমুখি হয়। কিন্তু সুকৌশলে তাদের অতিক্রম করে যুদ্ধজাহাজগুলো গোল্ডেন হর্নে প্রবেশ করে। পিছু নিয়ে উসমানি জাহাজ গোল্ডেন হর্নে ঢোকার উপক্রম হতেই শেকল টেনে পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

উসমানি বাহিনীর পদাতিক সৈন্যের সংখ্যা ছিল প্রায় আড়াই লাখ। আর নৌবহরে ছিল প্রায় ১৮০টি যুদ্ধজাহাজ।

যুদ্ধের আগে সুলতান তার সেনাপতিদের জমায়েত করে বললেন—

> 'মহান আল্লাহর অনুগ্রহে যদি আমাদের হাতে এই শহরের বিজয় হয়, তাহলে জেনে রেখো আমাদের দিয়েই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবে। এটি হবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন্ত মুজিজা। আর আমরা হব সেই সৌভাগ্যবান কাফেলা, যাদের ব্যাপারে হাদিসে সুসংবাদ এসেছে। সুতরাং আমাদের সন্তানতুল্য সৈনিকদের প্রত্যেককে জানিয়ে দাও, যে মহৎ কাজে আমরা নেমেছি যদি তা অর্জিত হয় তাহলে সেটা হবে দ্বীনের জন্য পরম মর্যাদার এক ব্যাপার। আমাদের প্রত্যেক সৈনিকের জন্য জরুরি তারা যেন দ্বীনের শিক্ষাকে তাদের সামনে রাখে। কেউ যেন দ্বীনের শিক্ষার

> পরিপন্থী কোনো কাজ না করে। আর অবশ্যই বিধর্মীদের ইবাদতখানার নিরাপত্তা দেয়। সেগুলোতে আক্রমণ না করে। পাদরি পুরোহিত, নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের মধ্য হতে যারা যুদ্ধে অংশ নেয়নি, তাদের গায়ে যেন হাত না দেয়।'

যুদ্ধজয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল একসাথে চারদিক থেকে দুর্গের দেয়ালে গোলা নিক্ষেপ করা। কিন্তু গোল্ডেন হর্নের দিকটাতে পানিপথ রুদ্ধ থাকায় এই দিকটা ছিল সুরক্ষিত। অথচ এদিকের দেয়াল ছিল তুলনামূলক দুর্বল। তাই সুলতান ফাতিহ বুঝতে পারলেন যেকোনো মূল্যে গোল্ডেন হর্নে জাহাজ প্রবেশ করাতেই হবে। তখন তিনি এক বিস্ময়কর সিদ্ধান্ত নিলেন, যা ছিল কল্পনাতীত। পৃথিবীর যুদ্ধ-ইতিহাসে এমন কৌশল ও দুর্জেয় মানসিকতার দ্বিতীয় উদাহরণ নেই। তিনি বনের গাছ কেটে অসংখ্য কাঠের ফলক তৈরি করলেন। তারপর বনের ভেতর দিয়েই মাটিতে কাঠের ফলক বিছিয়ে মারমারা ও বসফরাসের কোনা থেকে গোল্ডেন হর্ন পর্যন্ত রাস্তা তৈরি করলেন। কাঠের রাস্তাকে তেল ও চর্বি মেখে পিচ্ছিল করা হলো। তারপর অনেকগুলো জাহাজ মারমারা থেকে এই পিচ্ছিল পথে উঠিয়ে টেনে নিয়ে গোল্ডেন হর্নে নামিয়ে দিলেন। এভাবে দুর্বল প্রাচীরের কাছে পৌঁছে যায় উসমানি বাহিনী।

তারপর খুব অল্প সময়ের মধ্যে দুর্গের দেয়াল ভেঙে পড়ল। ৮৫৭ হিজরি ১৫ জুমাদাল উলা মোতাবেক ১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দের এক ভোরে উসমানি বাহিনী বিজয়ীর বেশে কনস্টান্টিনোপলে প্রবেশ করে। যুদ্ধে বাইজান্টাইন সম্রাট নিহত হয়। শহরের ওপর উসমানিদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়। কনস্টান্টিনোপলেই ছিল প্রাচ্যের খ্রিষ্টানদের প্রধান গির্জা আয়া সোফিয়া। যা আবার অর্থোডক্স খ্রিষ্টানদের প্রধান কেন্দ্র, যেমন ক্যাথলিকদের জন্য রোমের ভ্যাটিকান। সুলতানের নির্দেশে আয়া সোফিয়াকে মসজিদে রূপান্তর করা হয়। হাজার বছরের খ্রিষ্টীয় গির্জা থেকে সেদিন আল্লাহু আকবারের সুর ধ্বনিত হতে থাকে। কনস্টান্টিনোপলের নাম বদলে রাখা হয় 'ইসলাম বুল' (ইস্তাম্বুল) বা ইসলামের শহর। তখন থেকেই চূড়ান্ত পতনের দিন পর্যন্ত ইস্তাম্বুলই ছিল উসমানি সাম্রাজ্যের রাজধানী। সুলতান ফাতিহের এই মহাবিজয়ের মাধ্যমে সুপ্রাচীন বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সর্বশেষ চিহ্নটুকুও মুছে যায়। শেষ হয় ইসলামের প্রাচীনতম দুশমন বাইজান্টাইনদের সাথে ৮০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলতে থাকা

সংঘর্ষ। (বাইজান্টাইন হলো পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য, এটিই কুরআনে বর্ণিত রোম, সেই হিরাক্লার রোম, 'রোম-পারস্য' কিংবদন্তির রোম)।

নগরের সকল খ্রিষ্টানদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হলো। শহরের অর্ধেক গির্জা কিনে মসজিদ বানানো হলো আর বাকি অর্ধেক খ্রিষ্টানদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হলো। (অথচ যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত অঞ্চলে বিজেতা শক্তি যেকোনো দালানের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে, কেনার প্রয়োজন হয় না।)

অবরোধ চলাকালেই নগরপ্রাচীরের বাইরে মহান সাহাবি আবু আইয়ুব আনসারি রা.-এর কবর উদ্ধার হয়। এই মহান সাহাবি ইয়াজিদ বিন মুআবিয়ার আমলে শহরটি অবরোধ করতে এসে এখানেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। অসিয়ত অনুযায়ী তাকে প্রাচীরের কাছে কবর দেওয়া হয়েছিল। নগর বিজয়ের পর এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। পরবর্তী সুলতানদের এই মসজিদেই অভিষেক কার্যক্রম সম্পন্ন হতো। এখানে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গাজি উসমান আর্তুগ্রুলের তরবারি গ্রহণ করার মাধ্যমে নতুন সুলতান দায়িত্ব বুঝে নিতেন।

সুলতান ফাতিহের ইউরোপ অভিযান

ইস্তাম্বুল বিজয়ের পর, নগরের যুদ্ধবিধ্বস্ত প্রাচীরগুলো দ্রুত মেরামত করা হয়। তারপরই সুলতান ঝাঁপিয়ে পড়েন তার বিজয় অভিযান সম্পূর্ণ করতে।

সার্বিয়ার চূড়ান্ত বিজয়

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, সবসময় সুলতানগণ সার্বিয়াকে পরাজিত করেও তা পুরোপুরি দখল না করে জিজিয়ার বিনিময়ে শাসকদের বহাল রাখতেন। কিন্তু তারা এর মর্যাদা রক্ষা করতে পারেনি। যখনই সুযোগ পেয়েছে তখনই উসমানিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। জিজিয়া দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। উসমানিরা আবার নতুন করে সেখানে অভিযান চালিয়েছে। এসব কারণে সুলতান ফাতিহ চাইলেন সার্বিয়াকে স্থায়ীভাবে উসমানি প্রদেশে পরিণত করতে। এই লক্ষ্যে অভিযান চালিয়ে ৮৫৮ হিজরিতে (১৪৫৪ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি সার্বিয়া দখল করে নিলেন। কিন্তু রাজধানী বেলগ্রেড জয় করা গেল না। কারণ, হাঙ্গেরির রাজা সে সময় যুদ্ধে যোগ দিয়ে বেলগ্রেড প্রতিরক্ষাকে মজবুত করে তোলে। যাইহোক,

এই অভিযানে রাজধানী ছাড়া সমগ্র সার্বিয়া স্থায়ীভাবে উসমানি প্রদেশে পরিণত হয়। উসমানিরা হাঙ্গেরির রাজাকে আহত করতে সক্ষম হয়। এই আঘাতেই বিশদিন পর তার মৃত্যু ঘটে।

মুরা বিজয় (দক্ষিণ গ্রিস)

সুলতান ফাতিহ ৮৬৩ হিজরিতে (১৪৫৯ খ্রিষ্টাব্দে) মুরা জয় করেন। সেই সাথে গ্রিস উপকূলের বিখ্যাত এজিয়ান সাগরের অধিকাংশ অঞ্চল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন।

ওয়ালাচিয়া বিজয় (বর্তমান রোমানিয়ার একাংশ)

কয়েকজন উসমানি বণিক ওয়ালাচিয়ায় বাণিজ্য করতে গিয়ে সেখানকার শাসকের নির্যাতনের শিকার হয়। সুলতান ফাতিহের কাছে সে সংবাদ পৌঁছলে তিনি ওয়ালাচিয়ায় অভিযান চালানোর প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। সুলতানের প্রস্তুতির খবর পেয়ে ওয়ালাচিয়ার রাজা বার্ষিক দশ হাজার দিরহাম জিজিয়ার বিনিময়ে সন্ধির প্রস্তাব পাঠায়। কিন্তু তার সব আচরণে বোঝা যাচ্ছিল, মূলত উসমানিদের সাথে লড়াইয়ের জন্য হাঙ্গেরির সাথে যোগাযোগ করতে সময় ক্ষেপণ করাই ছিল জিজিয়ার প্রস্তাব দেওয়ার উদ্দেশ্য। সুলতান বিষয়টি নিশ্চিত হতে দুজন দূত প্রেরণ করেন। ওয়ালাচিয়ার রাজা সে দূতদের হত্যা করে ফেলে। শুধু এতটুকুই না। উসমানিদের অধীনে থাকা বুলগেরিয়া রাজ্যে আক্রমণও করে। বুলগেরিয়ায় তারা লুটতরাজ ও গণহত্যা চালায়। ২৫ হাজার বন্দি সাথে নিয়ে নিজ দেশে ফিরে যায়। বন্দিদের কথা চিন্তা করে সুলতান একদল প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। বন্দি ফিরিয়ে দিয়ে উসমানিদের অধীনতা মেনে নিতে আহ্বান জানান। রাজা এবারও চরম ধৃষ্টতা দেখায়। প্রতিনিধি দলকে নির্দেশ দেয় রাজার সম্মানে মাথার পাগড়ি খুলতে। কিন্তু তারা তাতে অস্বীকৃতি জানায়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে রাজা লোহার পিন দিয়ে পাগড়ি তাদের মাথার সাথে স্থায়ীভাবে লাগিয়ে দিতে নির্দেশ দেয়।

সবকিছু শুনে সুলতান দেড় লাখ সৈনিকের বহর নিয়ে ওয়ালাচিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। রাজা তখন ভীষণ পর্যুদস্ত হয়ে হাঙ্গেরিতে পালিয়ে যায়। যাওয়ার সময় ২৫ হাজার বন্দিকে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ কেটে হত্যা করে। রাজধানী বুখারেস্টের চারপাশ মৃতদেহে পূর্ণ হয়ে যায়। এই অভিযানের মধ্য দিয়ে রোমানিয়া উসমানি প্রদেশে পরিণত হয়।

বসনিয়া বিজয় এবং দলে দলে বসনিয়ান নাগরিকের ইসলাম গ্রহণ

বসনিয়ার শাসক উসমানিদের প্রস্তাব অনুযায়ী জিজিয়া দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তাই সুলতান অভিযান চালিয়ে ৮৬৬ হিজরিতে (১৪৬২ খ্রিষ্টাব্দে) বসনিয়া দখল করে নেন। হাঙ্গেরির রাজা মেট্রিয়াস বসনিয়াকে উসমানিদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য একবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। বসনিয়া বিজিত হয়ে উসমানি সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ার সাথে সাথেই তারা দলে দলে মুসলমান হতে শুরু করে। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও ইসলাম গ্রহণ করে। ত্রিশ হাজার বসনিয়ান যুবক উসমানি সেনাবাহিনীতে যোগদান করে।

ইসকানদার বেগের পুনরায় বিদ্রোহের চেষ্টা

ইউরোপজুড়ে উসমানিদের বিজয়াভিযানের পর, বিশেষত কনস্টান্টিনোপল পতনের পর খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় গুরু পোপ ক্রুসেডের ডাক দেয়। কিন্তু বাস্তবায়নের আগেই পোপের মৃত্যু হয়ে যায়। ফলে ক্রুসেডও স্তিমিত হয়ে যায়। এদিকে পোপের উৎসাহে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয় আলবেনিয়ার রাজা ইসকানদার (মুরাদের হাত থেকে পালিয়ে আসা রাজপুত্র)। ক্রুসেড থেমে গেলেও তার আগ্রহে ভাটা পড়ল না। সে আর ক্রুসেডের অপেক্ষা না করে একাই উসমানিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। বেশ কয়েকটি যুদ্ধ হয়। দুই পক্ষই সমানে সমান যুদ্ধ করে। ৮৭১ হিজরিতে (১৪৬৭ খ্রিষ্টাব্দে) ইসকানদার মারা যায়। তার মৃত্যুর পর আলবেনিয়া সুলতান ফাতিহের অধীনে চলে আসে।

ক্রিমিয়া অঞ্চলে আধিপত্য ও মোলদাভিয়া অভিযানে ব্যর্থতা

সুলতান ফাতিহ ৮৭৮ হিজরিতে (১৪৭৩ খ্রিষ্টাব্দে) মোলদাভিয়ার শাসক চতুর্থ স্টিফেনকে বশ্যতা স্বীকার করে জিজিয়া দিতে আহ্বান জানান। সে তা অস্বীকার করলে উসমানি বাহিনী আক্রমণ করে তার ওপর জয়লাভ করে। কিন্তু সমস্ত অঞ্চল উসমানিরা জয় করতে সক্ষম হয়নি। এ সময় সুলতান ক্রিমিয়া উপদ্বীপে অভিযান চালিয়ে তথাকার ঘোড়সওয়ার দিয়ে মোলদাভিয়া জয়ের চিন্তা করেন। ক্রিমিয়া উপদ্বীপ দখলকারী জেনোভার সৈনিকদের তাড়িয়ে দেয় উসমানি বাহিনী। ক্রিমিয়া উপদ্বীপের মুসলিম তাতারদের সাথে বাৎসরিক খারাজ প্রদানের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ক্রিমিয়া উপদ্বীপ থেকে উসমানি নৌবাহিনী দানিয়ুব নদীর মোহনায় যাত্রা করে মোলদাভিয়া পৌঁছে। সেখানকার সৈন্যরা রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে বনের মধ্যে প্রবেশ করে। উদ্দেশ্য ছিল সুলতানের বাহিনী পিছু নিয়ে বনে প্রবেশ করলে সেখানে তাদের সুবিধামতো হত্যা করা। এই কৌশলে তারা সফল হয়েছিল। ৮৮১ হিজরির (১৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে) এই যুদ্ধে সুলতানের বাহিনী পর্যুদস্ত হয়। এই সাহসিকতার জন্য স্টিফেনের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপজুড়ে। পোপ তাকে খ্রিষ্টজগতের সাহসী পুরুষ ও খ্রিষ্টধর্মের পৃষ্ঠপোষক উপাধি দেয়।

ভেনিসের লড়াই

সুলতান ফাতিহ ৮৮২ হিজরিতে (১৪৭৭ খ্রিষ্টাব্দে) ভেনিসে অভিযান চালান। এই অভিযানে তিনি জয় করেন ক্রোয়েশিয়া ও তৎকালীন ডালমেসিয়া নামের রাজ্য (মন্টেনিগ্রো, আলবেনিয়ার কিছু ও ক্রোয়েশিয়ার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত)। এরপর স্কোদার শহরটিও জয় করে নেন। এতে ৮৮৭ হিজরিতে (১৪৮২ খ্রিষ্টাব্দে) ভেনিস সুলতানের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হয়।

ট্রান্সসিলভানিয়া (প্রাচীন পশ্চিম রোমানিয়া) রাজ্যের পরাজয়

উসমানি বাহিনী হাঙ্গেরির অধীনস্থ ট্রান্সসিলভানিয়ার দিকে অভিযান চালায়। সে অভিযানে উসমানি বাহিনী ভীষণভাবে পর্যুদস্ত হয়। অনেক সৈন্য নিহত হয়। হাঙ্গেরির রাজা উসমানি সৈনিকদের সাথে পাশবিক আচরণ করে। সমস্ত বন্দিকে হত্যা করা হয় এবং মুসলিম সৈনিকদের লাশের ওপর নিজ বাহিনীর খাবারের পাত্র পরিবেশন করে।

ইতালি জয়ের প্রচেষ্টা

সুলতান সবসময়ই ইতালি জয় করে রোম ও ভ্যাটিকানে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করার চিন্তা করতেন। কনস্টান্টিনোপল জয়ের কারণে এই চিন্তা তার মধ্যে অনেক বেশি কাজ করত। কারণ, হাদিসে কনস্টান্টিনোপল জয়ের পর রোম বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। তাই তিনি কসম করে বলতেন রোমের পিটার্স গির্জা তথা ভ্যাটিকানে অচিরেই তিনি দুর্গ স্থাপন করবেন।

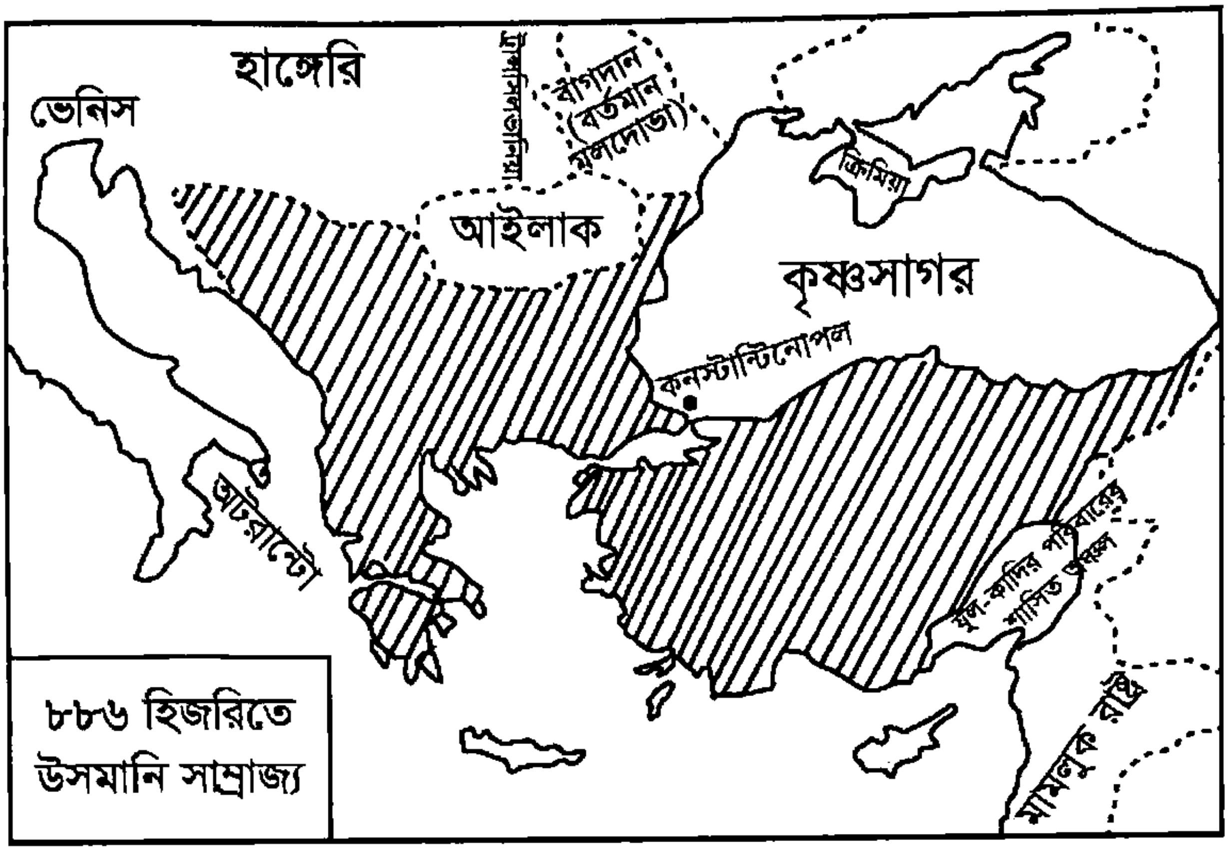
ইতালি অভিযানের প্রস্তুতি হিসেবে তিনি দ্বীপরাষ্ট্র রোডস অভিযানের পরিকল্পনা করেন। রোডস ছিল সেন্ট ইউহান্নার শাসিত এলাকা। উসমানি

নৌবাহিনী রোডস জয় করতে ব্যর্থ হয়ে ৮৮৫ হিজরিতে (১৪৮০ খ্রিষ্টাব্দে) তাদের সঙ্গে সন্ধি করে নেয়। রোডস ত্যাগ করে সুলতান ফাতিহ ইতালির দিকে রোখ করেন। ইতালির উপকূলীয় অঞ্চলে নেমে ৮৮৫ হিজরিতেই (১৪৮০ খ্রিষ্টাব্দে) অটারেন্ট শহর দখল করে নেন। পরের বছর চূড়ান্ত বিজয়ের লক্ষ্যে একটি বৃহৎ আক্রমণ চালানোর প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেন। কিন্তু এ বছরই তার ইনতেকাল হয়ে যায়। তার ইনতেকালের পর উসমানি বাহিনী ইতালি অভিযানের ইচ্ছা ত্যাগ করে। পরবর্তী সুলতান অর্থাৎ দ্বিতীয় বায়েজিদ অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় হিসেবে পরিচিত। তিনি অটারেন্ট থেকেও সব সৈন্য প্রত্যাহার করে নেন।

আনাতোলিয়াতে সুলতান ফাতিহের কার্যক্রম

সুলতান ফাতিহের সব বিজয় ছিল ইউরোপে। এশিয়ার মুসলিম শাসিত অঞ্চলগুলোর দিকে তিনি তেমন নজর দেননি। এখানে তার উল্লেখযোগ্য অভিযান ছিল হাতেগোনা। তিনি আনাতোলিয়ার সর্বশেষ খ্রিষ্টান রাজ্য ট্রাবজোন জয় করে নেন। এই রাজ্য জয়ের মাধ্যমে সমগ্র আনাতোলিয়া ক্রুসেডারদের থেকে মুক্তিলাভ করে। কিরমান রাজ্যকেও চূড়ান্তভাবে উসমানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন সুলতান ফাতিহ।

৮৭৪ হিজরিতে (১৪৬৯ খ্রিষ্টাব্দে) তৈমুর লংয়ের উত্তরসূরিদের একটি বাহিনী পূর্ব আনাতোলিয়ায় আওজুন রাজ্য আক্রমণ করে। সুলতান তার বাহিনী প্রেরণ করে তাদের দমন করেন।



মানচিত্র নং-২২
মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের বিজয়াভিযানের
পর সম্প্রসারিত উসমানি সাম্রাজ্য

গাজি মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ ৪ রবিউল আওয়াল ৮৮৬ হিজরিতে (১৪৮১ খ্রিষ্টাব্দে) ইনতেকাল করেন। এই মহান সুলতান জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য উৎসর্গিতপ্রাণ ছিলেন। একের পর এক রাজ্য জয় করেছিলেন। এজন্য তার উপাধি হয়ে যায় আল-ফাতিহ বা বিজেতা। সর্বশেষ তিনি ইউরোপের প্রাণকেন্দ্র ইতালি জয় করারও প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন। আল্লাহ তাকে মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দিন।

সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদ

(৮৮৬-৯১৮ হি./১৪৮১-১৫১২ খ্রি.)

সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদ, তার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ যে, তিনি খুব শান্তিপ্রিয় ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করতে না করতেই তার ভাই সেম বিদ্রোহ করে বসে। বিদ্রোহী ভাইয়ের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে সুলতানকে বেশ বেগ পেতে হয়। এমনকি কুলাতে না পেরে তিনি একবার পালিয়ে মিশর আশ্রয় নিয়েছিলেন।

অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় ছিলেন বলে একান্ত বাধ্য না হলে তিনি যুদ্ধও করতেন না। তবে তার সময়ে উসমানি নৌবাহিনীর প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। উসমানিদের নৌশক্তি ইউরোপকে চোখ রাঙাতে থাকে। কিছুদিনের মধ্যেই ভেনিসের নৌবাহিনীর সাথে তুমুল সংঘর্ষ হয় এবং সেখানে উসমানি নৌবাহিনীর বিজয় হয়। সে সময়ে ইউরোপজুড়ে অস্থির রাজনীতি চলছিল। ইউরোপীয় রেনেসাঁস দরজায় কড়া নাড়ছিল। যার সূচনা হয় স্পেনের শেষ মুসলিম রাজ্য গ্রানাডার পতনের মাধ্যমে। এই পরাজয় ছিল মুসলিমদের অনৈক্য ও পারস্পরিক দ্বন্দ্বের অবধারিত ফল। বায়েজিদের সময়েই রাশিয়ার উত্থান হয়। রাশিয়ার উত্থানে নেতৃত্ব দেয় ইভান রাহিব তৃতীয়। তাতার মুসলিমদের হাত থেকে মস্কো দখল করে নিয়ে নানা পাশবিক কাণ্ড করে ক্ষমতা দখল করে। সুলতানের কাছে প্রথম আনুষ্ঠানিক রাশিয়ান দূত আসে ৮৯৭ হিজরিতে (১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে)। দ্বিতীয় বায়েজিদের সময় মোলদাভিয়া উসমানি অধীনতা স্বীকার করে নেয় এবং জিজিয়া দিতে সম্মত হয়।

প্রথম সেলিমের ক্ষমতা গ্রহণ

উসমানি বিশেষায়িত বাহিনী জেনিসারির সদস্যরা সুলতানকে তার ভীরু স্বভাব ও দুর্বলতার কারণে পছন্দ করত না। তাদের পছন্দ ছিল সুলতানের কনিষ্ঠ পুত্র সেলিম (প্রথম)। কারণ, সে ছিল বীরত্ব ও সামরিক বিচক্ষণতার অধিকারী। সেলিম সে সময় ট্রাবজোনের শাসক ছিল। আর সেলিমপুত্র সুলাইমান ছিল ক্রিমিয়ার রাজধানী কাফার শাসক। সেলিম তার পুত্রের কাছে গিয়ে বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। তারপর বাহিনী গঠন করে ইউরোপের উদ্দেশ্যে রওনা দিলো বায়েজিদকে ক্ষমতাচ্যুত

করতে। সুলতান বায়েজিদ প্রথমে পুত্র সেলিমকে হত্যার হুমকি দিতে চাইলেন। পরে এই চিন্তা ত্যাগ করে সেলিমের হাতে ইউরোপের কিছু এলাকার শাসনভার ছেড়ে দিলেন।

সময়টা ছিল ৯১৬ হিজরি (১৫১০ খ্রিষ্টাব্দ)। সেলিম এতটুকুতে তৃপ্ত হলো না। দ্রুত প্রাক্তন রাজধানী এডির্নের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিজেকে সুলতান ঘোষণা করল। এবার আর সুলতানি বাহিনীর আক্রমণে সেলিম টিকতে পারল না। পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল ক্রিমিয়ায়। সুলতান তাকে ক্ষমা করে আবার ইউরোপের ক্ষমতায় বসালেন। কিন্তু সেলিম শান্ত হলো না। জেনিসারিদের নিয়ে ইস্তাম্বুল দখল করল। পিতাকে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য করল। তবে এরপর সেলিমের রাজত্ব খুব বেশি দীর্ঘ হয়নি।

উসমানি সাম্রাজ্য থেকে উসমানি খিলাফত

খলিফা প্রথম সেলিম
(৯১৮-৯২৬ হি./১৫১২-১৫২০ খ্রি.)

মুসলিমবিশ্বকে একীভূত করার প্রতি মনোনিবেশ

সেলিম অত্যন্ত ক্ষমতাধর ও সামরিক মননশীল খলিফা ছিলেন কী। তিনি সকল ইসলামি দেশকে একীভূত করার ইচ্ছা পোষণ করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল, স্পেনে মুসলমানদের পরাজয়ের পর ক্রুসেডারগণ ইউরোপ ও অন্যান্য দেশকে নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে ক্রুসেডীয় জোট গঠন করেছে, তার বিপক্ষে মুসলিমদের একক শক্তি গড়ে তোলা।

পর্তুগিজরা ইসলামি সাম্রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলের কিছু জায়গা দখল করে নেয়। তারা মদিনায় পৌঁছার কৌশল খুঁজছিল। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ মুবারক চুরি করা এবং বাইতুল মুকাদ্দাস নিয়ে মুসলমানদের সাথে দরকষাকষি করা। একই সময় শিয়া সাফাভিগণ পূর্বাঞ্চলে সুন্নি মুসলমানদের ওপর জুলুম-নির্যাতন শুরু করে। তারা শিয়া মতবাদ গ্রহণ করতে জোরজবরদস্তি শুরু করে। এমনকি সুন্নি মুসলমান ও উসমানি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তারা ইসলামের শত্রু পর্তুগিজদের সাথে জোট গঠন করে। যার কারণে প্রথম সেলিম মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে আরও বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

শিয়া সাফাভিদের রাষ্ট্রে অভিযান : চালদিরানের যুদ্ধ

খলিফা প্রথম সেলিম সময় নষ্ট না করে সাফাভিদের বিরুদ্ধে অভিযানের প্রস্তুতি নেন। তিনি পথিমধ্যে উসমানি সাম্রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে বসবাসকারী শিয়াদের পক্ষ হতে বাধার সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা করেন। তাই তিনি সীমান্তবর্তী শিয়াদের হত্যার আদেশ দেন। অতঃপর তিনি

সাফাভিদের রাজধানী তাবরিজের[88] উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সাফাভি বাহিনী উসমানি সৈন্যদের আটকিয়ে ফেলার কৌশল গ্রহণ করে। যেমন, তারা মুখোমুখি হওয়ার পর পালাবে। তখন তাদের পিছু নিতে গিয়ে সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে পড়বে। আর তখনই তারা পেছন থেকে তাদের ওপর আক্রমণ করবে।

অতঃপর ৯২০ সনে (১৫১৪ খ্রিষ্টাব্দে) আনাতোলিয়ার পূর্বাঞ্চলে চালদিরানে উভয় বাহিনী সংঘর্ষে জড়ায় এবং উসমানিরা বিজয় লাভ করে। দশদিন পর খলিফা প্রথম সেলিম তাবরিজে প্রবেশ করে অর্থভান্ডারের কর্তৃত্ব বুঝে নেন। এদিকে শীতের মৌসুম শুরু হয়ে যায়। তার বাহিনী যুদ্ধ করার সাহস হারিয়ে ফেলে। শীত শেষ হওয়া পর্যন্ত খলিফা অপেক্ষা করতে থাকেন। শীতের শেষে তিনি পুনরায় সাফাভি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযানে বের হন এবং আজারবাইজানের কিছু দুর্গ দখলে নেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর যে সকল অফিসার শীতে অভিযানে যেতে রাজি হয়নি, তাদেরকে ডেকে হত্যা করেন। যেন পরবর্তী সময়ে আর কোনো জওয়ান আদেশ অমান্য করার সাহস না করে।

মামলুকদের বিরুদ্ধে অভিযান

সাফাভিদের বিরুদ্ধে অভিযান শেষ করে খলিফা দুর্বল মামলুক শাসকদের বিরুদ্ধে অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। মামলুক সাম্রাজ্য ও উসমানি সাম্রাজ্যের বিভক্তকারী সীমানায় জুলকাদেরের রাজ্য অবস্থিত। এ রাজ্যকে ঘিরে দুদেশের মাঝে চরম উত্তেজনা বিরাজমান থাকত।

মারজদাবেক[8৫] যুদ্ধ

(৯২২ হি./১৫১৬ খ্রি.)

খলিফা প্রথম সেলিম মামলুকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সিরিয়ার শাসকদেরকে তার পক্ষে নিতে সক্ষম হন। তিনি তাদেরকে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি দেন যে, মামলুকদের বিপক্ষে বিজয় লাভ করতে পারলে তিনি শাসকদেরকে স্ব স্ব পদে বহাল রাখবেন। উসমানিদের প্রতিহত করতে প্রস্তুত মামলুক

---

88. **তাবরিজ :** ইরানের অন্তর্গত একটি শহর। সাফাভিদের সাম্রাজ্য প্রধানত ইরান এবং ইরাক অঞ্চলজুড়ে বিস্তৃত ছিল। -সম্পাদক

8৫. **মারাজ দাবেক :** সিরিয়ার আলেপ্পোর নিকটবর্তী একটি স্থান। -সম্পাদক

বাহিনীর বিরূদ্ধে যুদ্ধ করতে খলিফা বেরিয়ে পড়েন এবং ৯২২ হিজরিতে মারজদাবেক নামক স্থানে যুদ্ধ শুরু করেন। যুদ্ধ তীব্র রূপ ধারণের একপর্যায়ে গভর্নরগণ মামলুক খলিফার পক্ষ ত্যাগ করে সৈন্যদেরকে নিয়ে উসমানি বাহিনীর সাথে যোগ দেন। ফলে মামলুকগণ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পরাজয় বরণ করে। মামলুক সুলতান কানসুহ ঘুরি যুদ্ধে নিহত হয়। অতঃপর মামলুকদের শাসনাধীন সিরিয়া প্রথম সেলিমের কর্তৃত্বে চলে আসে। সিরিয়া ছিল পুরো মামলুক রাষ্ট্রের অর্ধেক পরিমাণ। মামলুকদের পরাজয়ের ফলে সম্পূর্ণ আনাতোলিয়া উসমানি খিলাফতের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

রাইদানিয়ার যুদ্ধ

(৯২৩ হি./১৫১৭ খ্রি.)

সুলতান তোমান বাই কানসুহ ঘুরির স্থলাভিষিক্ত হয়। সুলতান প্রথম সেলিম উসমানিদের নেতৃত্ব মেনে নিতে তার নিকট প্রস্তাব করেন এবং বার্ষিক খাজনা প্রদানের স্বীকৃতি চান। কিন্তু তোমান বাই এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। সুলতান সেলিম তার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি তাকে দক্ষিণ সিরিয়ায় পরাস্ত করে কায়রো পর্যন্ত পৌঁছে যান। এখানে রাইদানিয়া নামক স্থানে দু-পক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। মামলুকগণ মরণপণ যুদ্ধ করা সত্ত্বেও উসমানিরা বিজয় লাভ করে। তোমান বাই তার জনৈক অনুসারীর ষড়যন্ত্রে উসমানিদের হাতে ধরা পড়ে এবং বাবে জুয়াইলা নামক স্থানে তাকে হত্যা করা হয়।

উসমানিদের খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ

মামলুক রাষ্ট্রের পতনের পর সর্বশেষ আব্বাসীয় শাসক মুহাম্মাদ মুতাওয়াক্কিল প্রথম সেলিমের নিকট খিলাফত হস্তান্তর করে সরে দাঁড়ান। তিনি মামলুক যুগের অপরাপর খলিফাদের ন্যায় ক্ষমতাহীন ছিলেন। এই খিলাফাহ ছিল প্রতীকি খিলাফাহ। মূল চালিকাশক্তি ছিল মামলুকদের হাতেই। তার ক্ষমতা ত্যাগের পর প্রথম সেলিম প্রথম উসমানি খলিফা হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। তিনি খিলাফতের কেন্দ্র কায়রো থেকে ইস্তাম্বুলে স্থানান্তর করেন । ৯২৬ হিজরিতে সুলতান প্রথম সেলিম মৃত্যুবরণ করেন।

খলিফা প্রথম সুলাইমান

(৯২৬-৯৭৪ হি./১৫২০-১৫৬৬ খ্রি.)

প্রথম সুলাইমানের খিলাফতের যুগে উসমানি সাম্রাজ্য ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে এবং তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্রে পরিণত হয়। রাষ্ট্রের সকল শাখায় অভ্যন্তরীণ শাসনরীতি ও আইনকানুন চালু করে তিনি সুলাইমান কানুনি বা আইনপ্রণেতা সুলাইমান নামে খ্যাতি লাভ করেন। খলিফা মুহাম্মাদ ফাতিহ আলেম-উলামা ও শিক্ষকদের জন্য যে সকল নিয়মনীতি চালু করেছিলেন, প্রথম সুলাইমান তাতে কিছুটা পরিবর্তন নিয়ে আসেন। তিনি মুফতি পদটিকে সর্বাপেক্ষা মর্যাদাপূর্ণ পদ হিসেবে ঘোষণা করেন। তিনি জেনিসারিদের (বিশেষ বাহিনী) মাঝে শৃঙ্খলা তৈরি করেন। আর এ সবকিছুই ছিল ইসলামি শরিয়া মোতাবেক। মানবরচিত আইনকানুনের ভিত্তিতে করা হয়েছিল এমনটি ভাবার সুযোগ নেই।

ইসলামি দেশসমূহে উসমানিদের কার্যক্রম

সিরীয় শাসকশ্রেণির বিদ্রোহ

জানবার্দি গাজালি প্রথম সেলিমের মৃত্যুর সংবাদ শোনার সাথে সাথে বিদ্রোহ করে বসে। এমনকি মিশরের শাসককে তার পদাঙ্ক অনুসরণের প্রস্তাব দেয়। মিশরের শাসক সম্মতি প্রকাশ করে তাকে আটকিয়ে ফেলেন। তিনি সিরীয় শাসকের প্রস্তাবের কথা খলিফা সুলাইমানের নিকট ফাঁস করে দেন। এদিকে সিরীয় শাসক হালাব তথা আলেপ্পো অবরোধের মাধ্যমে তার বিদ্রোহ শুরু করে। উসমানি বাহিনী আলেপ্পো পৌঁছালে সে পিছু হটে যায়। অবশেষে দামেশকে ঘাঁটি তৈরি করে উসমানিদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং পরাজয় বরণ করে। অচেনা বেশে পলায়নকালে তার জনৈক সমর্থক তাকে আটক করে উসমানিদের হাতে তুলে দিলে উসমানি বাহিনী তাকে হত্যা করে।

পারস্যে (সাফাভি শিয়াদের রাষ্ট্রে) তাদের কার্যক্রম

৯৪১ হিজরিতে (১৫৩৪ খ্রিষ্টাব্দে) উসমানিরা দ্বিতীয়বারের মতো তাবরিজে প্রবেশ করে। সেখান থেকে বাগদাদ যাত্রা করে এবং বাগদাদকে

উসমানি খিলাফতের অধীনে নিয়ে নেয়। ৯৫৪ হিজরিতে (১৫৪৭ খ্রিষ্টাব্দে) শাহ সাফাভির ভাই তার বিরুদ্ধে সুলতান সুলাইমানের নিকট সাহায্য চায়। উসমানিরা তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে তৃতীয়বারের মতো তাবরিজে প্রবেশ করে।

আরব দেশে

স্পেন ও পর্তুগিজ ক্রুসেডারদের ক্রোধের আগুন মুসলমানদের ওপর ছড়িয়ে পড়ে। তারা স্পেনের সর্বশেষ মুসলিম ঘাঁটি দখলে নেওয়ার পর মুসলমানদেরকে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, মুসলমানগণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করার পাশাপাশি ধর্মীয় রীতিনীতি চর্চা করতে পারবে। কিন্তু তারা অল্পসময়ের মধ্যে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং স্পেনের মুসলমানদেরকে খ্রিষ্টান বানানোর জঘন্য প্রক্রিয়া শুরু করে। এজন্য দাস বানানো, অপমানজনক আচরণ, বিতাড়ন ও জাতিগত নির্মূলের মতো ঘৃণ্যকর পন্থা গ্রহণ করে, যা কাগজে-কলমে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এর ফলে স্পেনের মুসলিমগণ মুখ থুবড়ে পড়ে। তাদের এক শ্রেণিকে ধ্বংস করা হয়, এক শ্রেণি খ্রিষ্টান সমাজের সাথে মিশে যায় এবং অপর এক শ্রেণি ঈমান বাঁচাতে মুসলিম দেশসমূহে পাড়ি জমায়।

স্পেনিশ ও পর্তুগিজরা স্পেন দখল করেই নিভৃত হয়নি; বরং এখানে তাদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত হওয়ার পর অন্যান্য মুসলিম দেশে অনুরূপ ট্রাজেডি তৈরি করার অভিপ্রায় নিয়ে তারা অভিযান শুরু করে। এ অভিযানের মধ্য দিয়ে তারা উত্তর আফ্রিকার ত্রিপোলি, আলজেরিয়া, বিজার্ট, ওরান ইত্যাদি কেন্দ্রীয় স্থানসমূহ দখল করে নেয়। উসমানিরা স্পেনের হাত থেকে উত্তর আফ্রিকাকে মুক্ত করে স্পেন অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করার সংকল্প গ্রহণ করে।

নাবিক খাইরুদ্দিন বারবারোসা ও তার ভাই আরুজ

সুলতান প্রথম সেলিমের যুগে জনৈক নাবিকের প্রকাশ ঘটে। ইসলামের ইতিহাসে তার উজ্জ্বল অধ্যায় রয়েছে। তার নাম নাবিক খাইরুদ্দিন বারবারোসা। তিনি এজিয়ান সমুদ্র দ্বীপপুঞ্জে জলদস্যুতা করতেন এবং খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী ছিলেন। তিনি ও তার ভাই আরুজ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজেদেরকে ইসলামের সেবায় উৎসর্গ করেন। খ্রিষ্টান জলদস্যুরা মুসলিমদের জাহাজ থামিয়ে যাত্রীদের দাস বানিয়ে নিত। তারা

জাহাজের মালামাল লুণ্ঠন করত। তারা দুজন তাদের অপকর্মের প্রতিশোধ নিতেন। তারাও অনুরূপভাবে খ্রিষ্টানদের জাহাজ আটকিয়ে যাত্রীদের দাস হিসেবে বিক্রয় করে দিতেন। একদা তারা খ্রিষ্টানদের নিকট হতে জব্দকৃত একটি জাহাজ সুলতান প্রথম সেলিমের নিকট উপঢৌকন হিসেবে প্রেরণ করেন। খলিফা তাদের উপহার গ্রহণ করেন। তারা দুই ভাই উসমানিদের আনুগত্য ও সেবা করার কথা ঘোষণা করেন।

আলজেরিয়াকে উসমানি সাম্রাজ্যের সাথে যুক্তকরণ

দুই ভাই আফ্রিকা উপকূলকে ক্রুসেডারমুক্ত করতে বেরিয়ে পড়েন। আরুজ বারবারোসা প্রথমে আলজেরিয়া এবং টেলেমসেন শহর দুটি মুক্ত করেন। অতঃপর সুলতান প্রথম সেলিম খাইরুদ্দিনকে আলজেরিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করেন। ফলে আলজেরিয়া উসমানি রাষ্ট্রের সাথে একীভূত হয়।

পশ্চিম ত্রিপোলিকে (লিবিয়া) যুক্তকরণ

স্পেন ত্রিপোলি দখল করার পর সেখানকার মুসলিম অধিবাসীগণ খলিফার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। খলিফা তাদের সাহায্যে মুরাদ আগার নেতৃত্বে ৯২৬ হিজরিতে (১৫২০ খ্রিষ্টাব্দে) একটি ক্ষুদ্র নৌবাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু মুরাদ ত্রিপোলি মুক্ত করতে ব্যর্থ হন। অতঃপর খলিফা তুরগুল বেকের নেতৃত্বে উসমানি নৌবহর প্রেরণ করেন। তুরগুল স্পেনিশদের বিতাড়িত করে ত্রিপোলি মুক্ত করেন। এভাবে বিভিন্ন মুসলিম শহর স্পেনের দখল হতে মুক্ত হতে থাকে। মুসলিম বাহিনী বাজার্ট[৪৬], ওরান[৪৭], গাজামুয়ুরাকা (এটি দক্ষিণ-পূর্ব স্পেনের বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জের একটি দ্বীপ) ও কোর্সিকা[৪৮] মুক্ত করার মধ্য দিয়ে পশ্চিম ত্রিপোলিকে (লিবিয়া) উসমানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

তিউনিসিয়ায় উসমানিদের কার্যক্রম

খলিফা সুলাইমান নাবিক খাইরুদ্দিনকে ডেকে পাঠান এবং তাকে রাজা হাফসির নিকট থেকে তিউনিসিয়াকে মুক্ত করার প্রস্তুতি নিতে আদেশ

---

[৪৬]. **বাজার্ট :** তিউনিসিয়ার অন্তর্গত একটি শহর। -সম্পাদক

[৪৭]. **ওরান :** আলজেরিয়ার অন্তর্গত একটি শহর। -সম্পাদক

[৪৮]. **কোর্সিকা :** ভূমধ্যসাগরের অন্তর্গত একটি দ্বীপ। যা বর্তমানে ফ্রান্সের অধিভুক্ত একটি অঞ্চল। -সম্পাদক

দেন। চরম ইসলামবিদ্বেষী ফ্রান্সের রাজা শার্লকানের সাথে হাফসি গোপন সম্পর্ক বজায় রাখে। তার এ গোপন সম্পর্কের কথা ফাঁস হয়ে যায়। অতঃপর খাইরুদ্দিন তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি বিরাট নৌবহর প্রস্তুত করেন। অতঃপর তিনি দার্দানেলিস প্রণালি ধরে তিউনিসিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি মাল্টা ও ইতালির দক্ষিণাঞ্চলে আক্রমণ করেন, যেন কেউ তার মূল টার্গেট বুঝতে না পারে। তারপর তিনি খুব সহজে তিউনিসিয়া আক্রমণ করেন এবং সুলতানকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। অতঃপর তদস্থলে হাফসির ভাইকে নিযুক্ত করেন।

এ ঘটনার প্রেক্ষিতে স্পেনের রাজা শার্লকান এবং ইতালি, আফ্রিকা ও ইউরোপের অন্যান্য দেশসমূহ ক্ষুব্ধ হয়। শার্লকান তিউনিসিয়ায় স্বীয় প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে এবং একান্ত অনুগত রাজাকে তার রাজত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে। শার্লকান নিজ নেতৃত্বে সৈন্যদের নিয়ে বের হয় এবং তিউনিসিয়ায় প্রবেশ করতে সমর্থ হয়। সে সৈন্যদেরকে মুসলমানদের সম্পদ লুট, মসজিদ ধ্বংস এবং তাদেরকে হত্যা, তাদের সম্মানহানি, বন্দি করা ও দাস বানানোর স্বাধীনতা প্রদান করে। অতঃপর সে খাইরুদ্দিনকে হটিয়ে বাজার্ট ও ইনাবাতে ক্ষমতাচ্যুত রাজা হাফসিকে পুনরায় ক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়। এদিকে খাইরুদ্দিন টিকতে না পেরে তিউনিসিয়া ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন।

আরব উপদ্বীপ ও ভারতবর্ষে উসমানিদের কার্যক্রম

ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, পর্তুগিজদের পক্ষ হতে বিপদের আশঙ্কা ছিল। তারা জাজিরাতুল আরবের দক্ষিণাঞ্চলীয় বেশকিছু জায়গা দখল এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ মুবারক চুরি করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল। অধিকন্তু মোঘল সুলতানদের শাসনাধীন ভারতবর্ষে পর্তুগিজদের হানা দেওয়ারও আশঙ্কা রয়েছিল।

খলিফা সুলাইমান জাজিরাতুল আরবকে পর্তুগিজমুক্ত করতে আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে আদেশ করেন। মুসলিম বাহিনী যথারীতি আক্রমণ করে ইয়েমেন, এডেন, মাস্কাট দখল করে এবং হরমুজ দ্বীপ অবরুদ্ধ করতে সক্ষম হয়। এর ফলে পর্তুগিজদের পক্ষ হতে আক্রমণ আসার পথ রুদ্ধ হয় এবং তাদের হীন উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। সে সময় ভারতবর্ষের মোঘল বাদশাহ পর্তুগিজ কর্তৃক দখলকৃত ভারতীয় উপকূল উদ্ধারের জন্য

খলিফার সাহায্য প্রার্থনা করে। খলিফা মোঘলদের সাহায্যে একটি নৌবহর প্রেরণ করেন, যারা পর্তুগিজদের নিকট হতে বেশকিছু দুর্গ মুক্ত করতে সক্ষম হয়। তবে দেওয়ের[৪৯] সমুদ্র যুদ্ধে উসমানি নৌবাহিনী পরাজিত হলে তাদেরকে প্রত্যাহার করা হয়। এদিকে পর্তুগিজরা প্রচার করে যে, উসমানি খলিফা ভারতবর্ষকে তার খিলাফতের সাথে যুক্ত করতে চান। এরূপ ফিতনা সৃষ্টিকারী প্রচারণা হতে বেঁচে থাকার জন্য উসমানি সৈন্য সরিয়ে নেওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অতঃপর উসমানি সৈন্যদের প্রত্যাহার করা হয়।

---

[৪৯]. **দেওয়ের সামুদ্রিক যুদ্ধ :** ১৫০৯ খ্রিষ্টাব্দে আরব সাগর উপকূলীয় ভারতের দেও সমুদ্রবন্দরে পর্তুগিজ এবং উসমানিদের মাঝে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। -সম্পাদক

ইউরোপে যুদ্ধ

স্পেনের মুসলমানদের ওপর নির্যাতন করার কারণে নাবিক খাইরুদ্দিন কর্তৃক প্রতিশোধ গ্রহণ

নাবিক খাইরুদ্দিন বারবারোসা ও তার ভাই আরুজ মুসলমানদের সাথে স্প্যানিশদের নির্মম আচরণের কথা জানার পর মুসলমানদেরকে সহযোগিতা করার উদ্যোগ নেন। খ্রিষ্টানরা মুসলমানদেরকে হত্যা করা শুরু করে। তারা তাদেরকে খ্রিষ্টান বানানোর চেষ্টাও অব্যাহত রাখে। এমতাবস্থায় মুসলমানদেরকে আপন দ্বীন নিয়ে মুসলিম দেশে পালানোর সুযোগ করে দিতে স্পেনের সমুদ্র উপকূলের উদ্দেশ্যে মুসলমানদের জাহাজসমূহ যাত্রা করে। সে সময় খাইরুদ্দিন মুসলমানদের পক্ষ হতে ইউরোপের সকল খ্রিষ্টানদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। অনুরূপ যারা দলে দলে মুসলিমদের ওপর অত্যাচার করতে মিলিত হয়েছিল এবং স্পেনে মুসলিম নিধনকে সাধুবাদ জানিয়েছিল তাদের থেকেও প্রতিশোধ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

খাইরুদ্দিন বারবারোসা ইতালি, ফ্রান্স ও স্পেনের বেশিরভাগ সমুদ্রতীরে আগ্রাসন চালিয়ে অনেক খ্রিষ্টানকে জোরপূর্বক জাহাজে টেনে তোলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে মুসলিম দেশসমূহে দাস হিসেবে বিক্রয় করা। যেন ইউরোপের খ্রিষ্টানরা বুঝতে পারে যে, মুসলমানগণ ক্ষমা ও উদারতার গুণে গুণান্বিত হওয়ার পাশাপাশি তাদের ভাইদের ওপর পরিচালিত নির্যাতনের জন্য প্রতিশোধও গ্রহণ করতে সক্ষম। উসমানি খিলাফত ও ফ্রান্সের মাঝে চুক্তি হওয়ার পর খাইরুদ্দিন স্পেনের ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব দেন।

তিউনিসিয়া হতে খাইরুদ্দিনকে ফেরত পাঠানোর পর তিনি ৯৪৪ হিজরিতে (১৫৩৭ খ্রিষ্টাব্দে) শার্লকানের নৌবহরকে পরাজিত করেন। অতঃপর তিনি কিরিট উপদ্বীপ জয় করার উদ্দেশ্যে অভিযানে বের হন। কিন্তু তিনি তা জয় করতে ব্যর্থ হন।

রোডস উপদ্বীপ জয়

ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। যেমন অস্ট্রিয়ার রাজা শার্লকান ফ্রান্স সম্রাট ফ্রাঁসোর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। অনুরূপভাবে ক্যাথলিকগণ প্রোটেস্ট্যাট খ্রিষ্টানদের সাথে ধর্মীয় বিরোধে জড়িয়ে ছিল। খলিফা তাদের এ যুদ্ধব্যস্ততাকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং ৯২৯ হিজরিতে (১৫২৩ খ্রিষ্টাব্দে) অভিযান প্রেরণ করে রোডস দ্বীপ জয় করেন। পোপ ইউহান্নার অশ্বারোহীরা রোডস ছেড়ে মাল্টায় পলায়ন করে। উল্লেখ্য যে, অস্ট্রিয়ার রাজা শার্লকান এ শহরটি ইউহান্নাকে উপঢৌকন হিসেবে দান করেছিল।

ক্রিমিয়াকে উসমানি খিলাফতের সাথে যুক্তকরণ

ক্রিমিয়ার শাসকগোষ্ঠী উসমানিদের আনুগত্য স্বীকার করত। পরবর্তী সময়ে উসমানিদের সাথে শাসকদের বিরোধ দেখা দিলে উসমানিরা ৯৩৯ হিজরিতে (১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দে) ক্রিমিয়ায় হস্তক্ষেপ করে এটিকে উসমানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

ওয়ালাচিয়াকে উসমানি প্রদেশে পরিণতকরণ

সুলতান সুলাইমান ওয়ালাচিয়াকে উসমানি অঙ্গরাজ্যে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ৯৩১ হিজরিতে (১৫২৫ খ্রিষ্টাব্দে) ওয়ালাচিয়ায় প্রবেশ করেন। অতঃপর রাজধানী বুখারেস্ট দখল করে নেন। কিন্তু পরে সেখানকার লোকেরা ট্রান্সসিলভানিয়ার আমিরের সহযোগিতায় বিদ্রোহ করে নিজেদের জন্য নতুন একজনকে আমির নিযুক্ত করে। খলিফা অতিরিক্ত কর প্রদানের বিনিময়ে তাদের মনোনীত আমিরকে মেনে নিতে সম্মত হন।

ফরাসিদের সাথে উসমানিদের চুক্তি

ফ্রান্স অস্ট্রিয়ার রাজা শার্লকানের ব্যাপারে ভীষণ শঙ্কিত ছিল; বিশেষত যখন চতুর্দিক হতে সে ফ্রান্সকে ঘিরে ফেলেছিল। সে স্পেন, হল্যান্ড, জার্মানি ও ইতালির বিশাল অংশ তার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। ফরাসি সম্রাট খলিফাকে প্রস্তাব করে শার্লকানের সাম্রাজ্যে পূর্ব দিক থেকে অভিযান চালাতে। আর সে পশ্চিম দিক থেকে অভিযান চালাবে। খলিফা ফরাসি সম্রাটের চিন্তাধারার সাথে একমত হন।

বেলগ্রেড জয়

খলিফা হাঙ্গেরির রাজার নিকট কর প্রদানের আদেশসংবলিত পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু রাজা খলিফার দূতকে হত্যা করে। খলিফা ক্রুদ্ধ হয়ে নিজেই সৈন্যবাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। হাঙ্গেরি পৌঁছার পথে বেলগ্রেড অবস্থিত। হাঙ্গেরিতে প্রবেশে বেলগ্রেডই কেবল বাধা। তাই খলিফা ৯২৭ হিজরিতে (১৫২১ খ্রিষ্টাব্দে) প্রথমে বেলগ্রেড জয় করেন।

হাঙ্গেরি জয়

খলিফা স্বয়ং এক লক্ষ সৈন্য, তিনশত ক্ষেপণাস্ত্র ও আটশ জাহাজ নিয়ে হাঙ্গেরির দক্ষিণে দানিয়ুব নদীতে পৌঁছেন এবং তিনি বেলগ্রেডে সেনাঘাঁটি স্থাপন করেন। পথিমধ্যে বেশকিছু দুর্গ জয় করেন। অতঃপর ৯৩২ হিজরিতে (১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে) হাঙ্গেরির রাজা ও তার যোদ্ধারা পরাজিত হয়। খলিফা হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্ট জয় করেন। অতঃপর দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে ট্রান্সসিলভানিয়ার রাজা গানজাবুলিকে হাঙ্গেরির নতুন রাজা হিসেবে নিয়োগ দেন।

অস্ট্রিয়ার সাথে যুদ্ধ ও ভিয়েনা অবরোধ

অস্ট্রিয়ার রাজা শার্লকানের ভাই ফার্ডিন্যান্স দাবি করে যে, হাঙ্গেরির ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে এবং রাজধানী বুদাপেস্ট দখল করে নিতে সক্ষম হয়েছে। তখন খলিফা কর্তৃক নিয়োজিত রাজা গানজাবুলি খলিফার সাহায্য চায়। ফলে উসমানি সৈন্যরা বুদাপেস্ট আক্রমণ করে। ফার্ডিন্যান্স যুদ্ধে টিকতে না পেরে পলায়ন করে। সৈন্যরা তাকে তাড়িয়ে অস্ট্রিয়ায় নিয়ে যায় এবং রাজধানী ভিয়েনা অবরোধ করে। তারা ভিয়েনার প্রাচীরে ফাটল ধরাতে সক্ষম হয়। কিন্তু তাদের রসদ শেষ হয়ে আসে। এদিকে শীতের মৌসুমও শুরু হয়ে যায়। যার কারণে খলিফা দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

৯৩৮ হিজরিতে (১৫৩২ খ্রিষ্টাব্দে) অস্ট্রিয়ার রাজা বুদাপেস্ট দখলের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। খলিফা তাকে দমন করতে পরের বছর আবার অভিযানের উদ্দেশ্যে বের হন। কিন্তু খলিফা শার্লকানের ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতির সংবাদ জানার পর যুদ্ধে না জড়িয়ে ফিরে যান।

উসমানিদের সাথে ফ্রান্সের চুক্তি ভঙ্গ

খ্রিষ্টান রাষ্ট্র ফ্রান্স উসমানি খলিফার সাথে শার্লকান ও খ্রিষ্টান সাম্রাজ্যের বিপক্ষে চুক্তি করে। এ ব্যাপারে ইউরোপের জনমনে বিরূপ মনোভাব তৈরি হয়। এজন্য ফ্রান্সের রাজা ফ্রাঁসো খ্রিষ্টানদের মনস্তুষ্টির জন্য অস্ট্রিয়ার রাজার সাথে শান্তিচুক্তি করে এবং উসমানিদের সাথে কৃতচুক্তি ভঙ্গ করে। অস্ট্রিয়া সুযোগের সদ্ব্যবহার করে উসমানিদের সাথে যুদ্ধ খেলায় মেতে ওঠে। কিন্তু তারা ৯৪৩ হিজরিতে উসমানি বাহিনীর হাতে পরাজয় বরণ করে।

উসমানিদের বিরুদ্ধে মোলদাভিয়ার শাসককে প্ররোচনা

রাজা শার্লকানের ভাই উসমানিদের বিপক্ষে মোলদাভিয়ার শাসককে প্ররোচনা দেয়। সে প্ররোচিত হয়ে যথারীতি বিদ্রোহ করে বসে। উসমানিরা তাকে কাবু করতে সক্ষম হয়। অতঃপর মোলদাভিয়ার শাসকের পদে তার ভাইকে নিযুক্ত করে এবং এ শহরের সুরক্ষা আগের চেয়েও জোরদার করে।

অস্ট্রিয়ার সাথে অনবরত যুদ্ধ

হাঙ্গেরির রাজা গানজাবুলি ফার্ডিন্যান্সের বুদ্ধিতে হাঙ্গেরিকে বিভক্ত করতে সম্মত হয়। তাদের চিন্তাধারা হলো, হাঙ্গেরি ভাগ হয়ে গেলে উসমানিদের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। গানজাবুলি ও ফার্ডিন্যান্সের মাঝে সংঘটিত চুক্তির কপি ফ্যার্ডিন্যান্স গোপনে খলিফার নিকট প্রেরণ করে। যেন খলিফা জানতে পারে যে, তার প্রতি গানজাবুলির আনুগত্য নেই।

ইতিমধ্যে ৯৪৬ হিজরিতে (১৫৩৯ খ্রিষ্টাব্দে) গানজাবুলি মৃত্যুবরণ করে। তার মৃত্যুকে ফার্ডিন্যান্স হাঙ্গেরি দখলের সুযোগ মনে করে। সে দানিয়ুব নদীর এক তীরে অবস্থিত পেস্ট শহর দখল করে। (যার অপর তীরে অবস্থিত বুদা নামক শহর। পরবর্তীকালে বুদা ও পেস্ট মিলিত হয়ে যায়, যা বর্তমানে হাঙ্গেরির রাজধানী)। উসমানিরা ৯৪৭ হিজরিতে (১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে) বুদাপেস্ট আক্রমণ করার পর অস্ট্রীয় বাহিনী পলায়ন করে। তারপর থেকে হাঙ্গেরি উসমানিদের শাসনাধীনে চলে আসে। গানজাবুলির বিধবা স্ত্রী তার কিশোর ছেলে বড় হওয়া পর্যন্ত উসমানি শাসন বহালের পক্ষে সম্মতি জ্ঞাপন করে। নানা ঘটনাপ্রবাহের একপর্যায়ে উসমানিদের

সাথে অস্ট্রিয়ার পাঁচ বছর মেয়াদি চুক্তি হয়। চুক্তি মোতাবেক অস্ট্রিয়া উসমানিদেরকে হাঙ্গেরি নিয়ন্ত্রণকালে কর প্রদান করবে মর্মে সম্মত হয়।

ট্রান্সসিলভানিয়া আক্রমণ

ইউরোপের খ্রিষ্টানরা একের পর এক চুক্তি ভঙ্গ করে চলেছে। গানজাবুলির বিধবা স্ত্রী ইসাবেলা ফার্ডিন্যান্সকে ক্ষমতা দিয়ে ট্রান্সসিলভানিয়ার সিংহাসন ছেড়ে দেয়। তার এ কার্যটি উসমানিদের সাথে অস্ট্রিয়ার যে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি ছিল তার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। যার কারণে ৯৫৭ হিজরিতে (১৫৫০ খ্রিষ্টাব্দে) উসমানিরা ট্রান্সসিলভানিয়া আক্রমণ করে।

ফ্রান্সের সাথে বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন

উসমানিরা ইউরোপীয় ক্রুসেডারদের একটি পক্ষের সমর্থন চেয়েছে। যেন কখনো তারা একজোট হতে না পারে। সে লক্ষ্যে ৯৪২ হিজরিতে ফ্রান্সের সাথে চুক্তি সই করে। এ চুক্তির ফলে ফ্রান্স বহুমুখী সুবিধা পেলেও উসমানিরা খিলাফতের পতন পর্যন্তই নানা প্রকারের অসুবিধার সম্মুখীন হয়। বিশেষ করে সুলাইমানের পরবর্তী খলিফাগণ ভিনদেশিদের এত বেশি সুযোগ-সুবিধা দিয়ে দিয়েছিল, যার ফলে সাম্রাজ্যের ভেতরে যেন গড়ে ওঠে বিদেশিদের এক ভিন্ন রাজত্ব। যেমন : ফরাসিরা উসমানি এলাকার ভেতরেও তাদের নিজস্ব আইনেই ফরাসি নাগরিকদেরকে শাসন করত, উসমানি আইনে নয়। মুসলিম অধিবাসীদের নাগরিক আইন তাদের ক্ষেত্রে কার্যকর হতো না। তাদের বিরুদ্ধে কর আদায়কারীদেরও অভিযোগ প্রদানের কোনো অধিকার ছিল না। একমাত্র সদরে আজমের (প্রধানমন্ত্রী) কাছেই অভিযোগ দেওয়া যেত; অন্যান্য লোকের ব্যাপারে সাধারণ আদালতে অভিযোগ করার নিয়ম চলমান থাকলেও ফরাসিদের বেলায় তা ছিল ব্যতিক্রম। কোনো ফরাসি নাগরিক উসমানি রাষ্ট্র হতে ঋণ গ্রহণের পর সে উসমানি রাষ্ট্র ছেড়ে নিজ দেশে বা অন্য কোথাও চলে গেলে তাকে ঋণের অর্থ পরিশোধের জন্য জবাবদিহি করতে হতো না। এরূপ ঘটনা ভুলের ভাঁজে পড়ে যেত। এ ছাড়া ফরাসিরা আরও অনেক সুবিধাভোগ করত। তাদের সুবিধা ভোগের মাত্রা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, তারা উসমানি সাম্রাজ্যে যা ইচ্ছে হতো তা-ই করতে পারত। তারা অবৈধ কাজ ও অশ্লীলতাকে বৈধ মনে করত। তাদেরকে কেউ কোনো কথা বলার সাহস পেত না। এমনকি উসমানিদের অঞ্চলে

থাকা তাদের রাষ্ট্র পরিচালিত যে জেলখানাটি ছিল, সেখানে ফরাসি কয়েদিরা মদ, নারী ইত্যাদি ভোগ করার সুযোগ পেত। সেখানে তারা আনন্দঘন পরিবেশে সময় কাটাত।

অনুগত রাষ্ট্রসমূহ যতই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, ততই তারা সুযোগ-সুবিধা প্রদানের দাবিতে সোচ্চার হয়েছে। তাদের এরূপ কর্মকাণ্ডের ফলে উসমানি সাম্রাজ্য বহিরাগত চাপের সাথে সাথে অভ্যন্তরীণ চাপেও কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল।

সর্পিণী রোকসালানা[৫০] ও দোনমে ইহুদিগোষ্ঠী

তাতার মুসলিমগণ ক্রিমিয়ায় রুশবিরোধী কোনো এক অভিযানকালে অত্যন্ত সুন্দরী এক রুশ তরুণীকে আটক করে। তার নাম রোকসালানা। সৈন্যরা তাকে খলিফার দরবারে প্রেরণ করে। খলিফা তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। এক সূত্রমতে তরুণীটি ছিল রাশিয়ান ইহুদি। সে খলিফার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রের নানা কাজে হস্তক্ষেপ করা শুরু করে। স্পেন থেকে বিতাড়িত ইহুদিদেরকে উসমানি সমাজে ঠাঁই করে দিতে সে খলিফার নিকট আবেদন জানায়। এ সকল ইহুদিকে দোনমে ইহুদি বলা হয়ে থাকে। তাদেরকে স্পেন প্রত্যাখ্যান করার পর উসমানিরা কোলে তুলে নিয়েছিল। কিন্তু তারা উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতি বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতাবোধ দেখায়নি। পরবর্তী সময়ে উসমানি খিলাফতের পতনে তারাই প্রধান ভূমিকা পালন করেছে।

এমনকি এ নারী খলিফাকে অনুরোধ করে, তিনি যেন তাতারদেরকে ক্রিমিয়ায় রুশদের সাথে লড়াই করা থেকে বিরত রাখেন। অথচ রুশরা তখন আগ্রাসন চালিয়ে তাতারদের অধিকাংশ এলাকা দখল করে নিয়েছিল এবং তারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ঘৃণ্যতম অপরাধ সংঘটিত করেছিল।

রোকসালানা এতটুকুতে তুষ্ট ছিল না; বরং তার ঔরসজাত সন্তান সেলিমকে সুলাইমানের স্থলাভিষিক্ত করার প্রয়াস অব্যাহত রাখে। অথচ সেলিমের বড় ভাই মোস্তফা সিপাহি-জনতার ভালোবাসায় সিক্ত প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি ছিলেন খিলাফতের মসনদের যোগ্য উত্তরসূরি।

---

৫০. রোকসালানা। হুররেম সুলতানা নামেই সে অধিক কুখ্যাত। -সম্পাদক

রুস্তম পাশা ছিলেন খলিফার সদরে আজম বা প্রধানমন্ত্রী। রোকসালানার সুপারিশে সে এ পদ অলংকৃত করে। খলিফা রোকসালানার গর্ভে জন্ম নেওয়া কন্যাকে তার নিকট বিবাহ দেন। রুস্তম নানা অভিযোগ তুলে খলিফাকে মোস্তফার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলেন। রুস্তম খলিফার নিকট পত্র লেখেন যে, মোস্তফা খলিফাকে অপসারণ করে শাসনভার হাতে নিতে চায়। খলিফা উত্তেজিত হয়ে মোস্তফাকে দমাতে বের হন। তখন মোস্তফা শিয়া সাফাভিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। খলিফা তাকে তাঁবুতে ডেকে আনেন। মোস্তফা পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে হাজির হওয়ামাত্র কতিপয় কর্মচারী তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে।

এ সর্পনারী মোস্তফাকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং তাঁর দুধের ছেলেকে হত্যা করার জন্য আততায়ী নিয়োগ করেছিল। ৯৭৪ হিজরিতে (১৫৬৭ খ্রিষ্টাব্দে) খলিফা মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় সেলিম মসনদে আরোহণ করেন।

খলিফা দ্বিতীয় সেলিম

(৯৭৪-৯৮২ হি./১৫৬৬-১৫৭৪ খ্রি.)

খলিফা দ্বিতীয় সেলিমের শাসনামলে প্রধানমন্ত্রীই প্রকৃত শাসক ও সেনাপতি হয়ে ওঠেন। প্রধানমন্ত্রীকে এরূপ ক্ষমতা প্রদানের কারণ হলো, ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করা মুসলিম সাম্রাজ্যের সম্পদের পাহাড় হয়ে ওঠা কোষাগার। খলিফা দেশের সকল ভার কাঁধে নিয়ে প্রধানমন্ত্রিত্বের আসন গ্রহণ করার চেয়ে ভোগবিলাসিতায় মত্ত থাকাকে প্রাধান্য দেন।

সেলিম ছিল রোকসালানার পুত্র। এ নারী খলিফা সুলাইমানের অন্যান্য সন্তানকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে বিজয়ী হওয়ার পর তার পুত্র সেলিম ক্ষমতাসীন হন। উল্লেখ্য যে, রাজপুত্রদের অনেকের হত্যাকাণ্ডে সেলিম নিজেও ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত ছিলেন।

সেলিম পূর্ববর্তী খলিফাদের মতো দূরদর্শী শাসক ছিলেন না। তবে মন্ত্রী মুহাম্মাদ সাকালির দক্ষতাবলে উসমানি খিলাফত রক্ষা পায়।

মুসলিমবিশ্বে উসমানিদের কার্যক্রম

ইয়েমেনে বিদ্রোহ দমন

ইয়েমেনে মুতাহহার বিন শরফুদ্দিনের নেতৃত্বে বিদ্রোহ দেখা দেয়। খলিফা বিদ্রোহ দমনে উসমান পাশাকে প্রেরণ করেন। তাকে মিশরের গভর্নর সিনান পাশা সহযোগিতা করেন। সৈন্যরা ৯৭৬ হিজরিতে (১৫৬৮ খ্রিষ্টাব্দে) বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হয়।

তিউনিসিয়াকে উসমানি অঙ্গরাজ্যে রূপদান

স্পেন ৯৮০ হিজরিতে (১৫৭২ খ্রিষ্টাব্দে) তিউনিসিয়া দখলে নিতে সমর্থ হয়। তারা তাদের অনুগত হাসান হাফসিকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনে। কিন্তু দ্রুততম সময়ের মধ্যে উসমানিরা স্পেনকে তিউনিসিয়া থেকে বিতাড়ন করতে সক্ষম হয়। ৯৮১ হিজরিতে (১৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে) এ দেশটিকে উসমানি অঙ্গরাজ্যে পরিণত করা হয়। তিউনিসিয়া মুক্তি আন্দোলনে মিশরের গভর্নর সিনান পাশা নেতৃত্ব দেন।

ইউরোপে উসমানিদের তৎপরতা

অস্ট্রিয়া

৯৭৬ হিজরিতে (১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে) অস্ট্রিয়ার সাথে উসমানিদের একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তিতে বলা হয় উসমানিরা অস্ট্রিয়ার আওতাধীন হাঙ্গেরির অংশবিশেষ রক্ষার দায়িত্ব পালন করবে। বিনিময়ে অস্ট্রিয়া বার্ষিক কর প্রদান করবে। একই সময় ট্রান্সসিলভানিয়া, ওয়ালাচিয়া ও মোলদাভিয়া উসমানিদের আনুগত্য স্বীকার করে।

ফ্রান্স

ফ্রান্সের সাথে চুক্তিসম্পাদন এবং ফ্রান্সকে সুযোগ-সুবিধা প্রদানের বিষয়ে খলিফার জোরালো সমর্থন ছিল। যার ফলে ক্যাথলিক খ্রিষ্টানরা উসমানি সাম্রাজ্যে তাদের মিশনারি তৎপরতা শুরু করে। বিশেষত সিরিয়ায় তা ব্যাপকতা লাভ করে। ফরাসি ও খ্রিষ্টবাদের বীজ রোপণের মাধ্যমে উসমানি সাম্রাজ্যে উসমানিদের বিরুদ্ধে কার্যক্রম শুরু হয়।

পোল্যান্ড

অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে উসমানিরা পোল্যান্ডের মসনদে ফরাসি রাজার ভ্রাতাকে নিয়োগ প্রদান করে। এরপর থেকে পোল্যান্ড উসমানিদের অধিকারে চলে আসে।

সাইপ্রাস বিজয়

সাইপ্রাসকে ভেনিসরা দখল করে রেখেছিল। উসমানিরা ৯৭৮ হিজরিতে (১৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে) তাদের হাত থেকে সাইপ্রাস ছিনিয়ে নেয়।

লেপান্টো সমুদ্র যুদ্ধ

সাইপ্রাস অ্যাড্রিয়াটিক সমুদ্রের কিছু অংশে এবং ক্রিট উপদ্বীপে উসমানিদের আধিপত্য বৃদ্ধির ফলে ভূমধ্যসাগরে ইউরোপের প্রতি হুমকি তৈরি হয়। তাই ইউরোপের খ্রিষ্টান শক্তিসমূহ উসমানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য জোট গড়ে তোলে। ভেনিসিয়ান ও স্পেনিশ নৌবহর পোপ মুবারাকার নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়ে মাল্টার পোপদের সাথে যোগ দেয় এবং ৯৭৯ হিজরিতে (১৫৭১ খ্রিষ্টাব্দে) উসমানি নৌবহরকে পরাজিত করে। এ যুদ্ধে উসমানিরা করুণ পরাজয় বরণ করে। তারা ১৩০টি জাহাজ, ৩০০

ক্ষেপণাস্ত্র ও ত্রিশ হাজার বন্দিকে হারায়। এগুলো খ্রিষ্টানরা দখল করে নেয়। খ্রিষ্টানদের এ বিজয়ের ফলে ইউরোপজুড়ে ঘণ্টাধ্বনি বেজে ওঠে। ভ্যাটিকানের পোপ বিজয়ী নৌবহরের প্রধান গুয়ানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ভাষণ দেয়।

ইস্তাম্বুলে মুসলিম বাহিনীর পরাজয়ের সংবাদ পৌঁছার পর মুসলিম জনতা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তারা সেখানকার খ্রিষ্টানদের মাঝে রক্তপাত ঘটাতে সংকল্প গ্রহণ করে। কিন্তু মন্ত্রী মুহাম্মাদ সাকালি তাদেরকে নিবৃত্ত করেন। উসমানিরা এ পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করে। তাদের প্রস্তুতির সংবাদ জানার পর ভেনিসিয়ানরা ভীত হয়ে পড়ে এবং সাইপ্রাসে উসমানিদের কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে তাদের নিকট শান্তিপ্রস্তাব প্রেরণ করে। চুক্তি মোতাবেক তারা যুদ্ধে উসমানিদের যে ক্ষতি হয়েছে তজ্জন্য বড় মাপের ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। এ চুক্তিটি ৯৮০ হিজরিতে (১৫৭২ খ্রিষ্টাব্দে) সম্পাদিত হয়।

মোলদাভিয়া

মোলদাভিয়া রাজ্য উসমানিদের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে বিদ্রোহ করলে উসমানিরা ৯৮১ হিজরিতে (১৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে) বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হয়।

অতঃপর ৯৮২ হিজরিতে (১৫৭৪ খ্রিষ্টাব্দে) দ্বিতীয় সেলিম মৃত্যুবরণ করলে তার পুত্র তৃতীয় মুরাদ খলিফা নিযুক্ত হয়।

খলিফা তৃতীয় মুরাদ
(৯৮২-১০০৩ হি./১৫৭৪-১৫৯৫ খ্রি.)

অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম

খলিফা তৃতীয় মুরাদ ক্ষমতা লাভের পরপরই নিজের পাঁচ ভাইকে হত্যা করেন, যেন ক্ষমতা নিয়ে কেউ বিরোধ করতে না পারে। মুরাদের পিতার আমলে মদ্যপান ভয়াবহ আকার ধারণ করে। তৃতীয় মুরাদ মদ্যপান নিষিদ্ধ করেন। মদ পানের নিষেধাজ্ঞাসংবলিত ফরমান জারির পর সেনাদের মাঝে উত্তেজনা দেখা দেয়। তারা এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিতে খলিফাকে বাধ্য করে।

খলিফা ক্ষমতায় এসে ফ্রান্স ও ভেনিসকে নতুন নতুন সুবিধা প্রদান করেন। তিনি ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতকে বিশেষ মর্যাদা দান করেন। সরকারি প্রোগ্রামে অন্যান্য রাষ্ট্রদূতদের সামনের সারিতে তাকে বসার সুযোগ দেওয়া হতো। ভেনিস ব্যতীত অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের জাহাজসমূহ উসমানি বন্দরে প্রবেশের পর তাদেরকে ফ্রান্সের পতাকা ওড়াতে বাধ্য করা হতো। পরবর্তীকালে ইংল্যান্ডকে এ নিয়ম মানা হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

মুসলিম দেশসমূহে উসমানিদের কার্যক্রম

মরক্কো

মরক্কোর শাসক তার দেশের বিদ্রোহ দমনে খলিফার নিকট সাহায্য চান। অপরদিকে বিদ্রোহীরা পর্তুগিজদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। উসমানিরা মরক্কোর শাসকের ডাকে সাড়া দিয়ে ৯৮৫ হিজরিতে (১৫৭৭ খ্রিষ্টাব্দে) গ্রেট প্যালেস নামক স্থানে পর্তুগিজদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যুদ্ধে উসমানিরা বিজয় লাভ করে এবং ক্ষমতাচ্যুত শাসককে সিংহাসন ফিরিয়ে দেয়।

সাফাভি রাষ্ট্র

৯৮৪ হিজরিতে (১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে) শিয়া সাফাভিদের শাসক তাহমাস্প মৃত্যুবরণ করে। তার মৃত্যুর পর রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ে সাফাভিদের মাঝে বিরোধ দেখা দেয়। উসমানিরা এ বিরোধকে সুযোগ মনে করে। তারা ৯৮৫ হিজরিতে (১৫৭৭ খ্রিষ্টাব্দে) সাফাভিদের নিয়ন্ত্রণাধীন জর্জিয়া দখল করে নেয়। ৯৮৬ হিজরিতে (১৫৭৪ খ্রিষ্টাব্দে) তারা উত্তর আজারবাইজানের শিরওয়ান এবং ৯৯১ হিজরিতে (১৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে) দাগিস্তান দখল করে উসমানি সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত করে নেয়।

৯৯১ হিজরিতেই (১৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে) উসমান পাশা ক্রিমিয়ার শাসককে শিক্ষা দিতে তথায় গমন করেন। সাফাভিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে উসমানিরা তার সাহায্য চেয়েছিল। কিন্তু সে সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। যার কারণে তুর্কি সেনাপতি উসমান পাশা ক্রিমিয়ার শাসকের স্থলে শাসকের ভাইকে ক্ষমতা গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। অতঃপর ভাই ভাইকে হত্যা করলে উসমান পাশা রাজধানী কাফাতে পৌঁছতে সক্ষম হন।

মুহাম্মাদ পাশা সাকালির মৃত্যুর পর উসমান পাশা খিলাফতের সদরে আজম বা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তার প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়ে তিনি উসমানি খিলাফতের দাপট ধরে রাখতে সক্ষম হন।[৫১]

উসমান পাশা সাফাভি রাষ্ট্রের যে অংশ স্বীয় সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত করেছিলেন তার প্রতি সাফাভিদের স্বীকৃতি আদায় করেন। দখলকৃত ভূখণ্ডের মাঝে রাজধানী তাবরিজও ছিল। ৯৯৩ হিজরিতে (১৫৮৫ খ্রিষ্টাব্দে) খলিফা তাবরিজে গমন করেন। সাফাভিরা রাজধানী তাবরিজসহ দক্ষিণ আজারবাইজান ছাড়তে বাধ্য হয়।

---

৫১. **মুহাম্মাদ পাশা সাকলির গৃহীত পদক্ষেপসমূহ :** ইস্তাম্বুলে ক্রুসেডীয় ভেনিসের প্রতিনিধি প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মাদ পাশা সাকলির সাক্ষাৎ চেয়ে আবেদন করে। যাতে প্রধানমন্ত্রীর প্রকৃত অবস্থা তলিয়ে দেখা যায় এবং ভেনিসের প্রতি উসমানি সাম্রাজ্যের নীতি নির্দেশনা জানা যায়। প্রধানমন্ত্রী অবাক করে দিয়ে তাকে বললেন, নিঃসন্দেহে তুমি আমাদের বীরত্ব ও তার অবস্থান কী তা অবহিত হতে এসেছ। জেনে রাখো আমাদের ও তোমাদের ক্ষতির মাঝে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। আমরা সাইপ্রাস দখল করে তোমাদের একহাত কেটে নিয়েছি। আর আমাদের নৌবহর পরাজয়ে তোমরা আমাদের দাড়ি মুণ্ডিয়ে দিয়েছ মাত্র। কিন্তু আমাদের দাড়ি পূর্বের চেয়ে আরও ঘন ও দ্রুত মুখে গজাবে।

ইউরোপে উসমানিদের কার্যক্রম

উসমানি সাম্রাজ্যে পোল্যান্ডের অন্তর্ভুক্তি

পোল্যান্ডের রাজা হেনরি দেশ ছেড়ে ফ্রান্সে চলে যাওয়ার পর উসমানিরা তদস্থলে ট্রান্সসিলভানিয়ার রাজাকে স্থলাভিষিক্ত করে। এদিকে আট বছর পূর্বে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক অস্ট্রিয়া উসমানিদের রাজ্য হিসেবে পোল্যান্ডকে স্বীকৃতি দেয়। আট বছর পর উসমানিরা যখন এটির শাসক নিয়োগ দেয়, তখন অস্ট্রিয়া এ নিয়োগকে স্বীকৃতি প্রদান করে। আর তখন থেকে পোল্যান্ড উসমানিদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

জেনিসারি বাহিনীর যত সমস্যা

অস্ট্রিয়া বা সাফাভিদের সাথে যুদ্ধ বন্ধ থাকলে জেনিসারি সেনাবাহিনীর হাতে ছিনতাই, লুটপাট ছাড়া আর কোনো কাজ অবশিষ্ট থাকে না। সেজন্য প্রধানমন্ত্রী হাঙ্গেরিতে অস্ট্রিয়ার সাথে যুদ্ধে জেনিসারি সেনাদের ব্যস্ত রাখেন। কিন্তু সেনাদের বিশৃঙ্খল পরিবেশের কারণে পরাজয় অব্যাহত থাকে। ফলে বেশকিছু দুর্গ হাতছাড়া হয়ে যায়, যা ১০০৩ হিজরিতে সিনান পাশা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন।

ওয়ালাচিয়া, মোলদাভিয়া ও সিলভানিয়া সুযোগ বুঝে উসমানিদের বিপক্ষে যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার সাথে যোগ দেয়। সিনান পাশা তার বাহিনী নিয়ে ওয়ালাচিয়ার (রোমানিয়া) রাজধানী বুখারেস্টে পৌঁছে যান। কিন্তু বুখারেস্টের শাসক উসমানিদেরকে দানিয়ুব নদীর ওপারে হটিয়ে দেয় এবং কিছু শহর দখল করে নেয়। অতঃপর খলিফা তৃতীয় মুরাদ ১০০৩ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করলে তার ছেলে তৃতীয় মুহাম্মাদ খলিফা নিযুক্ত হন।

খলিফা তৃতীয় মুহাম্মাদ

(১০০৩-১০১২ হি./১৫৯৫-১৬০৩ খ্রি.)

খলিফা তৃতীয় মুহাম্মাদ ছিলেন খলিফা তৃতীয় মুরাদের ইতালির ভেনিস শহর হতে আহরিত দাসীর গর্ভজাত সন্তান। এ নারী রাষ্ট্রের বিভিন্ন কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করত। তৃতীয় মুহাম্মাদ ক্ষমতারোহণের পর তাঁর উনিশজন ভাইকে সে হত্যা করে।

কিরজিত যুদ্ধ

সুলতান সুলাইমান কানুনির শাসনামলের শেষভাগ হতে প্রধানমন্ত্রীই ছিলেন সেনাধিনায়ক। খলিফা তৃতীয় মুহাম্মাদ এ নিয়ম ভেঙে সেনাধিনায়কের পদ নিজের নিকট রাখেন। ইতিপূর্বে উসমানি বাহিনী লাগাতার পরাজয় বরণ করে আসছিল। খলিফা দায়িত্ব নেওয়ার পর সৈন্যদের অন্তরে ধর্মীয় চেতনা বৃদ্ধি পায় এবং জিহাদি প্রেরণায় জেগে ওঠে। ফলে তারা ১০০5 হিজরিতে (১৫৯৬ খ্রিষ্টাব্দে) সংঘটিত কিরজিত যুদ্ধে হাঙ্গেরি ও অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়।

বিদ্রোহ দমন

কিরজিত যুদ্ধে একদল উসমানি সৈন্য দৃঢ় অবস্থান না নিয়ে পলায়ন করে। এ সকল পলায়নকারীদেরকে আনাতোলিয়ায় নির্বাসিত করা হয় এবং তাদেরকে ফেরারি নামকরণ করা হয়। এ উপাধিটি অপমান ও যন্ত্রণার নির্দেশক ছিল। যেন অন্য সৈন্যদের জন্য তা একপ্রকার শিক্ষা হতে পারে।

ফেরারিরা আনাতোলিয়ায় থাকাকালে কুরাহ ইয়াজেজি নামক জনৈক কমান্ডার দাবি করল যে, সে স্বপ্নে দেখেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন, সে উসমানিদের ওপর বিজয়ী হবে। অতঃপর সে গাজিয়ান্তেপ শহর দখল করে। কিন্তু উসমানিরা তাকে অবরুদ্ধ করলে আমসিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করার শর্তে সে গাজিয়ান্তেপ হস্তান্তরে রাজি হয়। উসমানিরা তার শর্তে সম্মত হয়। উসমানিরা এ অঞ্চল ত্যাগ করার কিছুদিন পর সে বিদ্রোহ করে বসে। উসমানিরা পুনরায় ফিরে এসে কুরাহ ইয়াজেজিকে পরাস্ত করে। এ যাত্রায় তার ভাই ইরাকের গভর্নর আলি হাসান তাকে সাহায্য করেছিল। যুদ্ধে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে সে মৃত্যুবরণ করে।

আলি হাসান সাকলি ১০১০ হিজরিতে (১৪০১ খ্রিষ্টাব্দে) হাসান পাশাকে পরাজিত করে হত্যা করে। অতঃপর রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি ঠেকাতে তাকে বসনিয়ার কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়। বসনিয়ার গভর্নর হয়ে সে ইউরোপীয়দের সাথে যুদ্ধ করা শুরু করে। কিন্তু যুদ্ধে টিকতে না পেরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

সাবাহ গোষ্ঠীর বিদ্রোহ

এ গোষ্ঠীটি ইতিপূর্বেও বিদ্রোহ করেছিল। সে সময় তারা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। পুনরায় তারা খলিফার নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। উসমানি বাহিনী তাদের ওপর চড়াও হয়ে তাদের বিদ্রোহ দমন করে।

খলিফা তৃতীয় মুহাম্মাদ ১০১২ হিজরিতে (১৬০৩ খ্রিষ্টাব্দে) মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর তার পুত্র প্রথম আহমাদ খলিফা নিযুক্ত হন।

খলিফা প্রথম আহমাদ
(১০১২-১০২৬ হি./১৬০৩-১৬১৭ খ্রি.)

খলিফা প্রথম আহমাদ চৌদ্দ বছর বয়সে খিলাফতের মসনদে আরোহণ করেন। তিনি তার ভাই মোস্তফাকে হত্যা না করে খাদিম-সেবকসহ বন্দি করে রাখেন।

উসমানি সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ আন্দোলন

প্রথম আহমাদের বয়স কম হওয়ায় তার যুগে অনেক বিদ্রোহী দল সৃষ্টি হয়। যেমন বুলাদ কুরদির আন্দোলন, আঙ্কারার গভর্নর কিলান্দর উগলির আন্দোলন ও ইজ্জুদ্দিন মুনির আন্দোলন। ইজ্জুদ্দিন মুনি ছিল দরজি বংশীয়। সে খ্রিষ্টান, নাসিরিয়াহ ও দরজিয়া[৫২] সম্প্রদায়কে তার দলভুক্ত করে। খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার পর খলিফা তাকে শাম দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের তদারকির দায়িত্ব দেন। এ সকল অঞ্চলের মাঝে লেবাননের পাহাড়ি অঞ্চল ও সিরিয়ার বিরাট একটি এলাকা রয়েছে। কিন্তু সে উসমানিদের শত্রু ইতালির সাথে একটি চুক্তি করে। যার মাধ্যমে চল্লিশ হাজার সৈন্য প্রস্তুত করতে তাদের আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করে। অতঃপর ১০২২ হিজরিতে উসমানিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

---

৫২. **দরজিয়া :** এটি একটি বাতেনিয়্যাহ ফেরকা। তাদের পৃষ্ঠপোষক ছিল ফাতেমীয় খলিফা আল-হাকিম বি-আমরিল্লাহ। তাদের আকিদা বিশ্বাসের সিংহভাগ শিয়া ইসমাইলিয়্যাহ মতবাদ থেকে অনুপ্রাণিত। নাশতাকিন আদ-দরজি নামক এক ব্যক্তির দিকে সম্বন্ধ করে তাদেরকে দরজি বলা হয়ে থাকে। তাদের উত্থান হয় মিশরে। পরে তারা সিরিয়ায় চলে যায়। -সম্পাদক

উসমানিরা তাকে পরাজিত করতে সমর্থ হয়। পরাজিত হওয়ার পর সে ইতালিতে পলায়ন করে।

ধূমপানের প্রসার

হল্যান্ডের নাগরিকদের মাধ্যমে ধূমপানের বিস্তৃতি ঘটে। সৈন্যরা ব্যাপকহারে ধূমপানে আসক্ত হয়ে পড়ে। সাম্রাজ্যের মুফতি ধূমপান হতে বিরত থাকার ফতোয়া দিলে সেনাবাহিনীর মাঝে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তাদের সাথে কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও যোগ দেয়। অবশেষে চাপের মুখে খলিফা ধূমপানের বৈধতা দিতে বাধ্য হন।

সাফাভিদের সম্মুখ হতে পিছু হটা

প্রধানমন্ত্রী মুরাদ পাশার মৃত্যুর পর উসমানি সাম্রাজ্যে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার সুযোগে সাফাভি শাসক শাহ আব্বাস তাবরিজ, উত্তর ইরাক ও অন্যান্য হারানো অঞ্চল পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। উসমানিরা বাধ্য হয়ে ৯২১ হিজরিতে (১৫১৫ খ্রিষ্টাব্দে) সাফাভিদের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। চুক্তি মোতাবেক সুলতান সুলাইমান কানুনির যুগ হতে তাদের যে-সকল অঞ্চল উসমানি সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত করে নেওয়া হয়েছে তা উসমানিরা সাফাভিদেরকে ছেড়ে দেয়।

ইউরোপে উসমানিদের কার্যক্রম

উসমানিরা ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের সাথে চুক্তি নবায়ন করে। হল্যান্ডও এ চুক্তির সুবিধা ভোগ করে। অনুরূপ ১০১৫ হিজরিতে (১৬০৬ খ্রিষ্টাব্দে) অস্ট্রিয়ার সাথেও একটি চুক্তি সম্পাদন করে। চুক্তি মোতাবেক বাৎসরিক কর প্রদানের পরিবর্তে অস্ট্রিয়া এককালীন দুই লাখ দোকা (অস্ট্রিয়ান মুদ্রা) পরিশোধ করবে।

হল্যান্ডের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি মোতাবেক উসমানিরা ক্রিমিয়ার তাতারদের আক্রমণ হতে হল্যান্ডকে রক্ষা করবে আর হল্যান্ড ককেশাসের আক্রমণ হতে উসমানি সাম্রাজ্যকে রক্ষা করবে।

উসমানিগণ ও ইউরোপীয়দের মাঝে বহু সামুদ্রিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বিজয় ইউরোপের মিত্ররূপ ধারণ করে। ফলে উসমানিরা ভূমধ্য সাগরে খ্রিষ্টান নৌবহর ঠেকাতে কৃষ্ণসাগরের নৌবহর তুলে নেয়। ককেশাসীয়রা এ সুযোগে কৃষ্ণসাগর-তীরের সিনোপ বন্দরে আগ্রাসন চালায়। এদিকে

খলিফা ও প্রধানমন্ত্রী নুসুহ পাশার মাঝে তীব্র দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। এর ফলে প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করা হয়।

সুলতান প্রথম আহমাদ ১০২৬ হিজরিতে (১৬১৭ খ্রিষ্টাব্দে) ২৮ বছর বয়সে ইনতেকাল করেন। তার ছেলে বয়সে ছোট হওয়ায় ভাই মোস্তফা খলিফার পদ অলংকৃত করেন।

খলিফা প্রথম মোস্তফা

(১০২৬-১০২৭ হি./১৬১৭-১৬১৮ খ্রি.)

প্রথম মোস্তফা ভাইয়ের মৃত্যুর পর খাদিমসহ বন্দিদশা হতে মুক্ত হয়ে আসেন। ক্ষমতা কী জিনিস তা বোঝার আগেই মাত্র তিন মাসের মাথায় তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। অতঃপর ১০২৭ হিজরিতে (১৬১৮ খ্রিষ্টাব্দে) তার ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিতীয় উসমান খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

খলিফা দ্বিতীয় উসমান

(১০২৭-১০৩১ হি./১৬১৮-১৬২২ খ্রি.)

দ্বিতীয় উসমান তেরো বছর বয়সে ক্ষমতায় আরোহণ করেন এবং রীতি অনুযায়ী স্বীয় ভাই মুহাম্মাদকে হত্যা করেন। দ্বিতীয় উসমান ইতালিতে নির্বাসিত ফখরুদ্দিন মুনিকে ক্ষমা করেন এবং স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেন। সে লেবানন হিলে ফিরে এসে আগের মতো পুনঃবিদ্রোহ করে বসে।

ইতালির অঙ্গরাজ্য পোল্যান্ডের সাথে উসমানিদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অতঃপর পোল্যান্ড শান্তিচুক্তি করতে চাইলে ১০২৯ হিজরিতে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়।

অতঃপর জেনিসারি বাহিনী যুদ্ধে ব্যর্থ প্রমাণিত হওয়ার পর খলিফা তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাদের পরিবর্তে নতুন প্রশিক্ষিত সৈন্য সংগ্রহ করতে চাইলেন। এতে সেনারা বিদ্রোহ করে বসে এবং তাকে হত্যা করে। তারা খলিফার চাচা মোস্তফাকে পুনরায় ১০৩১ হিজরিতে খলিফা নিযুক্ত করে। জেনিসারিদের হাতে খলিফা হত্যার ঘটনা এই

প্রথম। জেনিসারিদের ক্ষমতা কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল এতে তা অনুমান করা যায়।

দ্বিতীয় উসমানের হত্যার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে উসমানি সাম্রাজ্যে নৈরাজ্য দেখা দেয়। গভর্নরগণ স্ব স্ব প্রদেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করা শুরু করে। এমতাবস্থায় প্রধানমন্ত্রী মুইনের পরামর্শে সেনারা প্রথম মোস্তফাকে অপসারণ করে তার ভাই চতুর্থ মুরাদকে ১০৩২ হিজরিতে খলিফা নিয়োজিত করে।

খলিফা চতুর্থ মুরাদ

(১০৩২-১০৪৯ হি./১৬২৩-১৬৪০ খ্রি.)

চতুর্থ মুরাদ খলিফা প্রথম আহমাদের ছেলে। চৌদ্দ বছরেরও কম বয়সে তিনি ক্ষমতায় আরোহণ করেন।

অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম

আবাজা পাশার বিদ্রোহ

এক বিশৃঙ্খল পরিবেশে খলিফা চতুর্থ মুরাদ খলিফার আসনে বসেন। সে সময়ের অন্যতম ঘটনা রোমের গভর্নর আবাজা পাশার বিদ্রোহ। সে আঙ্কারা ও সিভাসে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। এদিকে খলিফার বয়স কম হওয়ার সুযোগ নিয়ে জেনিসারি সদস্যরা দাপট দেখাতে শুরু করে। তখন সাম্রাজ্যের পুরো দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রী আহমাদ পাশার ওপর বর্তায়। আহমাদ পাশা ১০৩৩ হিজরিতে (১৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে) কায়সেরির[৫৩] যুদ্ধে আবাজা পাশাকে পরাস্ত করে বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হন। পরবর্তী সময়ে খসরু পাশা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার পর আবাজা পাশা পুনঃবিদ্রোহ করেন। খসরু পাশা তাকে বশ করতে সক্ষম হন এবং ১০৩৭ হিজরিতে (১৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে) তাকে বসনিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করেন।

---

৫৩. কায়সেরি : তুরস্কের মধ্য আনাতোলিয়ার অন্তর্গত বৃহৎ শিল্পনগরী। -সম্পাদক

জেনিসারি সেনাবাহিনীর বিদ্রোহ

সাফাভি রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধ চলাকালে উসমানি জেনিসারি সেনাদের মাঝে বিদ্রোহ দেখা দেয়। খলিফা ফিতনাবাজ সেনাদেরকে হত্যা করে বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হন।

ফখরুদ্দিন মুনির পুনঃবিদ্রোহ

ফখরুদ্দিন স্থিতিশীল হওয়ার পর উসমানি সাম্রাজ্যের চলমান বিশৃঙ্খলাকে সুযোগ মনে করে এবং নতুন করে বিদ্রোহ করে বসে। অতঃপর দামেশকের গভর্নর তার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন এবং তাকে ও তার দুই ছেলেকে বন্দি করে খলিফার দরবারে প্রেরণ করেন। ফখরুদ্দিন ক্রুসেডারদেরকে বারংবার সহযোগিতা করার মাধ্যমে বিশ্বাসঘাতকতা করা সত্ত্বেও খলিফা তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করেন। কিন্তু ফখরুদ্দিনের নাতি কুরকুমাজ বিদ্রোহ ঘোষণা করার পর খলিফা ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন এবং ফখরুদ্দিন ও তার বড় ছেলেকে হত্যা করে কুরকুমাজের বিদ্রোহ দমন করেন।

সাফাভিদের সাথে যুদ্ধ

বাগদাদের পুলিশপ্রধান বুকাইর আগা বাগদাদের গভর্নরকে হত্যা করে। প্রধানমন্ত্রী হাফিজ পাশা তাকে অবরুদ্ধ করেন। কিন্তু সে সাফাভি শাসক শাহ আব্বাসের সাহায্য প্রার্থনা করে এবং তার নিকট শহর সমর্পণের প্রস্তাব করে। একই সময় সে প্রধানমন্ত্রীর নিকটও শহর সমর্পণের প্রস্তাব পেশ করে এবং গভর্নর পদ দাবি করে। শাহ আব্বাসের সেনারা বাগদাদে পৌঁছার পূর্বেই উসমানি প্রধানমন্ত্রী বাগদাদে প্রবেশ করেন। অতঃপর শাহ আব্বাস এসে তিন মাস বাগদাদ অবরোধ করে রাখে। সে বুকাইরের পুত্রের নিকট তাকে গভর্নর রাখার শর্তে শহর হস্তান্তরের প্রস্তাব দিলে বুকাইরপুত্র উসমানিদের সঙ্গে গাদ্দারি করে এবং আব্বাসের নিকট শহর হস্তান্তর করে। শাহের বাহিনী বাগদাদ প্রবেশ করে বুকাইর আগা ও তার ছেলেকে হত্যা করে। কারণ, সে বুঝতে পেরেছে যে, তারা দুজনই বিশ্বাসঘাতক। তাই তাদের ওপর বিশ্বাস রাখা যায় না।

প্রধানমন্ত্রী হাফিজ পাশা বাগদাদ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু তার বাহিনী যুদ্ধে যেতে রাজি না হওয়ায় খলিফা তাকে বরখাস্ত করেন। পরবর্তী সময়ে শাহ আব্বাস ১০৩৮ হিজরিতে (১৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে) মৃত্যুবরণ

করার পর তার ছোট ছেলে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী খসরু পাশা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। তিনি ১০৩৯ হিজরিতে (১৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে) হামাদান পুনরুদ্ধার করেন। তিনি দু-দুবার বাগদাদ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।

- এরপর খলিফা স্বয়ং নিজেই সাফাভিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বের হন। খলিফার অনুপস্থিতিতে তার দুই ভাই বায়েজিদ ও সুলাইমান বিদ্রোহ করার আশঙ্কা থেকে খলিফা তাদেরকে হত্যা করার আদেশ দেন।
- ১০৪৫ হিজরিতে (১৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দে) খলিফা তাবরিজ শহরে প্রবেশ করেন। তিনি কিছু দুর্গ পুনরুদ্ধার করে ইস্তাম্বুলে ফিরে আসেন। সাফাভিরা এই সুযোগে দুর্গগুলো পুনর্দখল করে নেয়। পরবর্তী সময়ে খলিফা পুনরায় তাদের বিরুদ্ধে অভিযানে বের হন এবং ১০৪৮ হিজরিতে (১৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দে) বাগদাদে প্রবেশ করতে সক্ষম হন। ১০৪৯ হিজরিতে (১৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দে) উভয় দেশের মাঝে একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়। এ বছরই খলিফা মৃত্যুবরণ করেন।

খলিফা প্রথম ইবরাহিম

(১০৪৯-১০৫৮হি./১৬৪০-১৬৪৮ খ্রি.)

খলিফা প্রথম ইবরাহিম তার ভাই চতুর্থ মুরাদের পর খলিফা নিযুক্ত হন।

ইউরোপে উসমানিদের কার্যক্রম

ককেশাস ও উসমানিদের মাঝে নতুন করে যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। ককেশাস বাহিনী কৃষ্ণসাগরের উত্তর উপকূলীয় আজভ শহর দখল করে নিতে সক্ষম হয়। পরবর্তী সময়ে উসমানিরা ১০৫২ হিজরিতে (১৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে) তা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন।

ক্রিট দ্বীপ বিজয়

ভেনিসের অধীনে থাকা ক্রিট দ্বীপ জয়ের জন্য উসমানিরা নৌবহর প্রস্তুত করে এবং ১০৫৫ হিজরিতে (১৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দে) তা জয় করতে সক্ষম হয়। ভেনিসের নৌবহর পৌঁছতে না পারার কারণে তারা খুব সহজে এই শহরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। এই জন্য ভেনিসীয়রা ক্রুদ্ধ হয়ে উসমানিদের অনেকগুলো বন্দর পুড়িয়ে দেয়। খলিফা তার দেশের খ্রিষ্টানদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের অভিপ্রায় প্রকাশ করলে সাম্রাজ্যের মুফতি তার বিরোধিতা করে। খলিফা মুফতির মতামত মেনে নেন।

পরবর্তী সময়ে জেনিসারি বাহিনীর বাড়াবাড়ি ও বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পেলে খলিফা তাদের শায়েস্তা করার সিদ্ধান্ত নেন। সৈন্যরা এ সংবাদ জানার পর খলিফাকে অপসারণ করে তদস্থলে খলিফার সাত বছরের ছেলে চতুর্থ মুহাম্মাদকে স্থলাভিষিক্ত করে। এই ঘটনা ১০৫৮ হিজরিতে (১৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দে) সংঘটিত হয়। খলিফা পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসতে পারে এই আশঙ্কায় জেনিসারি বাহিনীর সৈন্যরা খলিফাকে হত্যা করে।

খলিফা চতুর্থ মুহাম্মাদ

(১০৫৮-১০৯৯ হি./১৬৪৮-১৬৮৭ খ্রি.)

অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম

খলিফার বয়স কম হওয়ায় সাম্রাজের চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়ে। প্রধানমন্ত্রী তার পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। ইতিপূর্বে উসমানিরা ক্রিট আইল্যান্ড অবরোধ করেছিল। দেশের অভ্যন্তরে সৈন্যদের বিশৃঙ্খলার কারণে প্রধানমন্ত্রী হুসাইন পাশা ক্রিট আইল্যান্ডের কিন্দিয়া শহরের ওপর আরোপিত অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হন।

কাতারজি উগলির বিদ্রোহ

১০৫৯ হিজরিতে (১৬৪৯ খ্রিষ্টাব্দে) কাতারজি উগলি আনাতোলিয়ায় বিদ্রোহ করে বসে। এই বিদ্রোহে কুরজি ইয়ানি তাকে সাহায্য করেন। উভয়ে মিলে আনাতোলিয়ায় গভর্নর আহমাদ পাশাকে পরাজিত করে। অতঃপর তারা ইস্তাম্বুল দখলের উদ্দেশ্যে বের হয়। পথিমধ্যে উভয়ের মাঝে বিরোধ দেখা দেয়। এই সুযোগে উসমানি বাহিনী তাদেরকে পরাজিত করে। যুদ্ধে কুরজি নিহত হয়। আর কাতারজি উগলি ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাকে ক্ষমা করা হয় এবং কিরমানের অধিকর্তা নিয়োজিত করা হয়।

ইউরোপে যুদ্ধ

দার্দানেলিস প্রণালির মুখ্য নিয়ন্ত্রক তাইদানুস ও লাইমানুস আইল্যান্ড দুটি উসমানি নৌবহরের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ভেনিসের নৌবহর উসমানি নৌবহরের ওপর আক্রমণ চালিয়ে দ্বীপ দুটি দখল নিতে সমর্থ হয়। যার কারণে খাদ্যবাহী জাহাজগুলো ইস্তাম্বুলে এসে পৌঁছতে পারেনি। এ কারণে সে সময় বাজারে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রীর পদে মুহাম্মাদ কুবরিলি

উসমানি সাম্রাজ্যের ইতিহাসে প্রধানমন্ত্রীর পদে যারা আসীন ছিলেন, তাদের মাঝে মুহাম্মাদ কুবরিলি, তার সন্তান ও বংশধরদের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বিষয়টি সবচেয়ে বেশি আলোচিত। তাদের এরূপ ক্ষমতা লাভের

কারণ হলো, ইউরোপে যুদ্ধ পরিচালনা এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষেত্রে তাদের পরম ভূমিকা ছিল।

১০৬৭ হিজরিতে (১৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে) কুবরিলি দায়িত্ব গ্রহণ করেই অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণে রাখার কাজ শুরু করে দেন। তিনি জেনিসারি বাহিনীকে সমুচিত শিক্ষা দেন এবং তাদের অনেককেই হত্যা করেন। দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অন্যতম নায়ক পোপ প্যাট্রিয়াককে হত্যা করেন। অতঃপর অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি স্থিতিশীলতা লাভ করে। এর মধ্য দিয়ে তিনি ইউরোপে অভিযান চালানোর সুযোগ লাভ করেন। প্রথম পদক্ষেপে তিনি সেসব আইল্যান্ড ও বন্দর মুক্ত করেন, যা ভেনিস বাহিনী দখল করে রেখেছিল।

ট্রান্সসিলভানিয়া, ওয়ালাচিয়া ও মোলদাভিয়ার শাসকদের বিদ্রোহ

সুইডেন ও পোল্যান্ডের মাঝে যুদ্ধ চলাকালে সুইডেন উসমানিদের কাছে এ মর্মে সাহায্যের প্রস্তাব করে যে, উসমানিরা পোল্যান্ডে ব্যাপক অভিযান চালানোর সুযোগ লাভ করবে। কিন্তু মুহাম্মাদ কুবরিলি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তবে সুইডেন ওয়ালাচিয়া, মোলদাভিয়ার ও ট্রান্সলিভানিয়ার শাসকদেরকে পক্ষে টানতে সমর্থ হয়। এজন্য প্রধানমন্ত্রী ক্ষুদ্ধ হয়ে এতদঞ্চলের শাসকদেরকে বরখাস্ত করেন। প্রতিবাদে বরখাস্ত হওয়া ট্রান্সসিলভানিয়ার শাসক উসমানিদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। প্রধানমন্ত্রী দ্রুততার সাথে পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাকে পরাভূত করেন। তারপর ওয়ালাচিয়ার আমিরও বিরোধিতার চেষ্টা করলে প্রধানমন্ত্রী তাকে নতি স্বীকার করতে বাধ্য করেন।

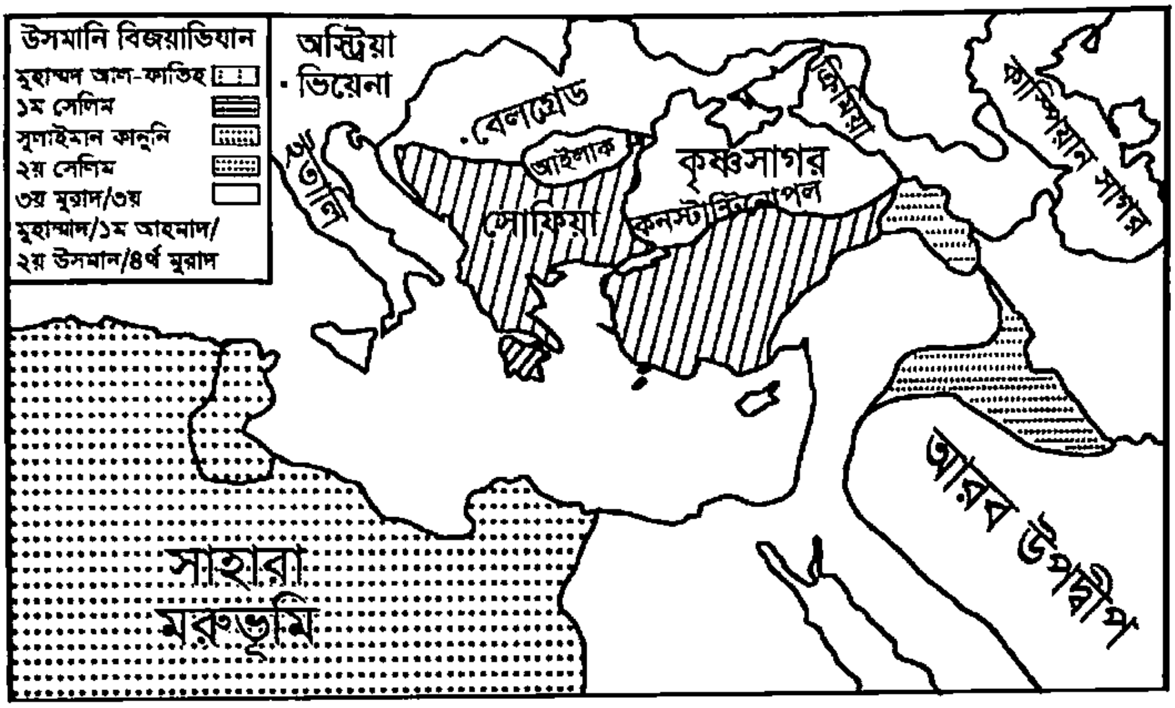
প্রধানমন্ত্রী পদে আহমাদ কুবরিলি

প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মাদ কুবরিলি ১০৭২ হিজরিতে (১৬৬২ খ্রিষ্টাব্দে) ইনতেকাল করার পর তার ছেলে আহমাদ কুবরিলি প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন। তিনি তার পিতার মতোই রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা রক্ষায় নিয়োজিত হন।

উসমানিদের নতুন নতুন বিজয়াভিযান

অস্ট্রিয়া ও ভেনিস উসমানিদের সাথে শান্তিচুক্তির প্রস্তাব করলে আহমাদ কুবরিলি তা প্রত্যাখ্যান করেন। প্রধানমন্ত্রী অস্ট্রিয়ার ভূমিতে প্রবেশ করতে সক্ষম হন এবং নুহাজাল নামক প্রসিদ্ধ দুর্গ জয় করতে সক্ষম হন। এভাবে

তার বিজয়াভিয়ান অব্যাহত থাকে। চেকপ্রজাতন্ত্র ও স্লোভাকিয়ার মাঝে অবস্থিত মোরাগিয়া ও পোল্যান্ডের সিনজিয়া অঞ্চল দখলে নিতে তিনি সক্ষম হন।



মানচিত্র নং-২৩
সম্প্রসারণের সর্বোচ্চ শিখরে উসমানি সাম্রাজ্য

ফ্রান্সের সাথে সম্পর্কের অবনতি

ফরাসিরা ক্রিট দ্বীপের ব্যাপারে ভেনিসকে সহযোগিতা করলে উসমানিদের সাথে ফ্রান্সের সম্পর্কে ফাটল ধরে। অতঃপর অস্ট্রিয়ার সাথে যুদ্ধ চলাকালে সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটে। উসমানিদের সাথে ধারাবাহিক পরাজয় বরণের পর অস্ট্রিয়া পোপের সাহায্য চায়। পোপ অস্ট্রিয়ার ডাকে সাড়া দেয় এবং ফ্রান্স তাদের সাহায্যে ছয় হাজার সৈন্য প্রেরণ করে।

উভয় দেশের মাঝে বেশকিছু যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং উভয় দেশই জয়-পরাজয়ের মুখোমুখি হয়। পরিশেষে উসমানিদের সাথে অস্ট্রিয়ার চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তির বর্ণনা মতে, হাঙ্গেরি উভয় দেশের মাঝে বণ্টিত হবে। এ চুক্তির পরও উত্তর আফ্রিকার বন্দরসমূহের ওপর ফরাসি জলদস্যুরা আক্রমণ অব্যাহত রাখে। এমনকি তারা মুসলমানদের জাহাজসমূহের ওপরও আক্রমণ করত।

পরবর্তী সময়ে ফ্রান্স উসমানিদের সাথে চুক্তি নবায়নের চেষ্টা করে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আহমাদ কুবরিলি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। উসমানিদের

সাথে যুদ্ধ করার জন্য ফ্রান্স নৌবহর প্রেরণের চেষ্টা করলে চুক্তি প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি আরও জোরালো হয়। অতঃপর ফ্রান্সের জনৈক মন্ত্রী উসমানিদের সাথে নমনীয়তা অবলম্বন করার জন্য রাজার প্রতি আহ্বান জানান। রাজা মন্ত্রীর প্রস্তাবমতো কোমল রাজনীতি শুরু করলে উভয় দেশের মাঝে ১০৮৪ হিজরিতে (১৬৭৩ খ্রিষ্টাব্দে) নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং উভয় দেশের মাঝে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকে।

পোল্যান্ডের সাথে যুদ্ধ

ককেশাস অঞ্চল উসমানিদের অধীনে চলে আসার ঘোষণা দিলে পোল্যান্ড ক্ষুব্ধ হয় এবং তারা ককেশাস অঞ্চলে আক্রমণ করে বসে (বর্তমান ইউক্রেনের অধিকাংশ অঞ্চল ককেশাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল)। এতে খলিফা নিজেই সৈন্যদের নিয়ে পোল্যান্ডের সাথে যুদ্ধ করেন এবং পোল্যান্ডকে পরাজিত করেন। পরবর্তী সময়ে পোল্যান্ড নতুন করে চুক্তির প্রস্তাব করে। তাদের প্রস্তাব অনুযায়ী ১০৮৩ হিজরিতে (১৬৭২ খ্রিষ্টাব্দে) দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তির শর্তানুযায়ী ইউক্রেনের পশ্চিমাঞ্চলীয় বোদোলিয়া অঞ্চল উসমানি সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত হবে এবং ইউক্রেনের অবশিষ্টাংশ ককেশাসের অধীনে চলে যাবে। আর পোল্যান্ড ২,২০,০০০ ভেনিসীয় স্বর্ণমুদ্রা বার্ষিক কর প্রদান করবে। পোল্যান্ডের জনগণ তাদের এ চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে। তাদের নেতা সুবেসকি উসমানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বের হয় এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিজয় অর্জনে সক্ষম হয়। অবশেষে পোল্যান্ড ও উসমানিদের মাঝে আরেকটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। পূর্ববর্তী চুক্তিতে উসমানিদের জন্য যে অঞ্চল বরাদ্দ ছিল, তার মধ্য হতে কতিপয় শহর বাদ দিয়ে অন্যান্য অঞ্চল উসমানিদের জন্য রাখার কথা বলা হয়। এই চুক্তিটি ১০৮৭ হিজরিতে (১৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দে) সংঘটিত হয়। পরবর্তী সময়ে সুবেসকি পোল্যান্ডের রাজা হওয়ার পর উসমানিদের সাথে আলাপ-আলোচনা অব্যাহত রাখে।

১০৮৭ হিজরিতে (১৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দে) প্রধানমন্ত্রী আহমাদ কুবরিলি মৃত্যুবরণ করেন। তার স্থলে তার জামাতা কাররা মোস্তফা স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু তিনি পূর্বসূরিদের মতো যোগ্য ছিলেন না। দেশের স্বার্থ বাদ দিয়ে ব্যক্তিস্বার্থকে তিনি প্রাধান্য দেন। ক্ষমতায় এসে তিনি দেখতে পান যে, ককেশাসীয়রা উসমানিদের বিপক্ষে রাশিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করছে। তারা ১০৮৮ হিজরিতে (১৬৭৭ খ্রিষ্টাব্দে) উসমানিদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়,

যা ১০৯২ হিজরি (১৬৮১ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অতঃপর উভয় পক্ষ যুদ্ধপূর্ব অবস্থায় ফিরে যেতে রাদজাইন চুক্তি সম্পাদন করেন। উভয় পক্ষের মাঝে চুক্তি সম্পাদিত হলেও ককেশাসীয়রা উসমানিদেরকে অপছন্দ করে ক্রমান্বয়ে রাশিয়ানদের প্রতি ঝুঁকতে থাকে।

অস্ট্রিয়ার সাথে নতুন করে যুদ্ধ

১০৯২ হিজরিতে অস্ট্রিয়ার সাথে বেশ কয়েকবার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কাররা মোস্তফা বড় আকারে যুদ্ধ শুরু করলেও তা বামনের ন্যায় খাটো হয়ে আসে। এই যুদ্ধ উসমানি সাম্রাজ্যের জন্য মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনে। প্রাথমিক পর্যায়ে উসমানিরা ব্যাপক বিজয় লাভ করে। তারা দ্বিতীয়বারের মতো ভিয়েনায় পৌঁছতে এবং তা অবরোধ করতে সক্ষম হয়। ইতিপূর্বে খলিফা সুলাইমান কানুনি ভিয়েনা অবরোধ করেছিলেন।

কাররা মোস্তফা অস্ট্রিয়ায় বিজিত অঞ্চলে নিরাপত্তার ব্যাপারে সজাগ ছিলেন না। তিনি ভিয়েনা জয়ের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু ইউরোপ তাকে লক্ষ্যপানে পৌঁছতে সুযোগ দিতে চায়নি। তাই পোপ অস্ট্রিয়ার সাহায্যে এগিয়ে আসতে ইউরোপের প্রতি আহ্বান জানায়। অতঃপর উসমানিরা ভিয়েনার কাছাকাছি পৌঁছতেই ইউরোপীয় বাহিনী তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সুবেসকি পোপের নির্দেশে উসমানিদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে যুদ্ধের নেতৃত্ব দেয়। তাকে সহযোগিতা করে জার্মান স্টেটস, জাখসেন ও বায়ার্ন। সাহসিকতার সাথে মুসলমানগণ যুদ্ধ চালিয়ে গেলেও উসমানিরা টিকতে না পেরে সৈন্য ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। সুবেসকি পেছন থেকে মুসলিম বাহিনীর যাকেই হাতের কাছে পেয়েছে তাকেই হত্যা করেছে।

উসমানিদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডারদের জোট

খলিফা উসমানিদের পরাজয়ের সংবাদ জানার পর কাররা মোস্তফাকে মৃত্যুদণ্ড দেন এবং তদস্থলে ইবরাহিম পাশাকে স্থলাভিষিক্ত করেন। সে সময় ইউরোপ বিজয়ের আনন্দে ভাসছে। ভেনিস, অস্ট্রিয়া, হল্যান্ড, রাশিয়া ও মাল্টার পোপ সম্প্রদায় পোপের নেতৃত্বে উসমানিদেরকে পৃথিবী থেকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে ক্রুসেড জোট গঠন করে।

অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরি ফ্রন্টে আক্রমণ করে পেস্ট নগর দখল করে এবং হাঙ্গেরিতে প্রবেশ করে বিশাল অঞ্চল তার দেশের সাথে যুক্ত করে নেয়।

তারা ১০৯৭ হিজরিতে (১৬৮৬ খ্রিষ্টাব্দে) বুদা নগরী দখলে নিতে সক্ষম হয়। উসমানিরা এই নগরী হাতছাড়া করার পর দ্বিতীয়বার আর দখল করতে সক্ষম হয়নি। অনুরূপভাবে অস্ট্রিয়া সিলভানিয়া ও ক্রোয়েশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল দখলে নিতে সক্ষম হয়। একই সময়ে হল্যান্ড সুবেসকির নেতৃত্বে মোলদাভিয়ার ওপর আক্রমণ চালায়। এদিকে ভেনিস ও মাল্টার পোপেরা নৌবহরের সাহায্যে মুরা দ্বীপের বিভিন্ন শহর দখল করতে সক্ষম হয়। দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়লে আলেমগণ ও দ্বিতীয় মন্ত্রী পরামর্শ করে খলিফা চতুর্থ মুহাম্মাদকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। তারা ১০৯৯ হিজরিতে (১৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দে) খলিফাকে বরখাস্ত করে তার ভাই দ্বিতীয় সুলাইমানকে খলিফা নিযুক্ত করেন।

খলিফা দ্বিতীয় সুলাইমান

(১০৯৯-১১০২ হি./১৬৮৭-১৬৯১ খ্রি.)

অভ্যন্তরীণ বিষয়

খলিফা চতুর্থ মুহাম্মাদকে অপসারণের পর সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। জেনিসারি সৈন্যরা রাষ্ট্রীয় কাজে প্রভাব বিস্তার বাড়িয়ে দেয়। তারা প্রধানমন্ত্রী সিয়াবিস পাশাকে হত্যা করে। সে সময় তারা খলিফা-পরিবারের সকলকে বন্দি করলেও খলিফা কোনোরূপ প্রতিবাদ গড়ে তুলতে পারেননি।

বহিরাগত কার্যক্রম

উসমানি সাম্রাজ্যের একের পর এক পতন অব্যাহত থাকে। অস্ট্রিয়া ১০৯৯ থেকে ১১০০ হিজরির (১৬১০-১৬৮১ খ্রিষ্টাব্দের) মাঝে বেলগ্রেড ও সার্বিয়াসহ বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে নেয়। এদিকে ভেনিস অগ্রসর হতে থাকে এবং ক্রোয়েশিয়া, দালমাতিয়া ও মুরার বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে নেয়।

মোস্তফা কুবরিলির প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ

যুদ্ধে অসাধারণ ভূমিকা পালনকারী কুবরিলি বংশের সন্তান মোস্তফা পাশা প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন। তিনি উসমানি সাম্রাজ্যের হারানো গৌরব ফেরাতে যথাসময়ে আগমন করেন। প্রথমে তিনি অভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধন করেন। নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী জেনিসারিদের হাত থেকে পরিবারকে রক্ষা করেন। ইস্তাম্বুলে বসবাসরত খ্রিষ্টানদের সাথে সদ্ব্যবহার করে তাদের ভালোবাসা অর্জন করেন। অর্থোডক্স খ্রিষ্টানগণ ভেনিস বাহিনীকে তাদের মাতৃভূমি মুরা থেকে বিতাড়িত করে। কারণ, তারা তাদের ওপর ক্যাথলিক মতবাদ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছিল। উসমানিরা কারও ওপর কোনো ধরনের মতবাদ চাপিয়ে না দেওয়ার কারণে তাদের রক্ষায় অর্থোডক্স খ্রিষ্টানরা এগিয়ে আসে।

মোস্তফা কুবরিলি তার পিতা মুহাম্মাদ কুবরিলির পথ অনুসরণ করে ১১০১ হিজরিতে (১৬৯০ খ্রিষ্টাব্দে) বেলগ্রেড পুনরুদ্ধারে সক্ষম হন। উসমানি সেনাপতিরা সার্বিয়া অঞ্চলের বিদ্রোহ দমন করে সিলভানিয়া পুনরুদ্ধার

করেন। অতঃপর ১১০২ হিজরিতে (১৬৯১ খ্রিষ্টাব্দে) খলিফা মৃত্যুবরণ করলে তার ভাই দ্বিতীয় আহমাদ খলিফা নিযুক্ত হন। উল্লেখ্য যে, খলিফা সুলাইমান নিঃসন্তান ছিলেন।

খলিফা দ্বিতীয় আহমাদ

(১১০২-১১০৬ হি./১৬৯১-১৬৯৫ খ্রি.)

খলিফা দ্বিতীয় আহমাদের শাসনকাল চার বছরের বেশি স্থায়ী হয়নি। এ সময়ে অস্ট্রিয়ার সাথে যুদ্ধে মোস্তফা কুবরিলি শাহাদাত বরণ করেন। তার পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী অরবাজি পাশা তার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন না। ভেনিস বাহিনী এজিয়ান সাগরের বুকে অবস্থিত সাগস দ্বীপ দখল করে নেয়। অতঃপর খলিফা দ্বিতীয় আহমাদ ১১০৬ হিজরিতে (১৬৯৫ খ্রিষ্টাব্দে) ইনতেকাল করলে দ্বিতীয় মোস্তফা খলিফা হিসেবে নিযুক্ত হন।

খলিফা দ্বিতীয় মোস্তফা

(১১০৬-১১১৫ হি./১৬৯৫-১৭০৩ খ্রি.)

ইউরোপের সাথে ধারাবাহিক যুদ্ধ

খলিফা দ্বিতীয় মোস্তফা বীরত্ব ও সাহসিকতার গুণে গুণান্বিত ছিলেন। পোল্যান্ডের সাথে যুদ্ধে নিজেই সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেন। ককেশাসীয় যোদ্ধাদের সহযোগিতায় তিনি তাদের ওপর বিজয় লাভ করেন। রুশ সম্রাট গ্রেট পিটার কৃষ্ণসাগরে পৌঁছার জন্য একটি প্রণালি পথ সৃষ্টি করতে আজভ শহরকে অবরুদ্ধ করে রাখে। খলিফা ১১০৭ হিজরিতে (১৬৯২ খ্রিষ্টাব্দে) এই শহরের অবরোধ তুলে নিতে রুশ সম্রাটকে বাধ্য করেন। খলিফা অস্ট্রিয়ার সাথে যুদ্ধ করতে হাঙ্গেরি অভিমুখে রওনা হন এবং তাদের ওপর বিজয় লাভ করেন।

উসমানি সৈন্যরা তিসা নদী পার হওয়ার সময় অস্ট্রীয় সেনাপ্রধান (ইউগেন দি সেভুই) তাদের প্রতি অকস্মাৎ আক্রমণ করে বসে। সে উসমানিদের পরাজিত করতে সক্ষম হয়। সৈন্যদের অনেকেই নদীতে ডুবে মারা যায়। ইউগেন তাদের পিছু নিয়ে তাড়া করতে থাকে। কিন্তু খলিফা বসনিয়া ভূখণ্ডে প্রবেশ করে অবশিষ্ট সৈন্যদের রক্ষা করতে সক্ষম

হন। সে সময় রুশ সম্রাট গ্রেট পিটার সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে ১১০৮ হিজরিতে (১৬৯৭ খ্রিষ্টাব্দে) আজভ শহর দখল করে নেয়। উসমানিদের অব্যাহত পরাজয়ের মাঝে হুসাইন কুবরিলি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি অস্ট্রিয়ানদের বিরুদ্ধে জয় লাভ করেন। তাদেরকে বসনিয়া থেকে হটিয়ে এজিয়ান সাগরের বেশকিছু দ্বীপ পুনরুদ্ধার করেন।

কার্লোফিটস চুক্তি

ইউরোপীয় জোট গঠিত হওয়ার পর ১১১০ হিজরিতে (১৬৯৯ খ্রিষ্টাব্দে) উসমানিরা ফ্রান্সের মধ্যস্থতায় কার্লোফিটস চুক্তি সম্পাদন করতে বাধ্য হয়। চুক্তি মোতাবেক তারা নিম্নোক্ত অঞ্চলসমূহ ত্যাগ করে।

১. আজভ শহর রাশিয়াকে ছেড়ে দেয়।

২. হাঙ্গেরির অবশিষ্ট ভূমি অস্ট্রিয়াকে ছেড়ে দেয় এবং এ দেশটির সাথে ২৫ বছর মেয়াদি শান্তিচুক্তি করে।

৩. ইউক্রেন ও পোদোলিয়া পোল্যান্ডকে প্রদান করে।

৪. দালমাতিয়া উপকূল এবং এজিয়ান সাগরের কিছু দ্বীপ ভেনিসকে ছেড়ে দেয়।

প্রধানমন্ত্রী হুসাইন কুবরিলি এই চুক্তির কারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ১১১৪ হিজরিতে (১৭০২ খ্রিষ্টাব্দে) পদত্যাগপত্র পেশ করেন। সাম্রাজ্যের জেনিসারি বাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ১১১৫ হিজরিতে (১৭০৩ খ্রিষ্টাব্দে) খলিফাকে অপসারণ করে। তৎস্থলে তৃতীয় আহমাদ খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

খলিফা তৃতীয় আহমাদ

(১১১৫-১১৪৩ হি./১৭০৩-১৭৩০ খ্রি.)

খলিফা তৃতীয় আহমাদ বিশৃঙ্খল জেনিসারি বাহিনীকে প্ররোচিত করতে সফল হন। তাদের দাবি অনুযায়ী তিনি মুফতি ফয়জুল্লাহকে[৫৪] হত্যা করেন। অতঃপর তার প্রতি এ বাহিনীর আস্থা অর্জিত হলে তার মধ্য থেকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী নেতাদেরকে হত্যা করেন। অতঃপর বিশৃঙ্খলাকারীদের সমর্থক ও বিদ্রোহে ইন্ধনদাতা প্রধানমন্ত্রীকে তাদের সমর্থন নিয়ে বরখাস্ত করেন।

ইউরোপে যুদ্ধ

রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ ও জারকে অবরোধ

রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সুইডেন উসমানিদের নিকট সাহায্যের আবেদন করে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নুমান কুবরিলি এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। বালতাজি মুহাম্মাদ পাশা প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণের পর রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এ সময় রাশিয়াকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়ার সুযোগও হয়েছিল। তিনি রাশিয়ান জার ও তার প্রণয়িণী ক্যাথরিনকে অবরোধ করতে সক্ষম হন। পরবর্তীকালে এই ক্যাথরিন রুশসম্রাজ্ঞী হন। এ নারী প্রধানমন্ত্রীকে অলংকার ও সম্পদ উপঢৌকন দিয়ে প্ররোচিত করেন। প্রধানমন্ত্রী উপঢৌকন পেয়ে অবরোধ তুলে নেন এবং রাশিয়ার সাথে এ মর্মে চুক্তি সম্পাদন করেন যে, রাশিয়া আজওয়াব বন্দর ছেড়ে যাবে এবং ককেশাসের বিষয়ে কোনো হস্তক্ষেপ করবে না।

এরূপ প্রতারণার কারণে খলিফা প্রধানমন্ত্রীকে বরখাস্ত করেন এবং তাকে এজিয়ান সাগরের কোনো এক দ্বীপে নির্বাসন দেন। তৎস্থলে ইউসুফ পাশাকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। তিনি রাশিয়ার সাথে ২৫ বছর মেয়াদি শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। এ চুক্তি ইতিহাসে এডির্নে চুক্তি নামে

---

৫৪. উসমানি শাসনামলে সর্বোচ্চ ক্ষমতা ছিল সুলতানের। তারপরে দুইজন যথাক্রমে প্রশাসনিক বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী ও ধর্মীয় বিষয়ে শাইখুল ইসলাম। সে আমলে তিনজন শাইখুল ইসলামকে হত্যা করা হয়। এদের তৃতীয় জন হলেন সুলতান দ্বিতীয় সুলাইমান আমলের সাইয়েদ মুহাম্মদ ফয়জুল্লাহ। যিনি রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদে নিকটাত্মীয়দের নিয়োগ দেন এবং পুত্রকে পরবর্তী শাইখুল ইসলাম হওয়ার অসিয়ত করেন। -সম্পাদক

প্রসিদ্ধ। কিছুদিন যেতে না যেতে রাশিয়া এ চুক্তি লঙ্ঘন করে। যুদ্ধের কারণে বাণিজ্যিক ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ায় ইংল্যান্ড ও হল্যান্ড ১১২৫ হিজরিতে (১৭১৩ খ্রিষ্টাব্দে) এডির্নে চুক্তি নবায়ন করে। এ চুক্তির বর্ণনামতে কৃষ্ণসাগরের উত্তর উপকূলীয় অঞ্চলে উসমানিদের একক আধিপত্য চলবে। একই সময়ে রাশিয়া ক্রিমিয়ার জন্য খলিফাকে কোনোপ্রকার কর প্রদান করবে না।

ভেনিসদের হাত থেকে ক্রিট মুক্তকরণ

উসমানিদের হাতে ক্রিট বিজিত হওয়ার পর থেকে তা অস্থিতিশীল ছিল। কয়েকটি স্থানে ভেনিসীয়দের উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। যার কারণে তারা দ্বীপটিতে আধিপত্য বিস্তার করে চলত। ১১২৯ হিজরিতে (১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে) উসমানি বাহিনী তাদেরকে এ দ্বীপ থেকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করতে সক্ষম হয়।

ফিচারোবেটস চুক্তি

(১১৩০ হি./১৭১৮ খ্রি.)

ভেনিস অস্ট্রিয়ার সাথে নতুন করে চুক্তি করার ফলে সাহস সঞ্চয় করে। তারা ভেনিসের দখলকৃত এলাকা ফিরিয়ে না দিলে উসমানিদেরকে যুদ্ধের হুমকি প্রদান করে। তাদের হুমকির কারণে উসমানিরা ক্ষুব্ধ হয় এবং উভয় পক্ষের মাঝে যুদ্ধ বেধে যায়। যুদ্ধে অস্ট্রিয়া জয় লাভ করে। অতঃপর তারা ১১২৯ হিজরিতে (১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে) বেলগ্রেড দখল করে। দুদেশের মাঝে ১১৩০ হিজরিতে ফিচারোবেটস চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তির বর্ণনামতে :

১. উসমানিরা বেলগ্রেড ও সার্বিয়ার অধিকাংশ এলাকা অস্ট্রিয়াকে প্রদান করবে।

২. মুরা উসমানিরা ফেরত পাবে।

৩. ভেনিস দালমাতিয়া উপকূলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে।

সাফাভিদের সাথে যুদ্ধ

আফগানিস্তানের শাসক মীর মুহাম্মাদের নিকট ক্ষমতা হারিয়ে সাফাভি শাসক শাহ হুসাইন পদত্যাগ করে। সাফাভিদের এ দুর্বলতাকে উসমানিরা সুযোগ মনে করে। তারা সাফাভি সাম্রাজ্যে আক্রমণ করে আর্মেনিয়া ও

ক্রোয়েশিয়া দখল করে নেয়। এই সুযোগে রাশিয়াও দাগিস্তান দখল করে নেয়। এ নিয়ে রাশিয়ার সাথে উসমানিদের সংঘর্ষ প্রায় বেধেই যাচ্ছিল। যা ফ্রান্সের মধ্যস্থতায় থেমে যায়।

সাফাভিরা হারানো এলাকা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। অধিকন্তু তারা তাবরিজ, হামাদান ও অন্যান্য অঞ্চল হাতছাড়া করে। অবশেষে ১১৪০ হিজরিতে (১৭২৮ খ্রিষ্টাব্দে) চুক্তিতে উপনীত হয়। পরবর্তীকালে তাহমাস্প সাফাভি রাষ্ট্রের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর নতুন করে যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। খলিফা চুক্তি করার প্রতি আকৃষ্ট থাকায় তার বিশেষ জেনিসারি বাহিনী বিদ্রোহ করে। তারা প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করে এবং খলিফাকে অপসারণ করে তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে তৎস্থলে স্থলাভিষিক্ত করে। অতঃপর উসমানিরা ১১৪১ হিজরিতে (১৭৩১ খ্রিষ্টাব্দে) সাফাভিদের পরাজিত করতে সক্ষম হয়।

সাফাভিরা হামাদান, তাবরিজ ও লোরেস্তান অঞ্চল থেকে সরে যেতে সম্মত হয়ে চুক্তি সম্পাদন করে। কিন্তু খোরাসানের গভর্নর নাদির শাহ এ চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে এবং সাফাভি খলিফাকে অপসারণ করে উসমানিদের সাথে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে পড়ে। সে উসমানিদেরকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়। পরিশেষে ১১৪৯ হিজরিতে (১৭৩৬ খ্রিষ্টাব্দে) ক্রোয়েশিয়ার তিবিলিসি[৫৫] নগরীতে উসমানিদের সাথে সাফাভিদের শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি মোতাবেক উসমানিরা যে সকল সাফাভি অঞ্চল দখল করেছিল তা ছেড়ে যাবে। এর ফলে নাদির শাহ পারস্যের সম্রাট হিসেবে আবির্ভূত হয়।

উসমানি সাম্রাজ্যে ছাপাখানা

খলিফা তৃতীয় আহমাদের শাসনকালে ইস্তাম্বুলে প্রথমবারের মতো ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

---

৫৫. **তিবিলিসি :** বর্তমান জর্জিয়ার রাজধানী। -সম্পাদক

খলিফা প্রথম মাহমুদ

(১১৪৩-১১৬৮ হি./১৭৩০-১৭৫৪ খ্রি.)

তিনি ক্ষমতায় আরোহণকালে বিদ্রোহী জেনিসারি বাহিনীর প্রধান বেতরোনা খলিল সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিল। পরবর্তী সময়ে সে খলিফাকে অপসারণ করেছিল। কিছুকাল পর দ্বন্দ্ব সৃষ্টির ফলে বিশেষ বাহিনী তাকে হত্যা করে।

বেলগ্রেড চুক্তি

অস্ট্রিয়ার সমর্থনে রাশিয়া পোল্যান্ড দখল করে নেয়। এদিকে ভিয়েনা চুক্তি অনুযায়ী অস্ট্রিয়ার সমর্থনে ফ্রান্স পোল্যান্ডকে মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। অস্ট্রিয়ার উদ্দেশ্য ছিল উসমানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিবেশ তৈরি করা। এদিকে রাশিয়া উসমানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অগ্নিশিখা জ্বালাতে শুরু করে। তারা আজভ বন্দর দখল করে নেয়। উসমানিরা পারস্যের সাথে জোট গঠন করে তাদের আগ্রাসন থামাতে সক্ষম হয়। একই সময় উসমানি বাহিনী অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করে এবং ১১৫২ হিজরিতে বেলগ্রেড চুক্তি সম্পাদন করে। চুক্তির ভাষ্যমতে :

১. অস্ট্রিয়া বেলগ্রেড ও সার্বিয়ার দখলকৃত অঞ্চল এবং ওয়ালাচিয়া উসমানিদের ফিরিয়ে দেবে।

২. রাশিয়া আজভ নগরীর দুর্গ ভেঙে দেবে এবং কৃষ্ণসাগরে তাদের কোনো জাহাজ অবস্থান করবে না।

অতঃপর খলিফা প্রথম মাহমুদ ১১৬৮ হিজরিতে (১৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দে) ইনতেকাল করেন। তৎস্থলে তার ভাই তৃতীয় উসমান খিলাফতের মসনদে আরোহণ করেন।

খলিফা তৃতীয় উসমান

(১১৬৮-১১৭১ হি./১৭৫৪-১৭৫৭ খ্রি.)

তিনি ১১১০ হিজরিতে (১৬৯৮ খ্রিষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণকালে তার বয়স ছিল ৫৮ বছর। ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণে তিনি প্রধানমন্ত্রী আলি পাশাকে হত্যা করেন। অতঃপর তৎস্থলে মুহাম্মাদ রাগিব পাশাকে স্থলাভিষিক্ত করেন। নতুন মন্ত্রী খলিফাকে সহায়তা করেন এবং সংস্কারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। খলিফা অপরিচিত বেশে রাতে ঘোরাফেরা করে প্রজাদের খোঁজখবর নিতেন এবং তাদের কল্যাণে কাজ করতেন। অতঃপর তিনি ১১৭১ হিজরিতে ইনতেকাল করেন।

খলিফা তৃতীয় মোস্তফা

(১১৭১-১১৮৭ হি./১৭৫৭-১৭৭৪ খ্রি.)

খলিফা তৃতীয় মোস্তফা খলিফা তৃতীয় আহমাদের সন্তান। তিনি ১১৭১ হিজরিতে খলিফা নিয়োজিত হন।

রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ

রাশিয়ার অনুগত ককেশাস অঞ্চল উসমানি সাম্রাজ্যের সীমান্তে আগ্রাসন চালালে উসমানিরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধে ক্রিমিয়ার খান কারিম কুরাই নেতৃত্ব দেন এবং রুশদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করেন। ১১৮২ হিজরিতে (১৭৬৮ খ্রিষ্টাব্দে) এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে অনেক রুশ সৈন্য বন্দি হয়। খলিফা ও তার অনুসারীরা যে-সকল নিত্যনতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল, তার মধ্যে একটি ছিল প্রধানমন্ত্রী বা সেনাপ্রধান যুদ্ধে পরাজিত হলে তাদেরকে হত্যা করা। এরূপ কাজের উদ্দেশ্য অন্যদের সতর্ক করা। রুশ কর্তৃক অবরুদ্ধ নগরীসমূহের অবরোধ ভাঙতে ব্যর্থতার দায়ে প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করা হয়। নতুন প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় এসে দিনাস্তর নদী অতিক্রম করার চেষ্টা করেন। তখন নদীটি খরস্রোতা ছিল। ফলে বহু সৈন্য ডুবে যায় এবং উসমানিরা পরাজিত হয়। এ ঘটনাটি ১১৮৩ হিজরিতে (১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দে) ঘটে। অতঃপর রাশিয়া

ওয়ালাচিয়া ও মোলদাভিয়া অঞ্চল দুটি দখল করে নেয়। তবে রাশিয়া ট্রাবজোন[৫৬] দখল করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

পরবর্তী সময়ে ১১৮৫ হিজরিতে (১৭৭১ খ্রিষ্টাব্দে) তারা ক্রিমিয়াকে উসমানি সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে সক্ষম হয়। রুশ সম্রাট জাহিন কুরাই সম্রাজ্ঞী প্রথম ক্যাথরিনকে রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী হিসেবে নিয়োজিত করে। সে অস্ট্রিয়া যুদ্ধ বন্ধের জন্য মধ্যস্থতা করে। কিন্তু রাশিয়া কিছু অস্বচ্ছ শর্তারোপ করে। তারা জানে যে, এ শর্তগুলো উসমানিরা প্রত্যাখ্যান করবে। এরূপ অনৈতিক শর্তারোপের পেছনে রুশদের উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ অব্যাহত রাখা এবং উসমানিদের মালিকানাধীন অংশে আগ্রাসন চালিয়ে যাওয়া। এভাবে যুদ্ধের দাবানল নতুনভাবে জ্বলে ওঠে। কিন্তু রুশদের ইচ্ছা ব্যর্থ হয়। উসমানি বাহিনী রুশদের আগ্রাসনে বাধার সৃষ্টি করে এবং তাদেরকে সাম্রাজ্যের দখলকৃত অঞ্চল থেকে উৎখাত করতে সক্ষম হয়।

অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা

রুশরা উসমানি সাম্রাজ্যের ভেতরে বিশৃঙ্খলা উসকে দেওয়ার চেষ্টা করে। তারা ভেতরে-বাহিরে উসমানিদের ওপর আঘাত করার উদ্দেশ্যে এরূপ কাজের আশ্রয় নেয়।

মুরার খ্রিষ্টানদের বিদ্রোহ

রুশরা মুরা অঞ্চলের খ্রিষ্টানদের উসকে দেয় এবং তাদের বিদ্রোহের সমর্থনে নৌবহর প্রেরণ করে। কিন্তু তাদের নৌবহর পরাজিত হয়। তবে তাদের পলায়নপর কিছু জাহাজ উসমানি নৌবহরের বড় একটা অংশকে জ্বালিয়ে দিয়ে যায়। অতঃপর তারা লুমনোস দ্বীপ দখলের জন্য অগ্রসর হলে উসমানি বাহিনী তাদেরকে পিছু হটতে বাধ্য করে। এভাবে উসমানিরা মোরা অঞ্চলের বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়। এ ঘটনাটি ১১৮৫ হিজরিতে (১৭৭১ খ্রিষ্টাব্দে) সংঘটিত হয়।

মিশরে সিনিয়র আলি বেগের বিদ্রোহ

উসমানিরা রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকার সুযোগে মিশরের গভর্নর সিনিয়র আলি বেগ সাম্রাজ্যে হস্তক্ষেপ করার প্রয়াস পায়। এজন্য রাশিয়া

---

৫৬. **ট্রাবজোন :** তুরস্কের উত্তরপূর্বাঞ্চলে কৃষ্ণসাগর উপকূলীয় একটি শহর। -সম্পাদক

তার ওপর সন্তুষ্ট হয় এবং তাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদানের জন্য ভূমধ্যসাগরে রুশ নৌবহর প্রেরণ করে। আলি বেগ বিনা বাধায় সিরিয়ায় প্রবেশ করে। রুশ নৌবহর তাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে আসে। এদিকে আলি বেগের প্রতিনিধি মুহাম্মাদ আবু জাহাব মিশরে বিদ্রোহ করে বসেন। তাই তিনি আবু জাহাবকে দমন করতে মিশর ফিরে আসেন। এখানে তিনি আবু জাহাবের নিকট পরাজিত হন। তারপর তিনি জাহির উমরের শরণাপন্ন হন। সে একজন ডাকাত ছিল। তদপুরি সে ছিল ট্যাক্স উসুলকারী। তার সমর্থনে আলি বেগ সিরিয়ায় অগ্রসর হতে থাকেন। খলিফা রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকার কারণে আলি বেগের ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেননি। কিন্তু যখন সে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে তখন উসমানিরা সিদোন[৫৭] শহরে তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এ যুদ্ধে আলি বেগ জয়লাভ করেন। সিরিয়ার উপকূলীয় অঞ্চলে বোমা ফেলতে রুশ নৌবহর তাকে সাহায্য করে।

তারপর আলি বেগ আনাতোলিয়ায় আক্রমণ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। রাশিয়ার সাথে তার এরূপ চুক্তি হয় যে, সে দক্ষিণ দিক থেকে এবং রাশিয়া উত্তর দিক থেকে আক্রমণ করবে। ফলে উসমানিরা উভয় দিক থেকে ফাঁদে পড়বে। কিন্তু এ যুদ্ধের আগে সে মিশরে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী মুহাম্মাদ আবু জাহাবের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নেয়। রাশিয়া তাকে চারশ সৈন্য দিয়ে সাহায্য করে। ১১৮৭ হিজরিতে (১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে) উভয় পক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এ যুদ্ধে আলি বেগ চরমভাবে পরাভূত হয় এবং সে যুদ্ধে আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। তাকে সাহায্যকারী রুশ সেনারা বন্দি হয়। এভাবে সাম্রাজ্য তার বিশ্বাসঘাতকতা থেকে পরিত্রাণ পায়। মুহাম্মাদ আবু জাহাবকে তার নিষ্ঠা ও দেশের সেবায় আত্মত্যাগের জন্য মিশরের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর খলিফা মোস্তফা ১১৮৭ হিজরিতে (১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে) ইনতেকাল করেন।

---

৫৭. সিদোন (স্থানীয় ভাষায় সাইদা) : লেবাননের তৃতীয় বৃহত্তম শহর। -সম্পাদক

খলিফা প্রথম আবদুল হামিদ

(১১৮৭-১২০৩ হি./১৭৭৪-১৭৮৯ খ্রি.)

প্রথম আবদুল হামিদ সাবেক খলিফার ভাই। খলিফা তাকে গৃহবন্দি করে রেখেছিলেন। খলিফার মৃত্যুর পর তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য বন্দিশালা থেকে বেরিয়ে আসেন।

কিনারচা চুক্তি

(১১৮৭ হি./১৭৭৩ খ্রি.)

রুশ নৌবহর বুলগেরিয়ার ভার্না শহরে আক্রমণ করে। এ সৈন্যরা উসমানি সেনা শিবির অবরুদ্ধ করতে সক্ষম হয়। প্রধানমন্ত্রী রুশদের নিকট শান্তিচুক্তির আবেদন করলে রুশরা সাড়া দেয় এবং উভয় পক্ষ কিনারজা চুক্তি সম্পাদন করে। চুক্তির ধারায় যা উল্লেখ আছে :

১. উসমানিরা ক্রিমিয়ার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেবে। (বর্তমান মোলদাভিয়া প্রজাতন্ত্র, ইউক্রেনের কিছু অংশ এবং রোমানিয়া প্রজাতন্ত্রের দুবরুজা অঞ্চল নিয়ে গঠিত তৎকালীন) বেসারাবিয়া ছেড়ে দেবে। অনুরূপভাবে তারা ককেশাসের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত কোবান অঞ্চলকে স্বাধীনতার স্বীকৃতি প্রদান করবে। এ সকল অঞ্চল স্বাধীন করার পেছনে রাশিয়ার উদ্দেশ্য হলো এগুলো দখল করার ক্ষেত্র তৈরি করা।

২. কৃষ্ণসাগরে রুশ নৌবহর চলাচলের স্বাধীনতা প্রদান।

৩. যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে উসমানি সাম্রাজ্য রাশিয়াকে তিন কিস্তিতে পনেরো হাজার কাইস (পনেরো লক্ষ ডলার সমমূল্যের মুদ্রা) পরিশোধ করতে হবে। প্রত্যেক খ্রিষ্ট বছরের শুরুতে কিস্তি পরিশোধ করতে হবে।

৪. উসমানি সাম্রাজ্যে অবস্থানকারী অর্থোডক্স খ্রিষ্টানদের রক্ষা করার অধিকার রাশিয়ার থাকবে এবং তারা ইস্তাম্বুলে একটি গির্জা নির্মাণ করতে পারবে।

রাশিয়া অব্যাহতভাবে তার লক্ষ্য বাস্তবায়ন করে চলে। তারা ক্রিমিয়ায় বিশৃঙ্খলার আগুন জ্বালিয়ে সেখানে হস্তক্ষেপ করার যুক্তি দাঁড় করে।

পরক্ষণে তারা ক্রিমিয়া দখল করে নেয়। এরূপ রুশ আগ্রাসনের ফলে উসমানিরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর উসমানিরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার প্রায় দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়। এমতাবস্থায় ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত তাদেরকে রাশিয়ার ব্যাপক যুদ্ধপ্রস্তুতি, রাশিয়ার প্রতি অস্ট্রিয়ার সংহতি এবং উসমানি সাম্রাজ্যকে খণ্ডবিখণ্ড করার সুযোগের অপেক্ষায় থাকার কথা অবহিত করলে উসমানিরা যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকে।

রাশিয়া উসমানি সাম্রাজ্যের ভূমি দখল করার উদ্দেশ্যে উঠেপড়ে লাগে। উসমানিদের সাথে যুদ্ধ করতে তারা অস্থির হয়ে পড়ে। অতঃপর তারা জর্জিয়া দখলের ঘোষণা দেয় এবং তাদের গোয়েন্দাদেরকে অর্থোডক্সপ্রধান অঞ্চল, যথা ওয়ালাচিয়া, মোলদাভিয়া, মুরা ও সার্বিয়ায় বিশৃঙ্খলা উসকে দিতে ছেড়ে দেয়। রুশ শাসকেরা তাদের জাতিকে উসমানিদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথরিন ক্রিমিয়া সফরে গেলে বাইজান্টাইনের পথে লেখা বিজয়সূচক প্লে-কার্ড বহন করে। তার লক্ষ্য ছিল কনস্টান্টিনোপল পৌঁছা।

অর্থোডক্স ধর্মে বিশ্বাসী রুশরা ভুলে যায়নি এবং কখনো ভুলতেও পারবে না যে, উসমানিরা তাদের পবিত্র স্থানকে মসজিদে রূপান্তর করেছিল। তাদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ছিল ইস্তাম্বুল দখল করা এবং প্রাচীন যুগে ফিরে যাওয়া। বিশেষত অর্থোডক্স গির্জার সদর দপ্তর মস্কোতে স্থানান্তর করার পর রুশরা মনে করতে থাকে যে, তারাই পৃথিবীতে অর্থোডক্স মতবাদের রক্ষক এবং সবচেয়ে শক্তিশালী জাতি।

চলমান ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে উসমানিরা অবগত হয়ে রুশদের আক্রমণ করার পূর্বে তারা রুশদের ওপর আক্রমণ করার প্রত্যয় ঘোষণা করে। তারা রুশ রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে রাশিয়ার নিকট এমন কতিপয় দাবি উত্থাপন করে, যাতে রাশিয়াকে এ যুদ্ধে টেনে আনা যায়। তাদের দাবিসমূহের মাঝে রয়েছে :

১. রাশিয়াকে জর্জিয়ার দখল ছেড়ে দিতে হবে।

২. রাশিয়া কর্তৃক দখলকৃত কৃষ্ণসাগর উপকূলীয় অঞ্চলে রুশ কর্তৃক নিয়োজিত উসকানিদাতা কনস্যুলেটদেরকে হটিয়ে তৎস্থলে উসমানিদের কনস্যুলেট নিযুক্ত করার সুযোগ দিতে হবে।

৩. দার্দানেলিস প্রণালি দিয়ে অতিক্রমকারী রুশ জাহাজসমূহে উসমানিদেরকে তল্লাশি করার অধিকার প্রদান করতে হবে।

৪. রাশিয়ায় রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণকারী ওয়ালাচিয়ার শাসককে উসমানিদের হাতে সোপর্দ করতে হবে।

অতঃপর রাশিয়া উসমানিদের প্রত্যাশানুযায়ী এসকল দাবি প্রত্যাখ্যান করে। ফলে উসমানিরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। উভয়ের মাঝে সংঘর্ষ শুরু হয়। রুশরা ১২০৩ হিজরিতে (১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে) উজে নগরী দখলে নিতে সক্ষম হয়। সে সময় অস্ট্রিয়া সুযোগ বুঝে সার্বিয়ার ওপর হামলা চালায়। কিন্তু তারা তা দখলে নিতে ব্যর্থ হয়।

জাহির উমর থেকে পরিত্রাণ

মুহাম্মাদ আবু জাহাব খলিফার নির্দেশে জাহির উমরকে সিরিয়ার একে অঞ্চলে অবরুদ্ধ করেন। কিন্তু জাহির সাফাদ পর্বতে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। অতঃপর আবু জাহাব তাকে ১১৮৮ হিজরিতে (১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে) হত্যা করতে সক্ষম হন। খলিফা আবদুল হামিদ ১২০৩ হিজরিতে (১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে) ইনতেকাল করেন।

খলিফা তৃতীয় সেলিম

(১২০৩-১২২২ হি./১৭৮৯-১৮০৭ খ্রি.)

তৃতীয় সেলিম খলিফা তৃতীয় মোস্তফার সন্তান। তিনি জটিল সময়ে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অস্ট্রিয়ার সমর্থনে রাশিয়া ওয়ালাচিয়া, মোলদাভিয়া ও বেসারাবিয়া দখল করে নেয়। অন্যদিকে অস্ট্রিয়া সার্বিয়া দখল করে বেলগ্রেডে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। ভাগ্যের সহায় উসমানিদের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ায়। ইতিমধ্যে ফরাসি বিপ্লব ছড়িয়ে পড়লে অস্ট্রিয়ার সম্রাট অস্থির হয়ে পড়ে। সে তার দেশে এ বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করল। তাই ১২০৫ হিজরিতে (১৭৯১ খ্রিষ্টাব্দে) সে উসমানিদের সাথে চুক্তি সই করে। চুক্তি মোতাবেক সম্রাট উসমানিদেরকে সার্বিয়া ও বেলগ্রেড ফিরিয়ে দেয়। অন্যদিকে রাশিয়া উসমানি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখে। তারা উসমানিদের বেশকিছু অঞ্চল দখল করে নেয়। কোনো মুসলিম অঞ্চলে তারা হানা দিলে সেখানে ভীতিকর

অবস্থার সৃষ্টি করে। তখন তাদের মাঝে মানবতা বলতে কোনোকিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

১২০৬ হিজরিতে (১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দে) সম্পাদিত ইয়াসি চুক্তি

ইংল্যান্ড, হল্যান্ড ও ক্রোয়েশিয়ার মধ্যস্থতায় উসমানিদের সাথে রাশিয়ার ইয়াসি চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তির দাবিসমূহের মাঝে রয়েছে :

১. রাশিয়া ওয়ালাচিয়া ও মোলদাভিয়া উসমানি সাম্রাজ্যকে ফিরিয়ে দেবে।

২. ক্রিমিয়া, বেসারাবিয়া, উজে শহর ও শারকাসিয়ার[৫৮] অংশবিশেষে উসমানিরা রাশিয়ার কর্তৃত্ব মেনে নেবে।

অভ্যন্তরীণ বিষয়

রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার সাথে চুক্তি সম্পাদন করার পর খলিফা অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। বিশৃঙ্খলা ও পরাজয়ের মূল উৎস জেনিসারি বাহিনী থেকে পরিত্রাণ পেতে নিয়মিত বাহিনী গঠন করার চিন্তা করেন। ইউরোপের অনুরূপ দেশকে উন্নত করার উদ্দেশ্যে তিনি ইউরোপীয়দের অনুকরণ করেন। ফরাসি প্রযুক্তি অনুযায়ী জাহাজ তৈরি করেন। ক্ষেপণাস্ত্র তৈরিতে সুইডেনের সহযোগিতা গ্রহণ করেন। গণিত ও সামরিক শিল্পবিষয়ক বিজ্ঞানের গ্রন্থসমূহ অনুবাদ করার ব্যবস্থা করেন। নিয়মিত বাহিনী গঠনের পর জেনিসারি বাহিনী বিদ্রোহ শুরু করে। বিশেষত জেনিসারি বাহিনী থেকে নৌবহর ও ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে নিয়মিত বাহিনীকে প্রদান করা হলে এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। বিশেষ বাহিনীর সাথে অন্যান্য বাহিনীও যোগ দিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারা নিয়মিত বাহিনী বাতিল করার জন্য খলিফার ওপর চাপ প্রয়োগ করে। তারা শুধু এটুকুতেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং খলিফাকে ১২২২ হিজরিতে (১৮০৭ খ্রিষ্টাব্দে) অপসারণ করে।

---

৫৮. **শারকাসিয়া :** শারকাস বলা হয় ককেশাসের উত্তরাঞ্চলের আদিগা, চেচনিয়া, আভারস এবং লাযজিনের অধিবাসীদেরকে। তাদের আবাসস্থলকেই বলা হতো শারকাসিয়া। -সম্পাদক

মিশরের ওপর ফ্রান্সের হামলা ও সম্পর্কের অবনতি

উল্লেখ্য যে, খলিফা তৃতীয় সেলিমের আমলে ফরাসি সেনাপতি নেপোলিয়ন মিশর আক্রমণ করে এবং ১২১৩ হিজরিতে (১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে) সে মিশর দখলে নিতে সক্ষম হয়। এদিকে উসমানিদের একসময়ের চরমশত্রু রাশিয়া আজ বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। রাশিয়া ফরাসিদের বিরুদ্ধে উসমানিদের সাহায্য দেওয়ার প্রস্তাব করে। অনুরূপভাবে ইংল্যান্ডও উসমানিদের সাহায্য করতে প্রস্তুত। নেপোলিয়ন উসমানি সাম্রাজ্যের একের পর এক অঞ্চল দখল করা অব্যাহত রাখে। সে সিরিয়ায় প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু একে অঞ্চলে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়। একের গভর্নর আহমদ পাশার সাহসিকতাপূর্ণ প্রতিরোধ, পাশাপাশি ইংল্যান্ডের নৌবহরের সহযোগিতা এ ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে। অতঃপর ইংল্যান্ডের নৌবহর ১২১৩ হিজরিতে (১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে) আলেকজান্দ্রিয়াতে ফরাসি নৌবহরকে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়। এদিকে মিশরব্যাপী (নেপোলিয়ন-বিরোধী) বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে ওঠে। এ বিদ্রোহে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট ভূমিকা ছিল। এ বিদ্রোহের গুরুত্বপূর্ণ ফল হলো, ১২১৫ হিজরিতে (১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে) মিশরে নিয়োজিত নেপোলিয়নের প্রতিনিধি ক্লেভারের নিহত হওয়া।

এ যাত্রায় যেন ফরাসিরা একটি জলাশয়ে পতিত হয়ে বিরাট সংখ্যক সৈন্য হারালো। উসমানি ও ইংরেজ সৈন্যরা মিশরে প্রবেশ করে এবং কায়রো অভিমুখে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখে। ফরাসিরা বাধ্য হয়ে ১২১৬ হিজরিতে (১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে) আরিশ চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে মিশর থেকে বিদায় নেয়। ফ্রান্সের সাথে উসমানিদের পূর্বের ন্যায় সম্পর্ক তৈরি হয় এবং ফ্রান্সকে নিত্যনতুন সুবিধা প্রদানের চুক্তি সম্পাদিত হয়। খলিফা রাশিয়ার সমর্থনপুষ্ট ওয়ালাচিয়া ও মোলদাভিয়ায় নিয়োজিত গভর্নরদ্বয়কে অপসারণ করেন। এজন্য রাশিয়া উসমানি সাম্রাজ্যের সাথে পুনরায় শত্রুতা শুরু করে। এ ক্ষেত্রে ইংল্যান্ড রাশিয়াকে সাহায্য করে। উভয় রাষ্ট্র হুমকি প্রদান করে যে, উসমানিরা ওয়ালাচিয়া, মোলদাভিয়া রাশিয়াকে ফিরিয়ে না দিলে তারা ইস্তাম্বুলে প্রবেশ করবে এবং ইংল্যান্ডকে উসমানি নৌবহর ও দার্দানেলিস দুর্গ দিয়ে দেবে।

প্রতিরোধের সামর্থ্য না থাকায় উসমানিরা এ সকল শর্ত প্রায় মেনেই নিতে যাচ্ছিল। কিন্তু বিভিন্ন দেশের মধ্যকার স্বার্থের দ্বন্দ্ব উসমানিদের জন্য

ইলাহি সাহায্যে রূপ নেয়। ফরাসি রাষ্ট্রদূত খলিফার নিকট আগমন করে এবং ফ্রান্সের পক্ষ থেকে খলিফাকে সহযোগিতা করার প্রস্তাব দেয়। খলিফা প্রস্তাবে সম্মত হলে ফরাসি নৌবহর দার্দানেলিস প্রণালির প্রবেশদ্বারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ফরাসি নৌবহরের লক্ষ্য মারমারা সমুদ্রে অবস্থিত ইংরেজ নৌবহরকে ঘেরাও করে রাখা। ইংল্যান্ড তাদের নৌবহর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ভয়ে তা সরিয়ে নেয়। অতঃপর তারা তাদেরকে পলায়নে বাধ্য করার প্রতিশোধ নিতে ১২২২ হিজরিতে (১৮০৭ খ্রিষ্টাব্দে) ফ্রেজারের নেতৃত্বে মিশরের ওপর চরম আক্রমণ করে। কিন্তু মিশরের বীর রশিদের জাতি তাদেরকে এমন শিক্ষা দেয়, যা তারা কখনো ভুলবে না। অতঃপর তারা ক্ষতির আঁচল টানতে টানতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে।

মিশর থেকে ফরাসিদেরকে বের করে দিতে উসমানিদের যে বাহিনী এসেছিল তাতে মুহাম্মদ আলিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। মিশরীয় সৈন্যদের সাথে মুহাম্মাদ আলিও সৈন্য হিসেবে যোগদান করে। সে মামলুক জনগোষ্ঠী, আলেমশ্রেণি ও সাধারণ জনগণকে জয় করে ১২২০ হিজরিতে (১৮০৫ খ্রিষ্টাব্দে) মিশরের গভর্নর নিযুক্ত হয়। ক্ষমতা পাকাপোক্ত হওয়ার পর ১২২৬ হিজরিতে (১৮১১ খ্রিষ্টাব্দে) দুর্গ হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে মামলুকদের থেকে মুক্ত হয়। অন্যদিকে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হতে আলেমদের মাঝে বিশৃঙ্খলা উসকে দেয়।

খলিফা তৃতীয় সেলিমের যুগে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের চাপে গ্রিসে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এ রাষ্ট্রটি উসমানি সাম্রাজ্যের অধীনে থাকলেও পরবর্তী সময়ে তাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পরিবেশ তৈরি হয়।

খলিফা চতুর্থ মোস্তফা

(১২২২-১২২৩ হি./১৮০৭-১৮০৮ খ্রি.)

তিনি ছিলেন সুলতান প্রথম আবদুল হামিদের পুত্র। রাশিয়া ওয়ালাচিয়া ও মোলদাভিয়া হাতছাড়া করতে চায়নি। ফ্রান্সের সাথে রাশিয়ার যুদ্ধ হয় এবং ফ্রান্স বিজয় লাভ করে। ফ্রান্স উসমানিদের ওপর ওয়ালাচিয়া ও মোলদাভিয়া প্রদেশদুটি ছাড়তে রুশদেরকে বাধ্য করতে এবং এতদঞ্চল হতে উসমানি বাহিনী সরিয়ে নিতে চাপ প্রয়োগ করে। উসমানিরা এ সিদ্ধান্ত মেনে নিলেও রাশিয়া এ দুটি প্রদেশ ছাড়েনি। বিশেষ বাহিনী বসফরাস দুর্গের শাসক খলিফার চাচাকে অপসারণ করে এবং তাদের নেতা কাবাকাজি উগলিকে শাসক নিযুক্ত করে। অতঃপর বিরোধে জড়িয়ে তারা কাবাকাজিকে হত্যা করে। বিশেষ বাহিনীর নতুন নেতা খলিফা তৃতীয় সেলিমকে পুনরায় খলিফা নিয়োগ করার দাবি করে। কিন্তু সেলিম মৃত্যুবরণ করেন। খলিফা মোস্তফা বিশেষ বাহিনীর এ নতুন নেতাকে হত্যা করেন। এর প্রতিবাদে বিশেষ বাহিনী খলিফার বিরুদ্ধে একজোট হয় ও তাকে অপসারণ করে এবং তৎস্থলে তার ভাই দ্বিতীয় মাহমুদকে ১২২১ হিজরিতে (১৮০৭ খ্রিষ্টাব্দে) খলিফা নিযুক্ত করে।

খলিফা দ্বিতীয় মাহমুদ

(১২২৩-১২৫৫ হি./১৮০৮-১৮৩৯ খ্রি.)

দ্বিতীয় মাহমুদের আমলে দেশের অভ্যন্তরে ও বাহিরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়।

ওহাবি আন্দোলন

উসমানি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন গ্রন্থিতে দিন দিন যে মারাত্মক দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছিল, তার ফলস্বরূপ সমাজের মানুষের মাঝে দুটি ধারা সৃষ্টি হয়।

প্রথম ধারার মতে উসমানিদের যাবতীয় দুর্দশার একমাত্র কারণ ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়া। কারণ, পৃথিবীতে মুসলমানদের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠার মূলপ্রাণ ইসলামি অনুশাসনকে আঁকড়ে ধরা।

দ্বিতীয় ধারার মতে রাষ্ট্রের উন্নতি ও সমৃদ্ধির প্রত্যাশায় ইউরোপের অন্ধ অনুকরণ শুরু করে দেওয়া উচিত।

প্রথম ধারা আরব অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ওহাবি আন্দোলনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। আর দ্বিতীয় ধারা মুহাম্মাদ আলির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। মুহাম্মাদ আলি ইউরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান আহরণের জন্য বিভিন্ন মিশন প্রেরণ করে। ধর্মের সাথে বিরোধ থাকা জ্ঞান আমদানিকেও সে অনুমোদন দেয়। তার এরূপ ধর্মবিরোধী স্বভাব ও কার্যক্রমের কারণে ইউরোপীয়রা তাদের রচনাবলিতে মুহাম্মাদ আলির ভূয়সী প্রশংসা করে। তারা মুহাম্মাদ আলির যুগকেই রেনেসাঁসের যুগ হিসেবে অভিহিত করতে থাকে।

ওহাবিদের অনুসারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকায় ইউরোপসহ অন্যান্য শত্রুরা উসমানিদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয় যে, ওহাবি আন্দোলন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। সে সময় উসমানি বাহিনী ইউরোপে যুদ্ধরত। তারা মুহাম্মাদ আলিকে আন্দোলন দমানোর দায়িত্ব দেয়। মুহাম্মাদ আলি স্বীয় প্রভাব বিস্তার করতে যুদ্ধে সামর্থ্যবান একদল সৈন্য তৈরি করে। সে সৈন্যদেরকে লোহিত সাগরতীরে অবস্থিত ইয়ানবু বন্দরে স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে একটি নৌবহর গঠন করে। তার পুত্র তুসুনের নেতৃত্বে নৌবাহিনী যুদ্ধে বের হয় এবং তারা মদিনা শরিফ নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হয়। কিন্তু তায়িফে পৌঁছার পর তারা ওহাবিদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এ সংবাদ

শোনার পর পিতা মুহাম্মাদ আলি এসে মক্কা মুকাররামা দখল করে এবং ছেলেকে মুক্ত করে।

অতঃপর তুসুন জাজিরাতুল আরবে অভিযান অব্যাহত রাখে। ওহাবি আন্দোলনের নেতা আবদুল্লাহ বিন সাউদ তুসুনের নিকট শান্তিচুক্তির প্রস্তাব দেয়। তুসুন আবদুল্লাহর প্রস্তাবে সম্মত হয়ে চুক্তি করে। অতঃপর সে সংবাদ পায় যে, মিশরে তার পিতার বাহিনী বিদ্রোহ করেছে। তাই বাধ্য হয়ে তাকে মিশর যেতে হয়। মিশরে পরিবেশ শান্ত হয়ে আসার পর মুহাম্মাদ আলি স্বীয় পুত্র ইবরাহিমের নেতৃত্বে নতুন করে ওহাবিদের বিরুদ্ধে বাহিনী প্রেরণ করে। ইবরাহিম ওহাবিদের ঘাঁটি দারইয়াতে পৌঁছে যেতে সক্ষম হয়। অতঃপর ওহাবিরা আত্মসমর্পণ করে এবং ১২৩৩ হিজরিতে (১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে) চুক্তি করে। এ চুক্তির মধ্য দিয়ে ওহাবি আন্দোলন নিঃশেষ হয়ে যায়। তাদের আমির আবদুল্লাহ সাউদ উসমানি খলিফার নিরাপত্তা পেয়ে ইস্তাম্বুল গমন করে। কিন্তু ইস্তাম্বুলে পৌঁছামাত্র তাকে হত্যা করা হয়।

ইউরোপের পরিস্থিতি

রাশিয়ার সাথে উসমানিদের যুদ্ধ অব্যাহতভাবে চলছেই। তারা সার্বিয়াকে উসমানি সাম্রাজ্য থেকে স্বাধীন হয়ে যেতে উসকানি দিয়ে যাচ্ছে। রাশিয়া উসমানি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে অভিযান অব্যাহত রেখেছে। এমনই মুহূর্তে রাশিয়ার সাথে ফ্রান্সের তীব্র দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ফ্রান্সের সাথে লড়তে রাশিয়া উসমানিদের সাথে বুখারেস্ট শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে। চুক্তি মোতাবেক ইউফোরিয়া, মোলদাভিয়া ও সার্বিয়ায় উসমানি কর্তৃত্ব রাশিয়া মেনে নেয়। অপরদিকে বেসারাবিয়ায় রাশিয়ার সার্বভৌমত্ব উসমানিরা মেনে নেয়। ফ্রান্সের সাথে যুদ্ধে উসমানিরা বিজয় লাভ করে। নেপোলিয়ন তার পরাজয় ও রাশিয়ার বিজয়ের মাঝে উসমানিদের বিশ্বাসঘাতকতার গন্ধ পায়। সে তার পরাজয়ের জন্য উসমানিদেরকে দায়ী করে।

সার্বিয়ার বিদ্রোহ

বুখারেস্ট চুক্তিতে সার্বিয়াকে উসমানিদের অধীনে দেওয়ায় সার্বরা ক্রুদ্ধ হয় এবং বিদ্রোহ করে বসে। উসমানিরা তাদের বিদ্রোহ দমন করে। অতঃপর বিদ্রোহী নেতারা অস্ট্রিয়ায় পালিয়ে যায়। নেতাদের মাঝে কেবল টিউড্রুস্টাস উসমানিদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে থেকে যায়। মূলত সে

উসমানিদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং সেখানকার নাগরিকদের মাঝে বিচ্ছিন্নতার বীজ রোপণ করার জন্য কাজ করে। একপর্যায়ে তার শক্তি বৃদ্ধি পেলে ১২৩০ হিজরিতে (১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে) সে বিদ্রোহ করে বসে। উসমানি বাহিনী তার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হলে সে পুনরায় উসমানিদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। সে ওয়াদা করে যে, সার্বিয়ার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাবে না এবং সার্বিয়ার দুর্গে একমাত্র উসমানিদের ক্ষমতা চলবে। উসমানিরা তার আবেদনে সম্মত হয়।

গ্রিসের বিদ্রোহ

উসমানিরা বিজিত অঞ্চলের লোকদের ধর্মবিশ্বাস, সভ্যতা ও ভাষার ওপর হস্তক্ষেপ না করার কারণে তাদের সাথে উসমানিদের গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। এ সকল বিজিত দেশের মাঝে রয়েছে গ্রিস। গ্রিসের কিছু নাগরিক বিচ্ছিন্নতার ছক তৈরির জন্য ইউরোপে পাড়ি জমায়। তারা অস্ট্রিয়া ও রাশিয়াতে বিচ্ছিন্নতাবাদী গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। অতঃপর তারা প্রস্তুত হয়ে উসমানিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। খুরশিদ পাশা তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু পরাভূত হয়ে তিনি শেষপর্যন্ত আত্মহত্যা করে বসেন।

মিশরের গভর্নর মুহাম্মাদ আলি সুদান জয় করে। অতঃপর খলিফা তাকে গ্রিসের বিদ্রোহ দমনের নির্দেশ দেন। মুহাম্মাদ আলি বিদ্রোহ দমনের জন্য স্বীয় পুত্র ইবরাহিমকে গ্রিসে প্রেরণ করে। মিশরীয় বাহিনী গ্রিসে বিজয় ছিনিয়ে নেয়। যুদ্ধে ইউরোপীয়রা গ্রিসকে পূর্ণ সহায়তা দিয়েছিল। মুহাম্মাদ আলি ১২৪১ হিজরিতে (১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে) গ্রিসের রাজধানী এথেন্সে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। তাকে বাধা দিতে রাশিয়া ও ইংল্যান্ড হস্তক্ষেপ করে। তারা উসমানিদেরকে ১২৪২ হিজরিতে আক কিরমান চুক্তি সম্পাদনের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, উভয় দেশ যে চুক্তিটি সম্পাদন করে তাতে গ্রিসের প্রসঙ্গ উল্লেখ ছিল না। চুক্তির অন্যতম ধারা হলো, কৃষ্ণসাগরে রাশিয়া ও ইংল্যান্ডের নৌবহর চলাচলের স্বাধীনতা থাকবে এবং কোনোরূপ তল্লাশি ব্যতীত রুশরা বসফরাস ও দার্দানেলিস প্রণালি অতিক্রম করার অধিকার সংরক্ষণ করবে। অধিকন্তু রাশিয়া ওয়ালাচিয়া ও মোলদাভিয়ার শাসক নির্বাচিত করবে। উসমানিরা রাশিয়ার সম্মতি ব্যতীত এদেরকে বরখাস্ত করার অধিকার রাখবে না।

অপরদিকে সার্বিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে। উসমানিরা বেলগ্রেডদুর্গসহ মোট তিনটি দুর্গ অধিকারে রাখতে পারবে।

লন্ডন সম্মেলন

ইউরোপীয়রা উসমানিদেরকে যুদ্ধে জড়াতে অস্থির হয়ে পড়ে। ১২৪২ হিজরিতে (১৮২৭ খ্রিষ্টাব্দে) ইংল্যান্ড উসমানিদের দখলে থাকা খ্রিষ্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যসমূহ ও উসমানি সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী স্থানে একটি খ্রিষ্টানরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়। উসমানিরা এ দাবি প্রত্যাখ্যান করে। ইউরোপীয়দের দাবি না মানার কারণে তারা উসমানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কারণ খুঁজে পায়। রাশিয়া, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স উসমানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে একজোট হয়। তারা দাবি করে যে, যদি উসমানিরা গ্রিসকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান না করে, তাহলে তারা যুদ্ধ করবে। তারা খলিফাকে গ্রিস হতে সৈন্য প্রত্যাহার করে নিতে এক মাসের সময় দেয়।

খলিফা তাদের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় রাশিয়া, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের নৌবহর গ্রিস অভিমুখে যাত্রা করে। তারা ইবরাহিম পাশাকে গ্রিস হতে সরে যেতে আদেশ করে। তিনি তাদের কথা মানেন না। ফলে ইউরোপীয় জোট উসমানি ও মিশরীয় নৌবহরের ওপর আক্রমণ করে এবং এগুলোকে গ্রিসের সীমানায় ধ্বংস করে দেয়। ইবরাহিম পাশা ক্রুসেডারদের সাথে যুদ্ধে ৩০ হাজার মিশরীয় সৈন্য হারান। অবশিষ্ট সৈন্যদেরকে নিয়ে তিনি মিশরে ফিরে যেতে বাধ্য হন। ইউরোপীয় জোট লন্ডন সম্মেলনের আয়োজন করে এবং সেখানে খলিফাকে আমন্ত্রণ জানায়। খলিফা সম্মেলনের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। সম্মেলনে ক্রুসেডারগণ গ্রিসকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করে। উসমানিরা তাদের সিদ্ধান্ত মানতে অস্বীকৃতি জানায়।

এডির্নে চুক্তি

রাশিয়া উসমানি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তারা ওয়ালাচিয়া ও মোলদাভিয়া দখল করে নিতে সক্ষম হয় এবং এ সকল প্রদেশে নিজেদের প্রশাসক নিযুক্ত করে। উসমানি এক নেতা ইউসুফ পাশার বিশ্বাসঘাতকতার ফলে বুলগেরিয়া শহর দখলে নিতে সমর্থ হয়। এ নেতা রাশিয়ার নিকট বুলগেরিয়া শহর সমর্পণ করে।

এরপর রাশিয়া আলাতোলিয়া শহরের পূর্বাঞ্চলে প্রবেশ করে। তারা এডির্নে শহর দখল করে বেদনাদায়ক ঘটনার জন্ম দেয়। এ শহর হতে ইস্তাম্বুল খুবই নিকটে অবস্থিত। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স দ্রুত রাশিয়ার অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেয়। উসমানিদের স্বার্থের চেয়ে বরং ইংল্যান্ড ও ফরাসিদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকায় তারা এগিয়ে এসেছিল। অন্যথায় রাশিয়া ইস্তাম্বুল পৌঁছাতে সক্ষম হলে তাদের স্বার্থহানি ঘটত। তখন এডির্নে চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তির বর্ণনামতে :

১. রাশিয়া উসমানিদেরকে ওয়ালাচিয়া, মোলদাভিয়া দুবরুজা, সাইপ্রাস ও এরজুরামই[৫৯] ফিরিয়ে দেবে।
২. উসমানিদের প্রণালিতে রুশ জাহাজ তল্লাশি করা যাবে না।
৩. অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহের মতো রাশিয়াও উসমানিদের দেওয়া সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে।
৪. উসমানিরা রাশিয়ার যুদ্ধ-ব্যয়ের ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে।
৫. সার্বিয়া স্বাধীন থাকবে এবং উসমানিরা সার্বিয়ার যে-সকল দুর্গ দখলে রেখেছে তা হস্তান্তর করবে।

প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা, চিন্তা করে দেখুন! চতুর্থ ধারাটি প্রমাণ করে যে, ইউরোপ উসমানিদেরকে উসমানি সাম্রাজ্য গঠিত হতে ও তাদের বাহিনীকে সুসজ্জিত করতে সুযোগ দিতে চায় না। তারা চায় যে, উসমানিরা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়ুক। যেন তারা সহজে তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারে। চুক্তির অন্যান্য ধারাও একইরকম অর্থ বহন করে।

আলজেরিয়া দখল

ফ্রান্স অতীব স্থূল ও দুর্বল কারণ দেখিয়ে ১২৪৫ হিজরিতে (১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে) আলজেরিয়া আক্রমণ করে। আবদুল কাদিরের নেতৃত্বে সাহসী প্রতিরোধ গড়া হলেও তারা আলজেরিয়া দখলে রাখতে সক্ষম হননি। অবশেষে ১২৬৩ হিজরিতে (১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি আত্মসমর্পণ করেন।

---

৫৯. এরজুরাম : তুরস্কের অন্তর্গত একটি প্রদেশ। -সম্পাদক

জেনিসারি বাহিনী বাতিল

জেনিসারি বাহিনী উসমানি সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র ক্ষমতাধর হয়ে ওঠে। তারা খলিফা নিয়োগ, অপসারণ, হত্যা এমনকি তৃতীয় কোনো পক্ষকে খলিফা নিয়োগ করার মতো দুঃসাহস দেখাত। নিয়মিত বাহিনী সন্তোষজনক অবস্থায় পৌঁছার পর খলিফা দ্বিতীয় মাহমুদ জেনিসারি বাহিনীকে ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। মিশরে মুহাম্মাদ আলি পাশার বাহিনীর সফলতাও তাকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করে।

খলিফা রাষ্ট্রের মুফতির বাড়িতে সভা ডাকেন। সাম্রাজ্যের কর্তা ব্যক্তি ও বিশেষ বাহিনী (জেনিসারি)-এর নেতাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সভায় এ বাহিনীকে ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু বিশেষ বাহিনী এ সিদ্ধান্ত মানতে নারাজ। তারা ইস্তাম্বুলের একটি ময়দানে বিদ্রোহের উদ্দেশ্যে সমবেত হয়। ১২৪০ হিজরিতে (১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দে) উসমানিদের ক্ষেপণাস্ত্রের মুখে তারা লন্ডভন্ড হয়ে যায়। খলিফা নিয়মিত বাহিনী গঠনের ঘোষণা দেন। তিনি সৈন্যদের প্রশিক্ষণের জন্য ইউরোপীয় প্রশিক্ষক নিয়োগ দেন। এভাবে একটি মুসলিম দেশ ইউরোপীয় বেশভূষা গ্রহণ করলে পাগড়ির পরিবর্তে সেখানে হেলমেট স্থান করে নেয়।

মুহাম্মাদ আলির অতি লোভ

মুহাম্মাদ আলি হিজায ও ক্রিট অঞ্চলকে তার সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং সে ১২৪৭ হিজরিতে (১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে) ছেলে ইবরাহিম পাশার নেতৃত্বে সিরিয়ায় অভিযান প্রেরণ করে। ইবরাহিম অন্যান্য গভর্নরের পক্ষ হতে আসা বাধা ঠেলে সামনে এগিয়ে যায়। পাশ থেকে মিশরীয় নৌবহর তাকে সমর্থন ও প্রয়োজনীয় সাহায্য করে। এভাবে সে আনাতোলিয়ায় পৌঁছে যায় এবং উসমানি সেনাকমান্ডার রশিদ পাশাকে পরাজিত করে বন্দি করে। অতঃপর অগ্রসর হতে হতে সে ইস্তাম্বুলের সন্নিকটে পৌঁছে যায়।

কোতাহিয়া চুক্তি

ইউরোপ প্রাথমিক পর্যায়ে মুহাম্মাদ আলিকে উৎসাহিত করলেও মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কাবোধ করে। তারা বুঝতে পারে যে, এ শক্তি একদিন তাদের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাই রাশিয়া উসমানিদের সাহায্যে পনেরো হাজার সৈন্য প্রেরণ করে। রাশিয়ার এমন

প্রভাব বিস্তারকে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স বিপজ্জনক ভাবতে শুরু করে। তাই তারা মুহাম্মাদ আলির সাথে চুক্তি করার জন্য মধ্যস্থতা করতে এগিয়ে আসে ও উভয় পক্ষের মাঝে চুক্তি করে।

১২৪৮ হিজরিতে (১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে) কোতাহিয়া চুক্তি সই হয়। চুক্তির বর্ণনায় রয়েছে :

১. মুহাম্মাদ আলি আনাতোলিয়া হতে পিছিয়ে তাউরুস[৬০] পর্বতমালার বাহিরে চলে যাবে।

২. মুহাম্মাদ আলি তার জীবদ্দশায় মিশর শাসন করবে।

৩. মুহাম্মাদ আলির পুত্র ইবরাহিম আদানা[৬১] অঞ্চলে গভর্নর নিয়োজিত হবে। এটি আনাতোলিয়ার বৃহত্তম একটি অঞ্চল।

৪. মুহাম্মাদ আলি সিরিয়ার চারটি প্রদেশে গভর্নর নিয়োগ দেবে। প্রদেশসমূহ হলো একে, ত্রিপোলি, দামেশক ও আলেপ্পো। ক্রিট দ্বীপেও সে গভর্নর নিয়োগ দেবে।

মুহাম্মাদ আলি কোতাহিয়া চুক্তিতে তুষ্ট হতে পারেনি। সে মিশর, সিরিয়া ও আরব-দ্বীপ অধীনে নিয়ে আসতে চাইল। তার আরও ইচ্ছা ছিল, তার অবর্তমানে সন্তানেরা এসকল অঞ্চল শাসন করুক। এ বিষয়ে ইউরোপ দুপক্ষের মাঝে মধ্যস্থতা করে। উসমানিরা তার সাথে পরামর্শ করে ঐকমত্যে পৌঁছে যে, মিশর, জাজিরাতুল আরব মুহাম্মাদ আলি ও তার সন্তানদের উত্তরাধিকার হিসেবে থাকবে। আর সে যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন সিরিয়া শাসন করবে। পরবর্তী সময়ে তাউরুস পর্বতমালা দখল নিয়ে দুপক্ষের মাঝে বিরোধ দেখা দেয়। এ পর্বতমালা সিরিয়া ও আনাতোলিয়ার মাঝে প্রাকৃতিকভাবে দেয়াল হয়ে আছে।

উসমানিরা হাফিজ পাশার নেতৃত্বে অভিযান প্রেরণ করে। জার্মান সেনানায়ক হেলমুট ফন মোল্টকে তাদেরকে সহযোগিতা করে। উভয় দল নাসিব নামক স্থানে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধে ইবরাহিম পাশা বিজয় লাভ করে এবং উসমানি বাহিনী অস্ত্রশস্ত্র ফেলে পলায়ন করে। খলিফা দ্বিতীয় মাহমুদ ১২৫৫ হিজরিতে (১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে) ইনতেকাল করেন।

---

৬০. **তাউরুস :** তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত পর্বতমালা।

৬১. **আদানা :** তুরস্কের দক্ষিণের বৃহৎ একটি শহর।

হানকার এস্কেলেসি চুক্তি

রাশিয়া ও উসমানি সাম্রাজ্যের মাঝে এ মর্মে চুক্তি সম্পাদিত হয় যে, রাশিয়া উসমানি সাম্রাজ্যকে রক্ষা করবে। এ চুক্তির সুবাদে রাশিয়া উসমানি সাম্রাজ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

খলিফা প্রথম আবদুল মাজিদ
(১২৫৫-১২৭৭ হি./১৮৩৯-১৮৬১ খ্রি.)

প্রথম আবদুল মাজিদ খলিফা দ্বিতীয় মাহমুদের পুত্র। তিনি আঠারো বছর বয়সে খিলাফতের দায়িত্ব নেন।

মুহাম্মাদ আলির সাথে অব্যাহত যুদ্ধ

মুহাম্মাদ আলির সাথে যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। উসমানি নৌবাহিনী প্রধান মনে করেন যে, একমাত্র মুহাম্মাদ আলিই উসমানি সাম্রাজ্যের প্রভাব পুনরুদ্ধার করতে পারবে। তাই তিনি উসমানি নৌবহরকে মুহাম্মাদ আলির নিকট সমর্পণ করেন।

মুহাম্মাদ আলির শক্তি বৃদ্ধিতে ইউরোপীয়দের অন্তরে ভীতির সৃষ্টি হয়। বিশেষত যখন তারা দেখতে পেল যে, উসমানিরা তার সম্মুখে টিকতে পারছে না। অতঃপর রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স খলিফার নিকট একটি যৌথ প্রস্তাব দেয়। প্রস্তাবে বলা হয়, খলিফা যেন তাদের পরামর্শ ব্যতীত মুহাম্মাদ আলির ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে। তারা খলিফাকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তারা খলিফা ও মুহাম্মাদ আলির মাঝে মধ্যস্থতা করবে। খলিফা তাদের মতের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন।

ইংল্যান্ড, রাশিয়া, প্রুশিয়া ও অস্ট্রিয়া ১২৫৬ হিজরিতে (১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে) একটি চুক্তিতে পৌঁছায়, যাতে উসমানিরাও স্বাক্ষর করে। ফ্রান্স এ চুক্তি থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখে। ফ্রান্স মুহাম্মাদ আলিকে এ চুক্তি প্রত্যাখ্যান করতে উৎসাহিত করে এবং বলে যে, অন্যান্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অবস্থানকালে তাকে সাহায্য করবে। চুক্তির প্রস্তাবিত ধারাসমূহ হলো :

১. মুহাম্মাদ আলি উসমানি সাম্রাজ্যের যে সকল অংশ দখল করেছে, তা হতে সরে যাবে।

২. মুহাম্মাদ আলি মিশর ও দক্ষিণ সিরিয়া নিজ অধিকারে রাখবে। সিরিয়ার নাগরিকদের ওপর মুহাম্মাদ আলি অত্যাচার করলে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রিয়া নাগরিকদের সাহায্যে দাঁড়াবার অধিকার পাবে। যদি মুহাম্মাদ আলি ইস্তাম্বুল আক্রমণ করে তাহলে রাশিয়া, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রিয়ার ইস্তাম্বুলে হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকবে। আর যদি আক্রমণ না করে তাহলে তারা ইস্তাম্বুলে প্রবেশ করবে না।

ইংল্যান্ড, রাশিয়া, প্রুশিয়া ও অস্ট্রিয়ার কনস্যুলারগণ মিশর এসে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রস্তাব করে যে, মিশর মুহাম্মাদ আলির উত্তরাধিকার হিসেবে থাকবে এবং একে অঞ্চল ও দক্ষিণ সিরিয়া তার জীবদ্দশায় সে নিয়ন্ত্রণ করবে। অতঃপর উসমানি প্রতিনিধি এসে মুহাম্মাদ আলিকে অবহিত করে যে, মিশর তার উত্তরাধিকার হিসেবে থাকবে। মুহাম্মাদ আলি এ প্রতিনিধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং তাকে মিশর হতে তাড়িয়ে দেয়। ফ্রান্স মিশরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সহযোগিতায় এগিয়ে আসেনি। মিশর একাকী ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের মোকাবিলা করে। সে সময় ইউরো জোটের রাষ্ট্রসমূহ যে ভূমিকা রেখেছিল তা নিম্নরূপ :

রাশিয়া ইস্তাম্বুলে অবস্থান করার সুযোগ পাওয়াতে সন্তুষ্ট। ইংল্যান্ড কতিপয় অস্ট্রীয় নৌবহরের সাথে তাদের বিশাল নৌবহর নিয়ে সিরিয়ায় হাজির হয়। যৌথবাহিনী বৈরুতে অবতরণ করে। তারা মুহাম্মাদ আলির পুত্র ইবরাহিমের নেতৃত্বে যুদ্ধরত বাহিনীর বিরুদ্ধে বিরাট বিজয় লাভ করে। ইবরাহিম তার বাহিনী নিয়ে মিশরে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। ফেরার পথে বিভিন্ন আরব গোত্রের হামলায় তার বাহিনীর অনেকের প্রাণহানি ঘটে।

অতঃপর ইউরোপ মুহাম্মাদ আলি ও উসমানিদের মাঝে মধ্যস্থতা করে। তারা সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে, মুহাম্মাদ আলি যদি উসমানিদের নৌবহর ফিরিয়ে দেয়, তার সৈন্যসংখ্যা ১৮০০০-এর মাঝে সীমাবদ্ধ রাখে, নৌবহর তৈরি না করে এবং উসমানিদেরকে বাৎসরিক ৮০০০০ মুদ্রা কর প্রদান করে, তাহলে সে মিশরকে উত্তরাধিকার হিসেবে ভোগ করতে পারবে।

প্রণালি চুক্তি

উসমানি সাম্রাজ্যে রাশিয়ার প্রভাব খর্ব করতে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স হানকার এস্কেলেসি চুক্তি বাতিল করতে একমত হয়। তারা সবাই ১২৫৭ হিজরিতে

(১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দে) ঐকমত্য পোষণ করে যে, উসমানি প্রণালি সকলের জন্য বন্ধ থাকবে।

রাশিয়ার সাথে ক্রিমিয়ার[৬২] যুদ্ধ

পূর্বে ফ্রান্স বাইতুল মুকাদ্দাসের গির্জাসমূহের তত্ত্বাবধান করত। নেপোলিয়ন যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় রাশিয়া ফ্রান্সের স্থলে এ দায়িত্ব পালন করে। অতঃপর ফ্রান্স তাদের দায়িত্ব ফিরে পেতে চায়। তখন খলিফা পোপদের একটি কমিটি গঠন করেন। এ কমিটি গির্জার তত্ত্বাবধানে ফ্রান্সের অগ্রাধিকার রয়েছে মর্মে রায় দেয়। অতঃপর রাশিয়া উসমানি খলিফাকে যুদ্ধের হুমকি দেয়।

রুশরা ইংল্যান্ডের সাথে সলাপরামর্শ করে পরিকল্পনা গ্রহণ করে যে, তারা উসমানি সাম্রাজ্যকে তাদের মাঝে ভাগ করে নেবে। সাম্রাজ্যের মিশর অংশ ইংল্যান্ডকে দেওয়া হবে। ইংল্যান্ড রাশিয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। পরবর্তী সময়ে রাশিয়া ফ্রান্সকেও অনুরূপ প্রস্তাব করে। প্রস্তাবে ফ্রান্সকে তিউনিসিয়া প্রদানের প্রস্তাব করা হয়। ফ্রান্স তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এ পর্যায়ে রাশিয়া খলিফাকে হুমকি দেয় যে, যদি উসমানি খলিফা হানকার এস্কেলেসি চুক্তি বহাল না রাখে তাহলে রাশিয়া ওয়ালাচিয়া ও মোলদাভিয়া দখল করে নেবে। আর রাশিয়াকে উসমানি সাম্রাজ্যে বসবাসকারী খ্রিষ্টানদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। খলিফা রাশিয়ার হুমকির পরোয়া করেননি। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স তাকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তার বিরুদ্ধে যেকোনো পদক্ষেপ নেওয়া হবে, তারা তা প্রতিহত করতে এগিয়ে আসবে।

অপেক্ষমাণ রুশ আক্রমণ প্রতিহত করতে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের রণতরী দার্দানেলিস নদের প্রণালিমুখে যাত্রা করে। রাশিয়া ওয়ালাচিয়া ও মোলদাভিয়া দখল করে নেয়। অস্ট্রিয়া দুপক্ষের মাঝে চুক্তি করতে ১২৬৯ হিজরিতে (১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে) ভিয়েনায় একটি সম্মেলন আয়োজন করার চেষ্টা করে। কিন্তু ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড সম্মেলনটি ব্যর্থ করার প্রয়াস পায়। তারা খলিফাকে সম্মেলনের সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের জন্য উদ্বুদ্ধ করে।

---

৬২. ক্রিমিয়া : ইউক্রেনের অন্তর্গত একটি স্বশাসিত প্রজাতন্ত্র।

রাশিয়া উসমানিদের হুমকি দিলে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, ইতালির বায়মানুট সাম্রাজ্য ও সুইডেন এ পাঁচটি দেশ উসমানিদের পক্ষে থাকতে জোট গঠন করে। জোটবাহিনী ফ্রন্টে ফ্রন্টে বিভক্ত হয়ে চতুর্দিক থেকে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে এগোতে থাকে। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের নৌবহর ক্রিমিয়ার সেতাস্তোপোল বন্দরে আঘাত হানে। জোটবাহিনীর পক্ষ হতে রাশিয়ার বিভিন্ন পোর্টে আঘাত করা হয়। অধিকন্তু কৃষ্ণসাগরে অবস্থিত রুশ বন্দরেও ব্যাপক আক্রমণ করা হয়। অতঃপর যৌথবাহিনী রাশিয়ার ভেতরে প্রবেশ করার পর রাশিয়া চুক্তির আহ্বান জানায়। ১২৭৫ সালে প্যারিসে এ চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তির ভাষ্যমতে :

১. ওয়ালাচিয়া ও মোলদাভিয়া খলিফার অধীনে থাকবে।
২. যৌথবাহিনী কর্তৃক দখলকৃত রাশিয়ার ভূমি ফেরত দেওয়া হবে এবং সকল বন্দিকে ছেড়ে দেওয়া হবে।
৩. সার্বিয়া স্বাধীনতা ভোগ করবে। তাদের সাথে উসমানি সাম্রাজ্যের সম্পর্ক থাকবে।
৪. রাশিয়া বা উসমানিরা কেউই কৃষ্ণসাগরে সামুদ্রিক যুদ্ধনীতি লঙ্ঘন করতে পারবে না। এ সাগরে সকলেই নৌ চলাচলের অধিকার রাখবে।
৫. দানিয়ুব নদীতে সকলের জন্য নৌ চলাচলের অধিকার থাকবে।

অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা

ইউরোপের দেশসমূহ উসমানি সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহের অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে চলেছে। তারা ওয়ালাচিয়া ও মোলদাভিয়ায় স্বায়ত্তশাসন চালু করার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করে। এ অঞ্চলের নাম দেওয়া হয় ইউনাইটেড স্টেটস গভর্নমেন্ট। এ দেশটি সকল ইউরোপীয় দেশের তত্ত্বাবধানে থাকে। তারা সার্বিয়া ও মন্টেনিগ্রোতে বিদ্রোহে সহযোগিতা করে যায় এবং উসমানিদেরকে এ বিদ্রোহ দমনের ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে।

জেদ্দাতে খ্রিষ্টানদের ওপর আক্রমণ করা হয়। এ আক্রমণে ফ্রান্সের কনস্যুলার আহত হয়। মক্কার গভর্নর পরিস্থিতি শান্ত করে। এ ঘটনায় ইংরেজরা জেদ্দায় ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছিল।

সিরিয়ায় গোষ্ঠীগত সমস্যা

সিরিয়া-লেবানন পাহাড়ে দরজি, ম্যারোনাইট ও নাসিরিয়াসহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বসবাস। দরজের জনগোষ্ঠী লেবানন পাহাড়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাধর ছিল। তাদেরকে ইংল্যান্ড সমর্থন ও সহযোগিতা করে। আর ফ্রান্স সহযোগিতা করত ম্যারোনাইটদেরকে। ১২৫৭ হিজরিতে দরজিরা দাইরুল কামারে প্রবেশ করে ম্যারোনাইটদের ওপর আক্রমণ করে। তারা এদের সাথে ন্যক্কারজনক আচরণ করে। দুপক্ষের মাঝে আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণ বৃদ্ধি পায়। খলিফা শান্তিপূর্ণ পন্থায় পরিবেশ শান্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। ফলে একদিকে ইউরোপ খিলাফতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পায়। অপরদিকে সাম্রাজ্যে খ্রিষ্টানরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

পরিস্থিতি সামাল দিতে খলিফা সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু ইউরোপ খলিফাকে পরিস্থিতি সামাল দিতে তাদেরকে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দিতে বাধ্য করে। তাদের যুক্তি হলো, খলিফা পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবেন না। ফ্রান্স ১২৭৭ হিজরিতে (১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে) ৬০০০ সৈন্য প্রেরণ করে লেবানন পর্বতমালায়। অতঃপর লেবাননি পর্বতকে উসমানিদের অধীনে রেখে স্বাধীনতা প্রদানের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হবে একজন খ্রিষ্টান। সে তিন বছরকাল প্রেসিডেন্ট থাকবে। ইউরোপের সম্মতি ব্যতীত খলিফা তাকে বরখাস্ত করতে পারবেন না। এ চুক্তির ভিত্তিতে ফ্রান্স লেবানন হতে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়। অতঃপর খলিফা আবদুল মাজিদ ১২৭৭ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

খলিফা আবদুল আজিজ

(১২৭৭-১২৯৩ হি./১৮৬১-১৮৭৬ খ্রি.)

আবদুল আজিজ ছিলেন খলিফা আবদুল মাজিদের ছোট ভাই। উল্লেখ্য যে, তার আমলেই ১২৮৫ হিজরিতে (১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে) সুয়েজ খাল জয় করা হয়। ১২৮৩ হিজরিতে (১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে) ক্রিটে বিদ্রোহ হলে খলিফা তা দমন করেন। খলিফা অধিকহারে বিদেশ ভ্রমণ করেন। তিনি মিশর ও ইউরোপের দেশসমূহে সফর করেন। তিনি রাশিয়াকে কাছে টানার চেষ্টা করেন। এজন্য ইউরোপের দেশসমূহে ভীতি তৈরি হয়। প্রধান উপদেষ্টা আহমাদ মিদহাত পাশা খলিফাকে অপসারিত করার প্রস্তাব করে এবং ১২৯৩ হিজরিতে (১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে) তাকে অপসারণে সমর্থ হয়। মূলত তাকে হত্যা করা হয়। কিন্তু গুজব ছড়ানো হয় যে, তিনি আত্মহত্যা করেছেন।

খলিফা পঞ্চম মুরাদ

(১২৯৩-১২৯৩ হি./১৮৭৬-১৮৭৬ খ্রি.)

পঞ্চম মুরাদ তার ভাই খলিফা আবদুল আজিজের পর খলিফা নিযুক্ত হন। মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে তিন মাসের বেশি তিনি ক্ষমতায় থাকতে পারেননি।

খলিফা দ্বিতীয় আবদুল হামিদ

(১২৯৩-১৩২৭ হি./১৮৭৬-১৯০৯ খ্রি.)

তিনি ১২৯৩ হিজরিতে মৃত্যুবরণকারী খলিফা আবদুল মজিদের পুত্র। দ্বিতীয় আবদুল হামিদের ক্ষমতা গ্রহণকালে সাম্রাজ্য ভেতর ও বাহির উভয় দিক থেকে একেবারে দুর্বল ছিল। তিনি রাষ্ট্রকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেন। এমনকি সকল মুসলিমদেশকে গভীর ঘুম হতে জাগানোর চেষ্টা ছিল তার। তিনি মুসলিমদেরকে ইউরোপের প্রভাবমুক্ত করে ঐক্যবদ্ধ করার ইচ্ছে করেন। তাই তিনি ইসলামি সংঘ গঠনের আহ্বান জানান। দেশের বিশৃঙ্খলা দমনের চেষ্টা করেন। ভেতর-বাহিরে দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে

দূরে থাকার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইউরোপ তাকে মুসলমানদেরকে জাগিয়ে তোলার সুযোগ দেয়নি। তারা তার প্রচেষ্টাকে সর্বাত্মকভাবে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। ভেতর ও বাহিরের সমস্যা দ্বারা তাকে বেষ্টন করে ফেলে। তারা তাকে কোনো কাজই করার সুযোগ দেয়নি।

দেশের ভেতরে

জাতীয়তাবাদের ধারণা প্রচার

উসমানি সাম্রাজ্যে জাতীয়তাবাদের ধারণা ব্যাপক প্রচার পায়। ইতিপূর্বে কখনো এরূপ ঘটেনি। ইউরোপের প্রতি বিমোহিত মুসলমান ও খ্রিষ্টানরা এ কাজের নেতৃত্বে ছিল। খ্রিষ্টানরা এ ধারণা প্রচারের চেষ্টা করে। কারণ, তাদের প্রভাব বিস্তারের এটিই একমাত্র পথ। আরও কারণ হলো, খ্রিষ্টানরা ধর্মীয় গোঁড়ামির পথ অবলম্বন করলে তা দমন করা হতো। কারণ, মুসলমানদের তুলনায় তারা সংখ্যালঘু ছিল। ইউরোপ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে যুক্ত লোকদের সহযোগিতা করত। তারা খ্রিষ্টান মিশনারির মাধ্যমে বা দেশজয়ের মাধ্যমে এ সাহায্য করত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বিজিত এলাকাকে জাতীয়তাবাদী সংগঠনের সদর দপ্তর বা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা।

দোনমে ইহুদিদের প্রভাব বৃদ্ধি

খলিফা সুলাইমান কানুনির স্ত্রী রোকসালানার সার্বিক সহযোগিতায় সুলতান দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইহুদিদেরকে পুনর্বাসিত করেছিলেন। ধীরে ধীরে তারা দেশে প্রভাব বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং দেশধ্বংসের কার্যক্রম শুরু করে। অথচ রাষ্ট্র তাদের সেবায় সকল কিছু উজাড় করে দিয়েছিল। এরূপ করার প্রধান কারণ হলো, তারা মুসলমানদেরকে চিরন্তন শত্রু ভেবে থাকে এবং তাদেরকে ঘৃণা করে। যেমন, আল্লাহ তাআলার বাণী :

﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾

'অবশ্যই আপনি দেখতে পাবেন, মুমিনদের জন্য কঠোরতর শত্রুতা পোষণকারী মানুষ হচ্ছে ইহুদি ও মুশরিকরা।'

[সুরা আল-মায়িদা : ৮২]

দোনমে বারাজ একজন ইহুদি বংশোদ্ভূত লোক। তাকে ইজমিরে সাবাতি নামে ডাকা হয়। ১০৫৭ হিজরিতে সে নিজেকে মাসিহ (যিশু) দাবি করে। ইহুদিরা তাকে হত্যার পদক্ষেপ নিলে সে পলায়ন করে উসমানি সাম্রাজ্যের সীমানায় পৌঁছে যায়। অতঃপর সে পুনরায় ইজমির ফিরে যায়। লোকেরা তাকে আটক করে এডির্নে প্রেরণ করে। এ সময় সে শাস্তির আশঙ্কায় ইসলাম গ্রহণ করেছে মর্মে দাবি করে। উসমানিদেরকে ধোঁকা দিয়ে বলে, আমি ইহুদিদের মাঝে ইসলাম প্রচার করব। মূলত সে ইহুদিদেরকে বাহ্যিকভাবে ইসলাম প্রকাশ করে মুসলমানদের কাতারে অনুপ্রবেশ করার দাওয়াত দিতে থাকে। তার উদ্দেশ্য হলো, ইহুদিদেরকে রাষ্ট্রের কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া এবং ক্ষমতার লাগাম হাতে নিয়ে মুসলমানদের মাঝে সর্বাত্মক শত্রুতার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।

বাস্তবিকই ইহুদিরা তার এ ভাবনাকে অভিবাদন জানায় এবং তারা এ পরিকল্পনার সাথে কাজ করতে থাকে। দ্বিতীয় আবদুল হামিদের আমলে ইহুদিদের জন্য একটি রাষ্ট্র গঠনের দাবি নিয়ে হার্টজেল[৬৩] আত্মপ্রকাশ করে। ফিলিস্তিনকে ইহুদিরাষ্ট্র ঘোষণার দাবি অব্যাহতভাবে জানাতে থাকে সে। ১৩১৪ হিজরিতে (১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে) সুইজারল্যান্ডের বাসেল শহরে অনুষ্ঠিত ইহুদি সমাবেশে সে এ দাবি উত্থাপন করে। হার্টজেল দ্বিতীয় আবদুল হামিদের নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করে। যেন খলিফাকে ফিলিস্তিনে ইহুদিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে প্রলোভিত করতে পারে। কিন্তু খলিফা হার্টজেলের উদ্দেশ্য জানতেন। তাই তিনি তার উদ্দেশ্য সফল হতে দেননি। তিনি ফিলিস্তিনে ইহুদিদের মাইগ্রেসনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। অতঃপর হার্টজেল ইহুদিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ইউরোপের সাহায্য লাভের প্রত্যাশায় ইউরোপে গমন করে। এ সফরে সে ইউরোপের বিরাট সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হয়। তার এ প্রচেষ্টা উসমানি সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হয়ে ওঠে।

সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ হার্টজেলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তাকে যে পত্র লিখেছেন তার ভাষ্য হলো,

> 'তোমরা ড. হার্টজেলকে জানিয়ে দাও যে, সে যেন আজকের পর এ কাজ (ফিলিস্তিনে ইহুদিরাষ্ট্র গঠন) করার কোনোরূপ প্রচেষ্টা

---

৬৩. **থিওডোর হার্টজেল :** ইহুদি জায়নবাদের জনক এবং ইসরাইলের প্রস্তাবদাতা।

> না করে। কেননা, আমি এ দেশের এক বিঘত জায়গাও অন্যের জন্য খালি করতে প্রস্তুত নই। দেশ আমার সম্পদ নয়; বরং এটি জাতির সম্পদ, যা তাদের রক্তে সিক্ত। সুতরাং ইহুদিরা যেন সংযত হয়। মুসলমানরা আমাকে বাইতুল মুকাদ্দাস রক্ষার যে দায়িত্ব দিয়েছে, আমি বাইতুল মুকাদ্দাসকে ইহুদিদের নিকট বিক্রি করে সে দায়িত্বে খিয়ানত করার ছাপ ইতিহাসে বহন করতে প্রস্তুত নই।'[৬৪]

হার্টজেল খিলাফতের কোষাগারে পঞ্চাশ মিলিয়ন স্বর্ণমুদ্রা এবং খলিফার ব্যক্তিগত কোষাগারে পাঁচ মিলিয়ন স্বর্ণমুদ্রা দানের প্রস্তাব করে। অধিকন্তু সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পে আর্থিক সহযোগিতারও প্রস্তাব করে।

ইহুদি ফ্রিমেসনারি আতঙ্ক

এটি একটি ইহুদি সংগঠন। এ সংগঠনের উদ্দেশ্য পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত জাতিকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা এবং এ সকল দলের মাঝে স্থায়ী দ্বন্দ্ব-বিরোধ জাগিয়ে রাখা। এভাবেই ইহুদিরা জমিনে বসবাসকারী জাতিসমূহকে নিশ্চিহ্ন করে পৃথিবীতে নিজেরা একাই বসবাস করার বাসনা লালন করে। ফ্রিমেসনারিরা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে সাহায্য করে এবং নেতৃত্বলোভী ব্যক্তিকে সমর্থন দিয়ে থাকে। তাদের সদস্য সংখ্যা অনেক, যারা পরস্পরকে সাহায্য করে। উসমানি সাম্রাজ্যের ফ্রিমেসনরা তাদের কাজ করার ক্ষেত্র পেয়ে যায়। এ ভূমি তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য উর্বর। তাই তারা এ সাম্রাজ্যে প্রভাব বৃদ্ধির জন্য কাজ করে যায়।

ঐক্য ও উন্নয়ন সংগঠন

ইউরোপপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদীরা তাদের চিন্তাধারার ধারক-বাহক বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন তৈরি করে। এ সকল সংগঠন নাগরিকদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ফ্রিমেসনের বহু সদস্যকে লক্ষ্য হাসিলের উদ্দেশ্যে দলে টেনে নেওয়া হয়। এ সকল সংগঠনের মাঝে রয়েছে, তুর্কি মহিলা সমিতি, যা প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত হয়। বার্লিনে এ সমিতির বেশকিছু শাখা রয়েছে। উসমানি সাম্রাজ্যের সেলুনিক ও ইস্তাম্বুল শহরে তাদের শাখা ছিল। তারা সেনাদের মাঝে অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম

---

৬৪. *আল ইয়াহুদ ওয়াদ দাওলাতুল উসমানিয়া* : ১১৬

হয়। উসমানি ঐক্য সংগঠন নামে তাদের একটি সামরিক ইউনিট ছিল। তাদের একটি সিভিল শাখা ছিল, যার নাম 'শৃঙ্খলা ও উন্নয়ন'। উভয় শাখা 'ঐক্য ও উন্নয়ন' নামে তাদের সংগঠন করার পক্ষপাতী ছিল। ফ্রিমেসনারিরা তাদের প্রজ্ঞাপন ও মুখপত্র ছিল। পেছনে থেকে ইসলামের শত্রুদের সকলে এ সংগঠনের পক্ষে কাজ করে যায়।

দেশে ঐক্য ও উন্নয়ন সংগঠনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। ইস্তাম্বুলের ফার্স্ট ক্লাস অফিসারদের অনেকে এ দলে যোগ দেয়। অনুরূপ ইউরোপে নিয়োজিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির অফিসারগণও এ দলে যোগ দেয়।

ঐক্য ও উন্নয়ন পার্টি প্রকাণ্ড রূপ ধারণ করে এবং সৈন্যদের মাঝে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। পার্টির নেতারা সরকারের ওপর সংবিধান ঘোষণার জন্য চাপ দেয়। তাদের বিরুদ্ধে যাওয়ার ক্ষমতা খলিফার ছিল না। তাই তিনি সংবিধান ঘোষণা করেন।

ইউনাইডেট পার্টি পার্লামেন্টে মেজরিটি আসন দখল করে নেয়। তারা দেখতে পেল যে, খলিফা তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নে অসমর্থ, তাই তারা দেশে অস্থিতিশীলতাকে উসকে দেয়। একটি অংশ পার্লামেন্ট অভিমুখে যাত্রা করে। তারা সংবিধানের বিরোধিতা করে এবং ইসলামি আইন বাস্তবায়নের দাবি তোলে। তারা ঐক্য ও উন্নয়ন পার্টির সদস্যদেরকে বরখাস্ত করার জন্য খলিফার নিকট দাবি জানায়।

এ সকল বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরির পেছনে ঐক্য ও উন্নয়ন পার্টির হাত রয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য হলো, বিশৃঙ্খলাকে কারণ দেখিয়ে সেলোনিকিতে অবস্থানকারী সৈন্যরা যেন সংবিধান ও সংসদ রক্ষার যুক্তিতে এগিয়ে আসে। বাস্তবেই তারা ইস্তাম্বুল দখলে নিতে সমর্থ হয়। তারা খলিফা দ্বিতীয় আবদুল হামিদকে বরখাস্ত করে এবং তৎস্থলে খলিফার ভাই পঞ্চম মুহাম্মাদকে স্থলাভিষিক্ত করে। এভাবেই সর্বময় ক্ষমতা খলিফার হাত থেকে ঐক্য ও উন্নয়ন পার্টির হাতে চলে আসে। তারপর তারা দেশকে ধ্বংস গহ্বরের কিনারায় নিয়ে যায়। দ্বিতীয় আবদুল হামিদই শেষ খলিফা, যার দেশব্যাপী শাসন চলেছে। পরবর্তী সময়ে যারা খলিফা হয়েছেন, তারা বাহ্যত ক্ষমতায় ছিলেন। প্রকৃত ক্ষমতা ঐক্য ও উন্নয়ন পার্টির লোকদের হাতে ছিল।

খলিফা দ্বিতীয় আবদুল হামিদ তার আমলে মাদরাসা, বিশ্ববিদ্যালয়, লাইব্রেরি, হাসপাতাল, শিক্ষক প্রশিক্ষণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পানির পাইপ, দামেশক হতে মদিনা পর্যন্ত রেললাইন ইত্যাদি স্থাপন করেন। জার্মান সেনা-অফিসার দ্বারা সেনাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এ ছাড়া আরও অনেক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেন। ইসলামের শত্রুরা তাকে তার কাজ সম্পূর্ণ করার সুযোগ দেয়নি।

ইউরোপের রাজ্যসমূহে বিদ্রোহ

ইউরোপ উসমানি সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহ ছড়িয়ে দিতে কাজ করে। বিশেষত ইউরোপের প্রদেশসমূহে তারা এরূপ করেছে, যেন এ বিদ্রোহ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভূমিকাস্বরূপ কাজ করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপে যেন মুসলমানদের ক্ষমতা অবশিষ্ট না থাকে।

এ সকল বিদ্রোহের মাঝে হার্জেগোভিনার বিদ্রোহও রয়েছে। খলিফা এ বিদ্রোহ দমন করেন। ইউরোপ বিদ্রোহের সুযোগে উসমানি সাম্রাজ্যে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ খুঁজতে থাকে। তারা সাম্রাজ্যের ওপর খ্রিষ্টানদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট দাবিদাওয়ার তালিকা চাপিয়ে দেয়। বুলগেরিয়াতেও বিদ্রোহ হয়েছে। রুশরা কতিপয় শারকাসিয়ান পরিবারের ভূমি দখল করার পর উসমানিরা তাদেরকে বুলগেরিয়ায় পুনর্বাসন করে। এজন্য তাদের মাঝে বিদ্রোহ সৃষ্টি হয়। রুশরা এ বিদ্রোহের মূল ইন্ধনদাতা। অস্ট্রিয়া রুশদের দোসর ছিল। এ দুটি রাষ্ট্র বুলগেরিয়া, সার্বিয়া, মন্টেনিগ্রো ও অন্যান্য স্থানে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনকারীদেরকে উসকানি দিত।

সার্বিয়া ও মন্টেনিগ্রোর বিদ্রোহ

রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া মিলে সার্বিয়া ও মন্টেনিগ্রোকে উসমানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করে। অস্ট্রিয়া বসনিয়া-হার্জেগোভিনা দখল করতে চেয়েছে। অপরপক্ষে রাশিয়া ওয়ালাচিয়া, মোলদাভিয়া ও বুলগেরিয়া দখল করতে চেয়েছে। রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া উভয়ে মিলে সার্বিয়া ও মন্টেনিগ্রোকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, যুদ্ধ বেধে গেলে তারা পাশে থাকবে। অতঃপর সার্বিয়া বসনিয়ার বিদ্রোহ দমানোর দাবি করার মাধ্যমে যুদ্ধের সূত্রতা হয়। এদিকে মন্টেনিগ্রো হার্জেগোভিনায় বেশিরভাগ অংশ দাবি করে। খলিফা তাদের দাবির প্রতি কোনো গুরুত্বই দেননি। যার কারণে তাদের সৈন্যরা উসমানি ভূখণ্ডে প্রবেশ করা শুরু করে। মূলত এরা ছিল রুশ সৈন্য, যারা

সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। রুশদের সাথেই যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে খলিফা বিজয় লাভ করেন। বিশেষত মিশরীয় বাহিনী পৌঁছার পর সার্বদের ওপর বিজয় নিশ্চিত হয়। এ বাহিনী বেলগ্রেডের উপকণ্ঠে পৌঁছে যায়। তবে ইউরোপের হস্তক্ষেপে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায়।

ইউরোপের রাষ্ট্রদূতগণ বুলগেরিয়াকে দুটি প্রদেশে বিভক্ত করার একটি পরিকল্পনা খলিফার নিকট পেশ করে। যাতে উল্লেখ রয়েছে যে, দুদেশে দুজন খ্রিষ্টান শাসক নিয়োগ করা হবে। রক্ষীবাহিনী সীমান্তরক্ষী বাহিনীর অর্ধেক খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী থাকবে। বসনিয়া হার্জেগোভিনাতেও অনুরূপ পদ্ধতি গ্রহণের প্রস্তাব করে তারা। তাদের দাবির মাঝে আরও রয়েছে যে, সার্বিয়া ও মন্টেনিগ্রোকে হার্জেগোভিনায় কিছু অংশ দিতে হবে। খলিফা তাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করলে রাষ্ট্রদূতরা উসমানি রাষ্ট্র ছেড়ে যায়। যা এক প্রকার রাজনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রতি ইঙ্গিতবহ ঘটনা ছিল।

খলিফা এককভাবে সার্বিয়ার সাথে চুক্তি করে। সার্বিয়ার দাবি অনুসারে খলিফা তার বাহিনীকে ফেরত নেবে। সার্বিয়া নতুন দুর্গ নির্মাণ না করার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং সার্বিয়াতে সার্বিয়ার ও উসমানি পতাকা উত্তোলনের সিদ্ধান্ত হয়। তা দ্বারা এ কথা বোঝানো উদ্দেশ্য যে, সার্বিয়া উসমানিদের তত্ত্বাবধানে ও তাদের রক্ষণাবেক্ষণে আছে।

বিদেশের মাটিতে উসমানিদের কার্যক্রম

রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ

ইউরোপীয় দেশসমূহ উসমানি সাম্রাজ্যে বসবাসরত খ্রিষ্টানদের জীবনযাপন সুন্দর করতে খলিফার নিকট একটি প্রস্তাব পেশ করে। প্রস্তাবে পরিস্থিতি সুন্দর করার কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করার জন্য ইউরোপকে সুযোগ দিতে আহ্বান করা হয়।

খলিফা প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ, প্রস্তাবটি রাষ্ট্রীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপের শামিল। রাশিয়া এ প্রত্যাখ্যানকে সুযোগ মনে করে। সে এটিকে যুদ্ধের কারণস্বরূপ যথেষ্ট মনে করে। এবারে ইউরোপ উসমানি সাম্রাজ্যে যথেচ্ছ হস্তক্ষেপ করতে রাশিয়ার জন্য লাগাম ছেড়ে দেয়। রাশিয়া ওয়ালাচিয়া ও মোলদাভিয়ার সাথে এ মর্মে চুক্তি করে যে, রাশিয়া খিলাফতরাষ্ট্রে হস্তক্ষেপকালে তারা উভয়ে তাদের সর্বাত্মক ক্ষমতা প্রয়োগ করবে। রাশিয়া ওয়ালাচিয়া ও মোলদাভিয়া প্রবেশ করে। অতঃপর দানিয়ুব নদী পার হয়ে বুলগেরিয়ায় প্রবেশ করে এবং এডির্নে দখল করে নেয়। এগোতে এগোতে তারা ইস্তাম্বুলের ৫০ কিলোমিটার নিকটে পৌঁছে যায়। একই সময় পূর্ব দিক থেকে রুশদের অপর একটি বাহিনী আনাতোলিয়ায় এসে পৌঁছে। এ সময় সুযোগ বুঝে সার্বিয়া ও মন্টেনিগ্রো স্বাধীনতা ঘোষণা করে। উসমানিরা বাধ্য হয়ে রাশিয়ার সাথে শান্তিচুক্তি করে।

উল্লেখ্য যে, বুলগেরিয়ার খ্রিষ্টানরা রাশিয়ার অনুপ্রবেশের সুযোগে সেখানে বসবাসরত মুসলিমদের নিধন করা শুরু করে। তারা বীভৎস অপরাধ সংঘটিত করে। মুসলমানদের একাংশ যার যার মতো পালিয়ে যায়, কেউ কেউ পাহাড়ে আশ্রয় নেয় এবং বুলগেরিয়ায় অপরাধ সংঘটনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নেয়।

সান স্টেফানো চুক্তি

যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার পর ১২৯৫ হিজরিতে (১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে) রাশিয়া ও অন্যান্য দেশের সাথে খলিফা সান স্টেফানো চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তির বর্ণনা নিম্নরূপ :

- সার্বিয়া ও মন্টেনিগ্রো উসমানি রাষ্ট্র হতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে।
- ওয়ালাচিয়া ও মোলদাভিয়া স্বাধীন হয়ে রোমানিয়া রাজ্য গঠিত হবে, যাতে ট্রান্সসিলভানিয়া ও বেসারাবিয়া যোগ দেবে।
- বুলগেরিয়া প্রশাসনিক স্বাধীনতা লাভ করবে এবং তা উসমানি সৈন্যমুক্ত থাকবে।
- যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ খলিফা রাশিয়াকে ২৪, ৫২, ১৭, ৩৯১ সোনার লিরা প্রদান করবে। আর এ মুদ্রার পরিবর্তে রাশিয়া উসমানি রাষ্ট্রের ভূমিও গ্রহণ করতে পারবে।
- উসমানিরা যে ভূমি হারিয়েছে তা তারা ফেরত পাবে না। সেখানে বসবাসকারী মুসলমানগণ সেই এলাকা ছেড়ে যাবে। তবে তাদের জন্য তাদের জায়গা বিক্রি করে যাওয়ার সুযোগ থাকবে।
- উসমানি প্রণালিসমূহে রাশিয়ার জাহাজ চলাচলের স্বাধীনতা থাকবে।
- উসমানি সাম্রাজ্যে বসবাসকারী খ্রিষ্টানদের জীবনযাপনের অবস্থা ভালো করতে হবে।

ইউরোপের অবশিষ্ট দেশসমূহ উসমানি সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশও গ্রাস করতে চেয়েছে। ইংল্যান্ড রুশদের পক্ষ হতে ঝুঁকি বৃদ্ধির আশঙ্কায় সাইপ্রাস রক্ষার নামে তা দখল করে নেয়। খলিফা বাধ্য হয়ে ইংল্যান্ডের এ দখলদারি মেনে নেন। অতঃপর ইউরোপের উসমানি রাজ্যসমূহ ইউরোপের মাঝে বণ্টনের লক্ষ্যে বার্লিন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১২৯৫ হিজরিতে (১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে) বার্লিন চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ চুক্তিতে সান স্টেফানো চুক্তির পরিবর্তন আনা হয়। চুক্তির ভাষ্য হলো :

- চূড়ান্তভাবে বুলগেরিয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হবে।
- অস্ট্রিয়াকে বসনিয়া-হার্জেগোভিনা প্রদান করা হবে।
- রাশিয়াকে বেসারাবিয়া প্রদান করা হবে এবং রোমানিয়া দুবরুজা প্রদেশ নিয়ন্ত্রণ করবে।

- ইউরোপে উসমানিদের এক রাজ্য থাকবে, যার নাম পূর্ব রুমেলি। এটি গঠিত হবে বুলগেরিয়া, মেসিডোনিয়া, আলবেনিয়া, কসোভা ও গ্রিসের একাংশ নিয়ে। রাশিয়া ও উসমানি সাম্রাজ্য প্রতিরক্ষার দায়িত্বে থাকবে। আর প্রশাসক হবে একজন খ্রিষ্টান।
- উত্তরে গ্রিসের সীমানা বৃদ্ধি পাবে। অথচ যুদ্ধে গ্রিস কোনো পক্ষেই ছিল না।

তিউনিসিয়া দখল

ফ্রান্স ১২৯৯ হিজরিতে (১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে) তিউনিসিয়া দখল করতে সক্ষম হয়। তাদের মোকাবিলায় উসমানিরা কিছুই করতে পারেনি।

মিশর দখল

ইংল্যান্ড মিশরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে। তারা ১২৯৯ হিজরিতে গ্রেট হিল যুদ্ধের পর মিশর দখল করে নেয়।

সুদান দখল

মুহাম্মাদ আলি সুদান জয়ের পর থেকে সুদান মিশরের শাসনাধীন ছিল। ইংরেজরা মিশর দখল করার পর সুদানের প্রতি তাদের চোখ পড়ে। প্রতীক্ষিত মাহদি দাবিদারের মাহদিয়া আন্দোলনকে কাজে লাগিয়ে ইংরেজরা সুদানের অধিকাংশ এলাকা দখল করে নেয়। তারা মাহদিয়া আন্দোলনকে দমন করে সুদানে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

মিশরের নিয়ন্ত্রণাধীন পূর্ব আফ্রিকা

ফ্রান্স ও ইতালি ইথিওপিয়ার সাথে এ দেশটি ভাগাভাগি করে নেয়। খলিফাকে অপসারণের পর তিনি ১৩৩৬ হিজরিতে (১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে) ইনতেকাল করেন।

খলিফা পঞ্চম মুহাম্মাদ

(১৩২৭-১৩৩৬ হি./১৯০৯-১৯১৮ খ্রি.)

বস্তুত ঐক্য ও উন্নয়ন পার্টিই উসমানি সাম্রাজ্যের প্রকৃত শাসকে পরিণত হয়। খলিফার হাতে কোনোকিছুই অবশিষ্ট ছিল না। পঞ্চম মুহাম্মাদ তার ভাইকে অপসারণের পর খলিফার পদ গ্রহণ করেন।

ইতালি কর্তৃক লিবিয়া দখল

ইংল্যান্ড মিশর জয়ের পর ত্রিপোলি ছাড়া উসমানিদের দখলে আফ্রিকার আর কোনো ভূখণ্ড অবশিষ্ট রইল না। ফ্রান্স মরক্কো দখল করে নিয়েছে। ইতালিও এ রুগ্ণ সাম্রাজ্যের ভাগ চাইল। তাই তারা লিবিয়াকে টার্গেট করে, তথায় ভূমি ক্রয় ও খ্রিষ্টান মিশনারি প্রেরণের মাধ্যমে লিবিয়া দখলের ছক আঁকে। লিবিয়া দখলের উপায় হাতে পাওয়ার পর তারা সে উপায়কে সুযোগ মনে করে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। তারা লিবীয়দেরকে সভ্যতা শেখানোর কথা বলে ১২৩৮ হিজরিতে তা দখলে নেয়।

উসমানিরা আজিজে মিশর ও ফিদাইনদের নেতৃত্বে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তারা কিছুটা বিজয় ছিনিয়ে আনে। অতঃপর ইতালি ইস্তাম্বুল দখলের হুমকি প্রদান করে এবং বন্দরে আক্রমণ করে। ফলে উসমানিরা বাধ্য হয়ে ১৩২৯ হিজরিতে ইতালির সাথে শান্তিচুক্তি সই করে। চুক্তি মোতাবেক খলিফার মুজাহিদ বাহিনী মিশরের প্রতিরোধ তুলে নেবে এবং লিবিয়া হতে তার বাহিনীকে প্রত্যাহার করে নেবে।

বলকান যুদ্ধ

প্রথম বলকান যুদ্ধ

(১৩৩০ হি.)

বলকানের স্বাধীন দেশ মন্টেনিগ্রো, সার্বিয়া, বুলগেরিয়া ও গ্রিক জোটবদ্ধ হয়ে উসমানি সাম্রাজ্যে ভাগ বসানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করে তারা পূর্ব রুমেলি দখল করে নেয়। যুদ্ধে উসমানিদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে। এ যুদ্ধে প্রথম বলকান জেট বিমান ব্যবহার করে এডির্নে বোমা নিক্ষেপ করে। যুদ্ধের ফল হিসেবে আলবেনিয়া উসমানিদের থেকে স্বাধীন হয়ে

যায়। আর পূর্ব রুমেল্লি-বলকান জোট নিজেদের মাঝে ভাগ করে নিয়ে যায়।

ঐক্য ও উন্নয়ন পার্টির প্রত্যাবর্তন

উসমানিদের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে প্রথম বলকান যুদ্ধ শেষ হয়। এর পরপরই ত্রিপোলিতে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সেনা অফিসার আনোয়ার পাশা সেনা অভ্যুত্থান ঘটায়। তার সাথে ঐক্য ও উন্নয়ন পার্টির আরও অফিসার যোগ দিয়েছিল। সে মন্ত্রীদেরকে পদত্যাগে বাধ্য করতে সমর্থ হয়। অতঃপর নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। মুহাম্মাদ শওকত প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হয়। সে ঐক্য ও উন্নয়ন পার্টির কেউ নয়। ক্ষমতা গ্রহণের ছয় মাসের মাথায় তাকে হত্যা করা হয় এবং তৎস্থলে ঐক্য ও উন্নয়ন পার্টির জনৈক সেনা অফিসারকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়।

দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ

(১৩৩২ হি./১৯১৪ খ্রি.)

মেসিডোনিয়ার বণ্টন নিয়ে বিরোধের জেরে বলকান জোটের মাঝে যুদ্ধটি সংঘটিত হয়। বুলগেরিয়া পুরো মেসিডোনিয়ার মালিকানা দাবি করে। এদিকে বলকান দেশগুলোও মেসিডোনিয়ার ভাগ চায়। ফলে বুলগেরিয়া ও অন্যান্য বলকান দেশ গ্রিক, রোমানিয়া ও সার্বিয়া জোটের মাঝে যুদ্ধ বাধে। উসমানিরা জোটের পক্ষ নেয়। যুদ্ধে বুলগেরিয়া পরাজিত হয়। অতঃপর মেসিডোনিয়াকে সার্বিয়া, গ্রিস ও বুলগেরিয়ার মাঝে বণ্টন করা হয়। একই সময় প্রথম বলকান যুদ্ধে হারানো টারাকিয়া ও এডির্নে শহর উসমানিরা ফিরে পায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

সকল বিরোধিতা কাটিয়ে উঠে প্রতিরক্ষামন্ত্রী আনোয়ার পাশা দেশকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে টেনে নিতে সক্ষম হন। যুদ্ধে আকৃষ্ট করতে জার্মানি উসমানিদেরকে পাঁচ মিলিয়ন স্বর্ণমুদ্রা ঋণ প্রদান করে। বিরোধিরাও এজন্য যুদ্ধের শপথ নিতে উৎসাহিত হয়।

প্রথমদিকে উসমানিরা মিত্রবাহিনীর দেশসমূহের সাথে দরকষাকষি করতে চেয়েছিল। যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকার জন্য উসমানিরা কতিপয় শর্ত আরোপ করে। যেমন, বিদেশিরা যে সুযোগ উসমানিদের থেকে গ্রহণ করত, তা বাতিল করে মিশর থেকে ইংরেজদের বেরিয়ে যাওয়া, এজিয়ান সাগর

উসমানিদের প্রদান করা এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়ে রাশিয়ার হস্তক্ষেপ বন্ধ করা। কিন্তু মিত্রবাহিনী এ প্রস্তাবের কোনো জবাব দেয়নি। ফলে উসমানিরা যুদ্ধে যোগ দেয়। এটি কোমর ভাঙার যুদ্ধ ছিল। চারটি ফ্রন্টে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেগুলো হলো :

১. পূর্ব ফ্রন্ট

এ ফ্রন্টে আনোয়ার পাশা প্রচণ্ড শীত মৌসুমে পূর্বাঞ্চলে রাশিয়ার ওপর আক্রমণ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হয়ে সরে আসেন।

২. সুয়েজ খাল ফ্রন্ট

উসমানি বাহিনী সিনাই হতে সুয়েজখালের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সম্মত হওয়া মিশরীয়দের সাথে নির্দিষ্ট সময় তাদের যোগ দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় আসার পূর্বেই তারা ইংরেজদের ওপর একাকী আক্রমণ করে ব্যর্থ হয়। এরপর জার্মানির নেতৃত্বে দু-দুটি আক্রমণও ব্যর্থ হয়।

৩. এডেন ফ্রন্ট

এ ফ্রন্টের যুদ্ধে উসমানিরা এডেন হতে ইংরেজদেরকে হটাতে চেয়েও ব্যর্থ হয়। ইয়েমেনের শাসক ইদরিসি উসমানিদের ওপর কঠোর চাপ সৃষ্টিতে সহযোগিতা করে।

৪. দার্দানেলিস ফ্রন্ট

উসমানিরা দার্দানেলিস প্রণালিতে বেষ্টনী গড়ে তোলে, যেন শত্রুরা ইস্তাম্বুল পৌঁছতে না পারে। ইংরেজরা উসমানি সাম্রাজ্যের ওপর আক্রমণ শুরু করে। তারা ফিলিস্তিন দখল করে নেয়। ইংরেজ সেনাপতি এলেনবি বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌঁছার পর তার প্রসিদ্ধ উক্তিটি উচ্চারণ করেছিল : 'আজ ক্রুসেড যুদ্ধ সমাপ্ত হলো।' এদিকে ফ্রান্স এসে সিরিয়া দখল করে নেয়।

খলিফা ষষ্ঠ মুহাম্মাদ

(১৩৩৬-১৩৪১ হি./১৯১৮-১৯২২ খ্রি.)

ষষ্ঠ মুহাম্মাদ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় উসমানিরা ধারাবাহিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছিল। সুলতান গাজি মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ ইস্তাম্বুল বিজয়ের পর এই প্রথমবারের মতো মিত্রবাহিনী ইস্তাম্বুল দখল করে পতন ঘটাতে সমর্থ হয়।

ইতালি দক্ষিণ আনাতোলিয়রা একটি অংশ দখল করে নেয়। আর গ্রিস আনাতোলিয়ার পশ্চিমাঞ্চল দখল করে। অধিকন্তু তারা টারাকিয়াও[৬৫] দখল করে নেয়। ফলে উসমানি সাম্রাজ্য আত্মসমর্পণ করে। এরূপভাবে ঐক্য ও উন্নয়ন পার্টি ক্ষমতা গ্রহণের স্বল্প সময়ের মাঝে দেশকে ধ্বংস করে এবং কয়েক শতাব্দী পেছনে নিয়ে যায়। তারা দেশটিকে লাঞ্ছনা, অপদস্ত ও মারাত্মক পরাজয়ের পোষাক আচ্ছাদিত করায়।

এ সময় খলিফা ষষ্ঠ মুহাম্মাদ ক্ষমতা লাভের পর মোস্তফা কামালকে কাছে টানেন। ক্রাউন প্রিন্স থাকাকালে মোস্তফা কামাল বার্লিন সফরে খলিফার সঙ্গী ছিল। তখন মোস্তফা কামাল নিজস্ব কাজে ব্যস্ত ছিল। খলিফা তার পূর্বসূরিদের মতো নামমাত্র খলিফা থাকা পছন্দ করলেন না। তিনি খলিফা আবদুল আজিজের পুত্র দ্বিতীয় আবদুল মাজিদকে ক্ষমতা দিয়ে পদ ছাড়েন।

মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক

স্মর্তব্য যে, আমাদের কামাল আতাতুর্ক সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করার প্রয়োজন রয়েছে। তাকে আতাতুর্ক বা তুর্কি জাতির পিতা উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এ লোকটি থেসালোনিকিতে জন্ম নেয়। উসমানি সাম্রাজ্যে দোনমে ইহুদিদের বড় একটি কলোনি এটি। এজন্য অনেকে তার দোনমে ইহুদিভুক্ত হওয়াকে প্রাধান্য দেন। তার নিকৃষ্ট কার্যকলাপ ও ইসলামের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রামের কারণে তাকে ইহুদি মনে করা হয়।

---

৬৫. **টারাকিয়া বা থ্রেস :** বলকানের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের একটি ঐতিহাসিক শহর। এটি গ্রিসের পূর্বাঞ্চল, বুলগেরিয়ার দক্ষিণাঞ্চল এবং তুরস্কের ইউরোপীয় অংশকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। -সম্পাদক

সে ঐক্য ও উন্নয়ন পার্টির সদস্য এবং সিরিয়াতে উসমানি সেনাবাহিনীর একজন কমান্ডার ছিল। মিত্রবাহিনী হতে সে সবসময় পালিয়ে বেড়াত। কথিত আছে যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সে সিরিয়া হতে আনাতোলিয়া পর্যন্ত পালিয়ে বেড়িয়েছে।

ইসলামের শত্রুরা তাদের কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিটিকে খুঁজে পায়। এ লোকটিই মুসলমানদেরকে ধ্বংসের জায়গায় নিয়ে যায়। সে নিজেকে মুসলমান দাবি করে এরূপ কাজ করতে সক্ষম হয়। মিত্রবাহিনী তাকে উসমানি সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেয় যাতে তার কাঁধেই উসমানি সাম্রাজ্যের বাকি অংশটুকুও কবজা করার গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা যায়। এজন্য চটজলদি সকলে সিওয়াসে সমবেত হয় দেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে সম্মেলনে যোগ দিতে। সভায় আতাতুর্ককে সভাপতি নিয়োজিত করা হয়। সম্মেলন শেষে আতাতুর্ক আঙ্কারায় গমন করে এবং উসমানি সরকারের বিরোধিতা আরম্ভ করে। মিত্ররা সরকারের ওপর কঠোর শর্তারোপ করার ক্ষেত্রে তাকে সাহায্য করে। এমনকি তারা সরকারকে শর্তসমূহ মেনে নিতে বাধ্য করে।

শর্তাবলির মাঝে রয়েছে ইস্তাম্বুলে একটি রাষ্ট্র গঠন করা, আরব রাজ্যসমূহকে উসমানিদের থেকে আলাদা করা, আর্মেনিয়াকে স্বাধীনতা প্রদান করা, কুর্দিস্তানকে স্বাধীনতা দেওয়া, টারাকিয়া ও এজিয়ান সাগর গ্রিসকে প্রদান করা, প্রণালিগুলো আন্তর্জাতিক তদারকিতে ছেড়ে দেওয়া, মিত্রবাহিনীর ওপর কোষাগারের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেওয়া, মিত্রদের সীমানায় নিয়োজিত সৈন্য ফিরিয়ে আনা এবং তাদের সংখ্যা হ্রাস করা।

সে মুহূর্তে আতাতুর্ক উসমানিদের জন্য একটি নতুন সংসদ স্থাপনের ঘোষণা দেয়। অর্থাৎ, আঙ্কারায় অপর একটি সরকার থাকবে। সে মিত্রদের শর্ত রক্ষার্থে ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে। মিত্ররা আতাতুর্কের জন্য রশি ছেড়ে দেয়, যেন সে নায়করূপে আবির্ভূত হতে পারে। তারা গ্রিসকে একাকী তুর্কিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ছেড়ে দেয়। এতে তুর্কিরা কোনো কোনো যুদ্ধে বিজয় লাভ করতে সক্ষম হয়। যেমন সাকারিয়া যুদ্ধ। এরপর গ্রিস আনাতোলিয়া ও টারাকিয়া থেকে ১৩৪০ হিজরিতে (১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে) সৈন্য প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। ফ্রান্স কিলিকিয়া থেকে এবং ইতালি এন্তাকিয়া থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়। যুদ্ধ চলাকালে রাশিয়া

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে ব্যস্ত ছিল। আতাতুর্ক রাশিয়াকে যুদ্ধ বন্ধের বিনিময়ে কৃষ্ণসাগরতীরের বাতুম শহর ছেড়ে দিতে চুক্তি করে।

খলিফা দ্বিতীয় আবদুল মাজিদ
(১৩৪১-১৩৪২ হি./১৯২২-১৯২৪ খ্রি.)

লুজান সম্মেলন

দ্বিতীয় আবদুল মাজিদ ক্ষমতাসীন হওয়ার তিনদিন পর ১৩৪১ হিজরিতে (১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে) লুজান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে আঙ্কারা সরকারের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে ইংল্যান্ড তুরস্ককে চারটি শর্তে স্বীকৃতি দিতে সম্মত হয়। এ চারটি শর্ত কার্জুন শর্ত নামে খ্যাত। শর্তগুলো হচ্ছে :

- উসমানি খিলাফত বাতিল ঘোষণা।
- ইসলামের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা।
- খিলাফতের সমর্থকদেরকে দেশ থেকে বের করে দেওয়া।
- ইসলামি আদর্শে রচিত প্রাক্তন তুর্কি সংবিধানের পরিবর্তে সিভিল সংবিধান গ্রহণ করা।

কেউ কেউ খলিফার চতুষ্পার্শ্বে জড়ো হতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আতাতুর্কের শক্তি বেড়ে যাওয়ায় সে পথের কাঁটা দূরীভূত করতে সক্ষম হয়। সে ১৩৪১ হিজরিতে খিলাফত ব্যবস্থা বাতিল ঘোষণা করে এবং গণতান্ত্রিক তুরস্ক প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। ধর্মীয় চাকরির পদ বিলুপ্ত করতে এবং নারীদের হিজাব খুলে নিতে সৈন্য নিয়োগ করে। সাংবিধানিকভাবে দেশের সর্বত্র তার মূর্তি স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। তুর্কি ভাষায় আজান দেওয়া এবং তুর্কি ভাষা আরবি হরফের পরিবর্তে ল্যাটিন হরফে লেখার নির্দেশ দেয়। এ ছাড়া আরও এমন বহু কুকর্ম করে, যা কোনো (প্রকাশ্য) কাফেরও করতে সাহস করে না। বড়ই আফসোস! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানা হতে চালু থাকা খিলাফতব্যবস্থা এ নরাধমের হাতে নিঃশেষ হয়ে যায় এবং যা অদ্যাবধি একই অবস্থায় রয়েছে।

উসমানি খলিফাগণের বংশলতিকা

প্রথম উসমান (১)
(৬৯৮-৭২৬ হি./১২৯৯-১৩২৬ খ্রি.)

↓

উরখান গাজি (২)
(৭২৬-৭৬৩ হি./১৩২৬-১৩৬২ খ্রি.)

↓

প্রথম মুরাদ (৩)
(৭৬৩-৭৯১ হি./১৩৬২-১৩৮৯ খ্রি.)

↓

প্রথম বায়েজিদ (৪)
(৭৯১-৮০৪ হি./১৩৮৯-১৪০২ খ্রি.)

↓

প্রথম মুহাম্মাদ (৫)[১]
(৮১৬-৮২৪ হি./১৪১৩-১৪২১ খ্রি.)

↓

দ্বিতীয় মুরাদ (৬)
(৮২৪-৮৪৮ হি./১৪২১-১৪৪৪ খ্রি.—১ম মেয়াদ)
(৮৫০-৮৫৫ হি./১৪৪৬-১৪৫১ খ্রি.—২য় মেয়াদ)

↓

দ্বিতীয় মুহাম্মাদ (৭)
(৮৪৮-৮৫০ হি./১৪৪৪-১৪৪৬ খ্রি.—১ম মেয়াদ)
(৮৫৫-৮৮৬ হি./১৪৫১-১৪৮১ খ্রি.—২য় মেয়াদ)

↓

দ্বিতীয় বায়েজিদ (৮)
(৮৮৬-৯১৮ হি./১৪৮১-১৫১২ খ্রি.)

↓

প্রথম সেলিম (৯)[২]
(৯১৮-৯২৬ হি./১৫১২-১৫২০ খ্রি.)

↓

প্রথম সুলাইমান (১০)
(৯২৬-৯৭৪ হি./১৫২০-১৫৬৬ খ্রি.)

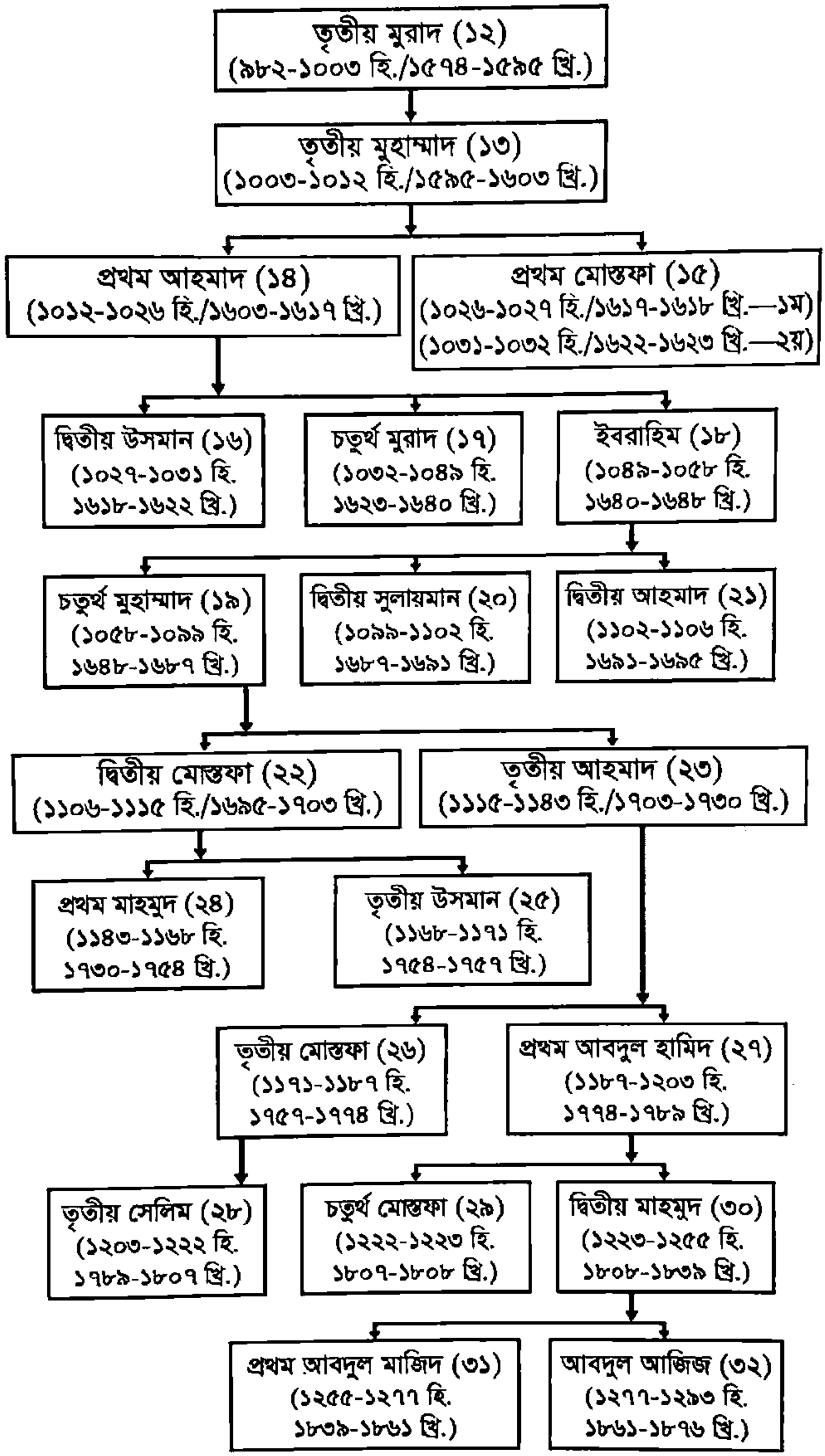
↓

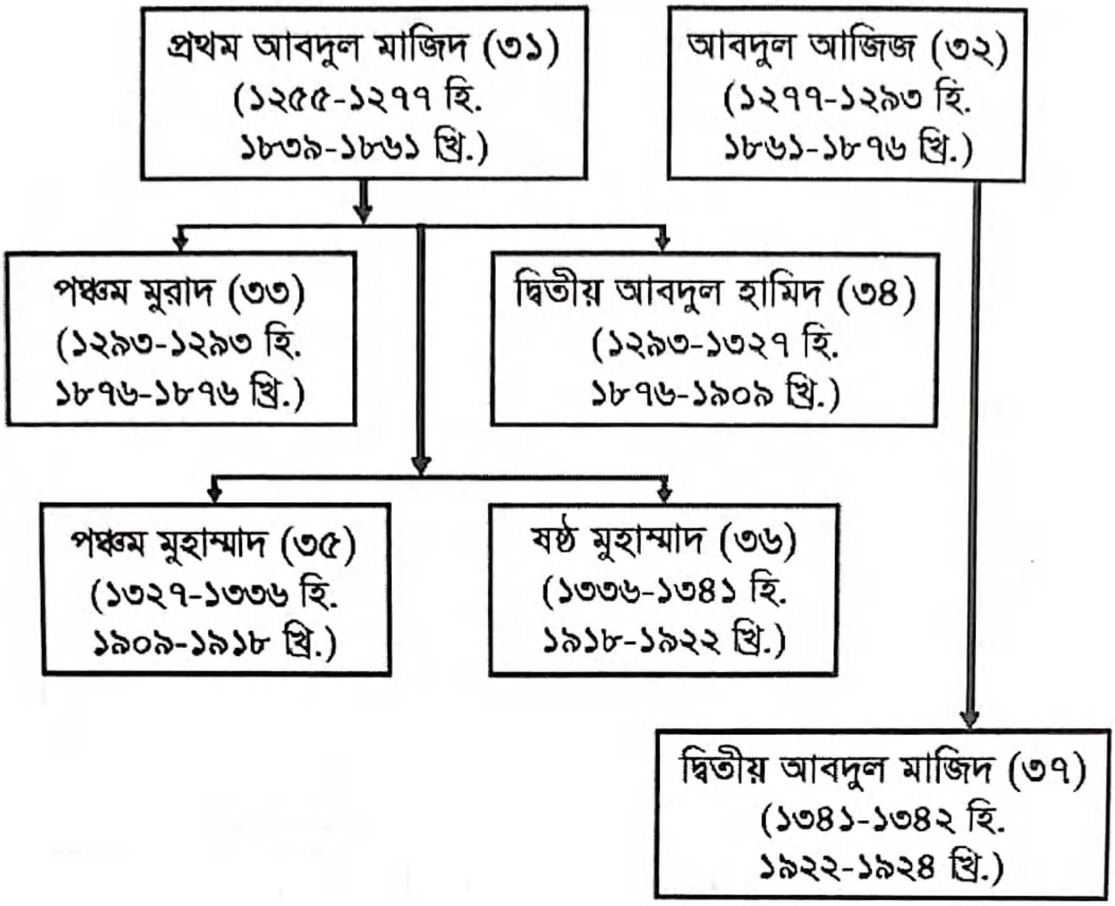
দ্বিতীয় সেলিম (১১)
(৯৭৪-৯৮২ হি./১৫৬৬-১৫৭৪ খ্রি.)

---

১. মাঝের সময়টুকুতে (৮০৪-৮১৬ হি./১৪০২-১৪১৩ খ্রি.) সালতানাতের ক্ষমতা নিয়ে প্রথম বায়েজিদের পুত্রদের মাঝে সংঘাত চলে। এ সময় কেউই সালাতানাতের একক শাসক ছিলেন না।

২. তার শাসনামলে (৯২৩ হিজরিতে/১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে) উসমানি সালতানাত খিলাফতে রূপান্তরিত হয়।


তৃতীয় মুরাদ (১২)
(৯৮২-১০০৩ হি./১৫৭৪-১৫৯৫ খ্রি.)
তৃতীয় মুহাম্মাদ (১৩)
(১০০৩-১০১২ হি./১৫৯৫-১৬০৩ খ্রি.)
প্রথম আহমাদ (১৪)
(১০১২-১০২৬ হি./১৬০৩-১৬১৭ খ্রি.)
প্রথম মোস্তফা (১৫)
(১০২৬-১০২৭ হি./১৬১৭-১৬১৮ খ্রি.—১ম)
(১০৩১-১০৩২ হি./১৬২২-১৬২৩ খ্রি.—২য়)
দ্বিতীয় উসমান (১৬)
(১০২৭-১০৩১ হি.
১৬১৮-১৬২২ খ্রি.)
চতুর্থ মুরাদ (১৭)
(১০৩২-১০৪৯ হি.
১৬২৩-১৬৪০ খ্রি.)
ইবরাহিম (১৮)
(১০৪৯-১০৫৮ হি.
১৬৪০-১৬৪৮ খ্রি.)
চতুর্থ মুহাম্মাদ (১৯)
(১০৫৮-১০৯৯ হি.
১৬৪৮-১৬৮৭ খ্রি.)
দ্বিতীয় সুলায়মান (২০)
(১০৯৯-১১০২ হি.
১৬৮৭-১৬৯১ খ্রি.)
দ্বিতীয় আহমাদ (২১)
(১১০২-১১০৬ হি.
১৬৯১-১৬৯৫ খ্রি.)
দ্বিতীয় মোস্তফা (২২)
(১১০৬-১১১৫ হি./১৬৯৫-১৭০৩ খ্রি.)
তৃতীয় আহমাদ (২৩)
(১১১৫-১১৪৩ হি./১৭০৩-১৭৩০ খ্রি.)
প্রথম মাহমুদ (২৪)
(১১৪৩-১১৬৮ হি.
১৭৩০-১৭৫৪ খ্রি.)
তৃতীয় উসমান (২৫)
(১১৬৮-১১৭১ হি.
১৭৫৪-১৭৫৭ খ্রি.)
তৃতীয় মোস্তফা (২৬)
(১১৭১-১১৮৭ হি.
১৭৫৭-১৭৭৪ খ্রি.)
প্রথম আবদুল হামিদ (২৭)
(১১৮৭-১২০৩ হি.
১৭৭৪-১৭৮৯ খ্রি.)
তৃতীয় সেলিম (২৮)
(১২০৩-১২২২ হি.
১৭৮৯-১৮০৭ খ্রি.)
চতুর্থ মোস্তফা (২৯)
(১২২২-১২২৩ হি.
১৮০৭-১৮০৮ খ্রি.)
দ্বিতীয় মাহমুদ (৩০)
(১২২৩-১২৫৫ হি.
১৮০৮-১৮৩৯ খ্রি.)
প্রথম আবদুল মাজিদ (৩১)
(১২৫৫-১২৭৭ হি.
১৮৩৯-১৮৬১ খ্রি.)
আবদুল আজিজ (৩২)
(১২৭৭-১২৯৩ হি.
১৮৬১-১৮৭৬ খ্রি.)


প্রথম আবদুল মাজিদ (৩১)
(১২৫৫-১২৭৭ হি.
১৮৩৯-১৮৬১ খ্রি.)
আবদুল আজিজ (৩২)
(১২৭৭-১২৯৩ হি.
১৮৬১-১৮৭৬ খ্রি.)
পঞ্চম মুরাদ (৩৩)
(১২৯৩-১২৯৩ হি.
১৮৭৬-১৮৭৬ খ্রি.)
দ্বিতীয় আবদুল হামিদ (৩৪)
(১২৯৩-১৩২৭ হি.
১৮৭৬-১৯০৯ খ্রি.)
পঞ্চম মুহাম্মাদ (৩৫)
(১৩২৭-১৩৩৬ হি.
১৯০৯-১৯১৮ খ্রি.)
ষষ্ঠ মুহাম্মাদ (৩৬)
(১৩৩৬-১৩৪১ হি.
১৯১৮-১৯২২ খ্রি.)
দ্বিতীয় আবদুল মাজিদ (৩৭)
(১৩৪১-১৩৪২ হি.
১৯২২-১৯২৪ খ্রি.)

মস্তফা কামাল আতাতুর্ক তুরস্কে স্বৈরশাসন শুরু করে। তার দল রিপাবলিক পিপলস পার্টিকে শাসকদলে পরিণত করে। আতাতুর্ক ইসলাম ও মুসলিমদের যে ক্ষতিসাধন করেছে, তা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

কুর্দি[৬৬] আন্দোলন

আতাতুর্ক তুর্কি জাতীয়তাবাদের ডাক দেয়। তার আহ্বানের প্রেক্ষিতে কুর্দিরা বিদ্রোহ শুরু করে। স্বতন্ত্র রাষ্ট্র কায়েমের দাবি জানায় তারা। যে শাসনব্যবস্থা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোর বিরোধিতা করে, ঔপনিবেশিকরা তার বিরুদ্ধে কুর্দিদেরকে টাইমবোমা হিসেবে ব্যবহার করে। ফলে কুর্দিস্তান ছিন্নভিন্ন হয়ে তুরস্ক, ইরাক, ইরান, সিরিয়া ও আর্মেনিয়ার মাঝে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কুর্দিদের কোনো স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে দেওয়া হয়নি; যাতে ঔপনিবেশিকরা 'কুর্দি কার্ড' দিয়ে এসব রাষ্ট্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে এবং তাদের কথামতো চালাতে পারে। নাহলে তারা বিচ্ছিন্নতাবাদী কুর্দিদেরকে অনেক আগেই সাহায্য করত।

সারাবিশ্বে কুর্দিদের সংখ্যা ত্রিশ মিলিয়নেরও বেশি, যাদের অধিকাংশই মুসলমান। শক্তি ও সাহসে কুর্দিরা সবার থেকে ভিন্ন। সংখ্যা ও আয়তনের দিক থেকে তুরস্ককে মনে করা হয় কুর্দিদের সবচেয়ে বড় মিলনস্থল। কিন্তু আতাতুর্ক কুর্দিদের সব ধরনের আন্দোলন ইস্পাত-কঠিন হাতে দমন করে। আতাতুর্কের শাসনব্যবস্থার সমর্থনকারী যেসব ব্যক্তি তুরস্কের শাসন নিয়ন্ত্রণ করত, তারাও এ ক্ষেত্রে আতাতুর্কের অনুসরণ করে। একদিকে তুরস্কে মিত্রপক্ষের চিন্তাচেতনা ও মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য; অন্যদিকে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে বিরোধ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য আতাতুর্ককে মিত্রশক্তি অব্যাহতভাবে সাহায্য করে যেতে থাকে। তুর্কিজাতির কাছে তাকে বীর হিসেবে তুলে ধরার জন্য সিরিয়ানদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ফ্রান্স সানজাক-ই-আলেকজান্দ্রিয়া থেকে সরে আসে। পাঠ্যক্রম ও মিডিয়ায়

---

৬৬. **কুর্দি :** মেসোপটেমিয়ান সমতলভূমি ও পাহাড়ি অঞ্চলের একটি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী এই কুর্দিরা। বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব তুরস্ক, উত্তর-পূর্ব সিরিয়া, উত্তর ইরাক, উত্তর-পশ্চিম ইরান এবং দক্ষিণ-পশ্চিম আর্মেনিয়া অঞ্চলে তারা ছড়িয়ে রয়েছে। -সম্পাদক

তাকে মহান ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করা হতে থাকে, যাতে এমন একটি প্রজন্ম গড়ে ওঠে, যারা আতাতুর্ককে আদর্শ মনে করে।

১৩৫৭ হিজরিতে এই স্বৈরাচারী মারা যায়। তারপর আতাতুর্কের ডান হাত ইসমত ইনোনু ক্ষমতা গ্রহণ করে। আতাতুর্কের আমলে ইনোনু প্রধানমন্ত্রী ছিল। ইসলামবিরোধিতার ক্ষেত্রে ইসমত ইনোনুও আতাতুর্কের পথে চলে। তার আমলে জাতীয় রাজনীতি পাশ্চাত্যের; বিশেষত ইংল্যান্ডের কক্ষপথে চলতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জনগণের অসম্মতি সত্ত্বেও মৈত্রীশক্তিকে খুশি করার জন্য তুরস্ক নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে। খিলাফত বাতিলকরণ ও মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ বিভক্ত করার পেছনে এরাই ছিল নাটের গুরু ও মূল চালক।

মাহমুদ জালাল বায়ার (ইনোনুর পূর্বে যিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং ইনোনু যাকে ক্ষমতাচ্যুত করে) কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্ব দেওয়া ক্ষমতাসীন দল রিপাবলিকান পিপলস পার্টির বিপরীতে ডেমোক্রেটিক পার্টি প্রতিষ্ঠা করে।

তুর্কি জনগণের প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও তুর্কি সরকার ফিলিস্তিনের মাঝে গড়ে ওঠা ইহুদিরাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়। তুমুল জনরোষের শিকার হয় তুর্কি সরকার। এরপর সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে মাহমুদ জালাল বায়ারের নেতৃত্বে ডেমোক্রেটিক পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। সংসদ নির্বাচনের পরই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মাহমুদ জালাল বায়ার বিজয়ী হয়ে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে। ডেমোক্রেটিক পার্টি কিংবা রিপাবলিকান পিপলস পার্টি নামে ভিন্ন হলেও উভয় দলের মূলনীতি ছিল সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা। ডেমোক্রেটিক পার্টির ক্ষমতাগ্রহণের মধ্য দিয়ে তুরস্কে একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটে। সংসদীয় সরকারের গোড়াপত্তন ঘটে; অর্থাৎ একাধিক পার্টি সংসদে অংশগ্রহণ করে এবং ক্ষমতা লাভের প্রতিযোগিতা শুরু করে।

মাহমুদ জালাল বায়ারের শাসনামলে ১৩৭০ হিজরিতে (১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে) তুরস্ক ন্যাটোতে যোগ দেয়। ১৩৭৪ হিজরিতে (১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে) গ্রিস ও যুগোস্লাভিয়ার সাথে বলকান চুক্তিতে অংশগ্রহণ করে তুরস্ক। রাশিয়াবেষ্টিত রাষ্ট্রসমূহে রাশিয়ার হস্তক্ষেপ প্রতিরোধে তুরস্ক পূর্বে বাগদাদ চুক্তিতে অংশ নেয়। ইরাক এ চুক্তি থেকে বেরিয়ে এলে ১৩৭৭ হিজরিতে (১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে) কেন্দ্রীয় চুক্তি নামে এর নামকরণ করা হয়।

তুরস্কের অর্থনৈতিক অবস্থা অধঃপতিত হতে শুরু করে। বিরোধী ন্যাশনাল পার্টি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সরকার ন্যাশনাল পার্টির সদস্যদের গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়। ন্যাশনাল পার্টি নাম পাল্টে রিপাবলিকান ন্যাশনাল পার্টি, ফ্রিডম পার্টি ও রিপাবলিকান পিসেন্ট পার্টিতে রূপ নেয়। শক্তিশালী বিরোধীদলে পরিণত হওয়ার জন্য এই তিন দল জোট গঠন করে। তুরস্কে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করার জন্য সরকার সব ধরনের পন্থা অবলম্বন করে। ইসলামবিরোধিতা থেকেও ফিরে আসে। আতাতুর্কের সময় রেডিওতে কুরআন তিলাওয়াত নিষিদ্ধ করার পর পুনরায় অনুমতি দেওয়া হয়। আবার আরবিতে আজান দেওয়া শুরু হয়। কিছু ইসলামি বিদ্যালয় ও কলেজ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

তুরস্কে ইসলামি আবেগ-অনুভূতির প্রত্যাবর্তন দেখে পাশ্চাত্য শঙ্কিত হয়ে পড়ে। ১৩৭৯ হিজরিতে (১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে) যুক্তরাষ্ট্র জেনারেল জামাল গোর্সেলকে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাতে সাহায্য করে। অভ্যুত্থান সফল হয়। সাবেক সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়। প্রধানমন্ত্রী আদনান মেন্দারিস ও দুজন মন্ত্রীকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। রাষ্ট্রপতির (মাহমুদ জালাল বায়ারের) ফাঁসির আদেশ লঘু করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ১৩৯১ হিজরিতে (১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে) তার ইনতেকাল হয়।

এরপর দলীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রিপাবলিকান পিপলস পার্টি জয়ী হয়ে পুনরায় ক্ষমতায় আসে। রিপাবলিকান পিপলস পার্টির নেতা ইসমত ইনোনুকে মন্ত্রিপরিষদ গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তারপর আবার দলীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে জাস্টিস পার্টি বিজয় অর্জন করে। সুলাইমান দেমিরেলকে নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। অসুস্থতার কারণে রাষ্ট্রপতি জেনারেল জামাল গোর্সেল পদত্যাগ করতে বাধ্য হলে পুনরায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে জুদাত সুনাই তুরস্কের রাষ্ট্রপতি হন।

ন্যাটোতে যোগ দেওয়া সত্ত্বেও রাজনীতির ক্ষেত্রে তুরস্ক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মাঝে একটি ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করে। তাই ১৩৮৭ হিজরি (১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে) আরবের বিরুদ্ধে ইসরাইলের যুদ্ধের সমালোচনা করে এবং ইসরাইলের সাথে বাণিজ্যিক চুক্তি বাতিল করে। অনুরূপ ১৩৮৮ হিজরিতে (১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে) তুরস্কে ইসরাইলি পর্যটন অফিস বন্ধ করে দেওয়া হয়। তুর্কি সেনাবাহিনী দেশের রাজনীতির নীতিনির্ধারক হয়ে

ওঠে। তার শাসনকালেই ন্যাশনাল উম্মাহ পার্টির উত্থান ঘটে। ডক্টর নাজমুদ্দিন আরবাকানের নেতৃত্বে প্রথম এই দলটিই ইসলামি মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হয়।

তারপর জুদাত সুনাইর মেয়াদ শেষ হয়। সামরিক বাহিনী ফাখরি কুরতুককে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করে। অথচ তাকে রাষ্ট্রপতি বানানো ছিল তুর্কি সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। সংবিধানে আছে, কেবল তুর্কি সিনেট থেকেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবে; অথচ ফাখরি কুরতুক ছিল চিফ অব স্টাফ। তাই সে পদত্যাগ করে। একই সময়ে জাতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী মুহাম্মাদ আজমান মন্ত্রিত্ব ও সিনেট সদস্যপদ থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করে, যাতে ফাখরি কারতুককে রাষ্ট্রপতি বানানোর রাস্তা প্রশস্ত হয়।

এরপর দলীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পার্টি ও সালভেশন পার্টি মিলে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। জাতীয় পার্টির প্রধান বুলেন্ত এজেভিত প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করে, আর সালভেশন পার্টির প্রধান নাজমুদ্দিন আরবাকান উপ-প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করে। এ সময় সে একটি বীরোচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সংখ্যালঘু মুসলিমদের সুরক্ষার জন্য সাইপ্রাসে তুর্কি বাহিনী প্রেরণ করে। এতে ন্যাশনাল সালভেশন পার্টি ও নাজমুদ্দিন আরবাকানের প্রতি রিপাবলিক পিপলস পার্টির বিদ্বেষ চরম আকার ধারণ করে। কারণ, দিনদিন নাজমুদ্দিনের জনপ্রিয়তা বেড়েই চলছিল। এরপর দুই দলের মাঝে বিরোধ দেখা দেয়। নাজমুদ্দিন আরবাকান পদত্যাগ করে। সম্মিলিত মন্ত্রিপরিষদও ভঙ্গ হয়ে যায়। এরপর আরও কয়েকটি মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়, কিন্তু প্রতিটি পরিষদই ব্যর্থ হয়। একপর্যায়ে ১৪০০ হিজরিতে (১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে) কেনান এভরিনের নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়।

তুরস্কের ক্ষমতা পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া ক্রমবর্ধমান ইসলামি আন্দোলন থামিয়ে দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্র এই অভ্যুত্থানের পেছনে কলকাঠি নাড়ে। এই সময়ে তুরস্কে কিছু কম্যুনিস্টের আত্মপ্রকাশ ঘটে। কেনান এভরিন দেশের ওপর সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব আরও বিস্তৃত করে। সে একইসাথে রাষ্ট্রপতি, চিফ অব স্টাফ ও জাতীয় সামরিক কাউন্সিলের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে।

এ সময় তুর্গুত আওজালের উত্থান ঘটে। তুর্গুত মাদারল্যান্ড পার্টি প্রতিষ্ঠা করে। সে নিবার্চনে অংশগ্রহণ করে ১৪০৩ হিজরিতে (১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে)

বিজয়ী হয়। সে ক্ষমতায় এসে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করে। তার শাসনামলে তুরস্ক ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের মাঝে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। কেনান এভরিনের পর তুর্গুত রাষ্ট্রপতিত্ব গ্রহণ করে। তার আমলে তুরস্কে ফোরাত নদীর বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প শুরু হয়। সিরিয়া এই প্রকল্পের বিরোধিতা করে। কুর্দি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন রোধে সিরিয়া ও ইরাক পরস্পর সহযোগিতা করে। ইরাক যখন কুয়েতে আগ্রাসন চালায়, তখন তুর্গুত আওজাল ঘোষণা করে, তুরস্ক নিরপেক্ষতা অবলম্বন করবে। তুর্গুতের মৃত্যুর পর সুলাইমান দেমিরেল রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করে।

সুলাইমান দেমিরেল রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে স্থায়ী সমস্যা সৃষ্টি হয়। মাদারল্যান্ড পার্টির প্রধান তানসু চিলারকে যখন মন্ত্রিসভা গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তখন সে তুরস্ককে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু গ্রিস এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, ইউরোপও গড়িমসি করতে থাকে। তানসু চিলার ইসরাইলের সাথে সামরিক সহযোগিতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। মুসলিমবিশ্ব তার এই চুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে। তানসু চিলার আরও অনেক বিতর্কিত বিষয়ে জড়িয়ে পড়ে। ফলে তার দল ভেঙে যায়।

তুরস্কে স্থিতিশীল মন্ত্রিপরিষদ গঠনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক জটিলতা বাড়তে থাকে। তখন নাজমুদ্দিন আরবাকান রিফাহ (ওয়েলফেয়ার) পার্টি নিয়ে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে। রিফাহ পার্টিকে ন্যাশনাল সালভেশন পার্টির সহযোগী মনে করা হয়। এবারের দলীয় নির্বাচনে নাজমুদ্দিন জয় লাভ করে। নতুন মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। কারণ, রিফাহ পার্টি যতগুলো আসন পেয়েছিল, তা মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য যথেষ্ট নয়। মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য রিফাহ পার্টিকে অন্য কোনো দলের সাথে জোট বাঁধতে হবে। নতুন জোট সরকার গঠনের সব রকমের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ট্রু প্যাথ পার্টির সভাপতি মাসউদ ইলমিতকে এই দায়িত্ব দেওয়া হলে সেও ব্যর্থ হয়। তার পরে তানসু চিলারও ব্যর্থ হয়।

এরপর পুনরায় নাজমুদ্দিন আরবাকানকে নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হলে সে তানসু চিলারকে তার সাথে জোট বাধতে রাজি করাতে সক্ষম হয়। অতীতে নানা ধরনের সমস্যায় জড়িয়ে পড়া তানসু চিলারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য এই প্রস্তাব ছিল সুবর্ণ সুযোগ। এই জোটে রিফাহ পার্টি মাদারল্যান্ড পার্টির জন্য অনেক আসন ছেড়ে দেয়। রিফাহ

পার্টি মাদারল্যান্ড পার্টির জন্য প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা ও শিক্ষামন্ত্রীর পদ ত্যাগ করে। রিফাহ পার্টির লক্ষ্য ছিল, তারা সিভিল সার্ভিসের মতো এমন মন্ত্রিত্বগুলো গ্রহণ করবে, যেগুলোতে কাজ করলে জনগণ রিফাহ পার্টির প্রতি খুশি হয়।

কিন্তু নাজমুদ্দিন ভুলে যায় যে, সামরিক বাহিনীই তুরস্কে কর্তৃত্ব করে; ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে এমন কোনো প্রধানমন্ত্রীর প্রতি তারা সন্তুষ্ট হবে না। বিশেষভাবে মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সফরের পর এই আশঙ্কা আরও ঘনীভূত হয়। এ সময়ে পশ্চিমাবিশ্ব পরিস্থিতি দেখে তুরস্কের ইসলামপন্থীদের মারাত্মক আঘাত করার পরিকল্পনা করতে থাকে। সামরিক বাহিনী ইসলামপন্থী অফিসারদের পদচ্যুত করতে শুরু করে। জোট সরকারকেও চাপ দিতে থাকে। একপর্যায়ে সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

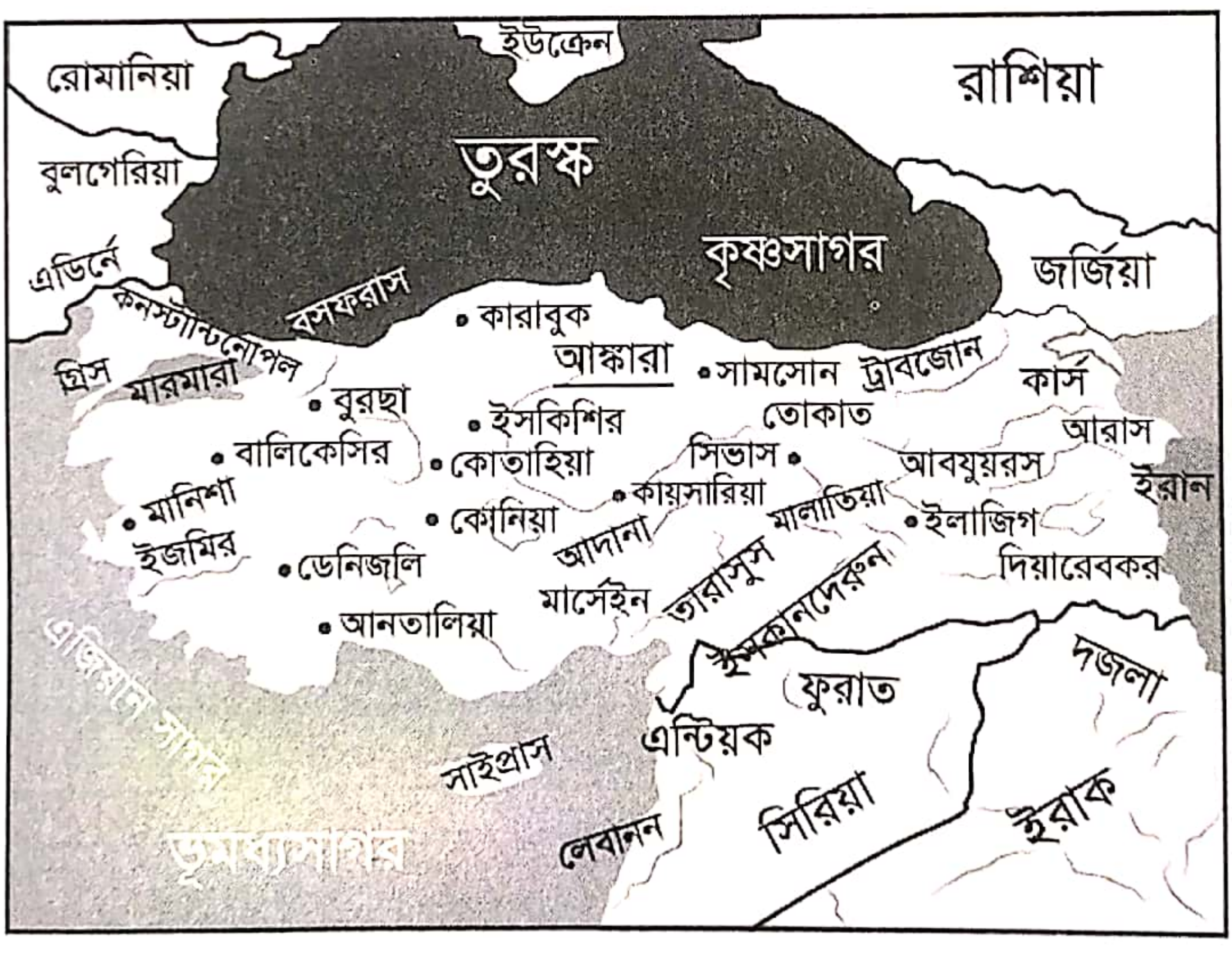
এরপর ইসলামবিরোধী সেকুলার মাসউদ ইলমিজকে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। মাসউদ ইলমিজ সবধরনের ইসলামি কর্মকাণ্ড বন্ধ করে এবং পুনরায় ইউনিভার্সিটিতে হিজাব নিষিদ্ধ করে। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা আরও কয়েক বছর বৃদ্ধি করে। এ ছাড়া রিফাহ পার্টির বিরুদ্ধে সে সাংবিধানিক আদালতে মামলা দায়ের করে। রিফাহ পার্টির কার্যক্রম তুরস্কে সেকুলারিজমের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে—এমন কারণ দেখিয়ে সে রিফাহ পার্টি ভেঙে দেওয়ার দাবি জানায়। আশ্চর্যের বিষয় হলো, সাংবিধানিক আদালত রিফাহ পার্টি ভেঙে দেওয়ার রায় দেয় এবং নাজমুদ্দিন আরবাকানের জন্য পাঁচ বছরের মাঝে যেকোনো দলের চেয়ারম্যান হওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। রিফাহ পার্টির সদস্যরা এই পরিস্থিতির আশঙ্কায় পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিল। নিষেধাজ্ঞার পর তারা রিফাহ পার্টির বিকল্প দল 'ভার্চু পার্টি'-তে যোগ দিতে শুরু করে।

মাসউদ ইলমিজ ইসরাইলকে সাহায্য করতে শুরু করে। ১৪১৮ হিজরিতে (১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে) ইলমিজ ও সামরিক বাহিনী নির্বাচনের মাঠ প্রস্তুত করতে তুরস্কে ইসলামি আন্দোলন বন্ধ করে দেয়। সামরিক বাহিনী কুর্দিদের ওপর আরও বেশি আক্রমণ শুরু করে এবং তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে ইরাকে ঢুকে পড়ে। এই যুদ্ধে কেবল উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসাররাই লাভবান হয়। তারা এই হামলায় বড়সড় বিনিময় লাভ করে। আর কুর্দিরা ও মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া তুর্কি সৈনিকরা এর দুর্ভোগ পোহায়। এ ছাড়া

লড়াইরত দুই পক্ষের কাছে অস্ত্র বিক্রির আয়ে পশ্চিমাবিশ্ব, বিশেষ করে আমেরিকা ও ইসরাইলের লাভবান হওয়া এবং মুসলিমদের নিজেদের মাঝে যুদ্ধ করতে দেখে ইসলামের শত্রুদের উল্লাস করার বিষয়টিও ভোলার মতো নয়।

একে পার্টি

২০০২ খ্রিষ্টাব্দের শেষদিকে ভার্চু পার্টির কয়েকজন নেতাকর্মী নিয়ে একে পার্টি গঠিত হয়। এর কিছুদিন পরই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তুর্কি পার্লামেন্ট নির্বাচনে সদ্যগঠিত এই দলের নিরঙ্কুশ বিজয়ে সবাই অবাক হয়ে যায়। এই মহাবিজয়ের কারণে জাস্টিস পার্টি ও ন্যাশনাল পার্টি ব্যতীত সব দল শূন্য হাতে পার্লামেন্ট থেকে বের হয়ে যায়। আবদুল্লাহ গুলের রাষ্ট্রপতিত্বে সরকার গঠিত হয়। তারপর রজব তাইয়েব এরদোগান একে পার্টির চেয়ারম্যান হন। আর আবদুল্লাহ গুল পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন।



মানচিত্র নং-২৪

তুরস্কের মানচিত্র

মাকতাবাতুল হাসান-এর ইতিহাস-প্রকাশনা পরিকল্পনা

- বৃহৎ কলেবরের সমৃদ্ধ ইসলামি ইতিহাস বিশ্বকোষ।
- সংক্ষিপ্ত কলেবরের ইসলামি ইতিহাসকোষ।
- এক মলাটে ইসলামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।
- রাজনীতি, সমরনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ভিত্তিক ইতিহাস।
- অঞ্চলভিত্তিক ইতিহাস।
- রাজপরিবার-কেন্দ্রিক ইতিহাস।
- জীবনীকেন্দ্রিক ইতিহাস।
- জাতি-দল-শ্রেণিকেন্দ্রিক ইতিহাস।
- স্থাপনা-প্রতিষ্ঠাননির্ভর ইতিহাস।
- ইসলামি ইতিহাসের প্রাতঃস্মরণীয় বিভিন্ন ঘটনানির্ভর গ্রন্থ।
- শিশুতোষ ইতিহাসগ্রন্থ।
- ইতিহাসনির্ভর মানচিত্র, ক্যালেন্ডার, ডায়েরি ইত্যাদি।

আমরা জানি—আমাদের স্বপ্নের পরিধি যতটা বিস্তৃত, শক্তি ও সামর্থ্য ততটাই সামান্য। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি—‘তিনি’ যদি চান, তাহলে কোনোকিছুই অসম্ভব নয়; যদি ‘তিনি’ না চান, অতিসম্ভবও সম্ভব নয়। আজ আমরা যা-কিছুর মাঝে জীবনযাপন করছি, একদিন তা-ও স্বপ্ন ও কল্পনা ছিল। ঠিক তেমনই আজ যা স্বপ্ন ও কল্পনা, আগামী দিন তা-ই হবে চাক্ষুস বাস্তব, ইনশাআল্লাহ!

ISBN
B0070
9 789848 012604

মাকতাবাতুল হাসান